ইতিহাস কথা কয়

মোহাম্মদ মোদাব্বের

ইতিহাস কথা কয়

ইতিহাস কথা কয়

মোহাম্মদ মোদাব্বের

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পনেরো শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ইতিহাস কথা কয়

মোহাম্মদ মোদাব্বের

প্রথম প্রকাশ

জুন ঃ ১৯৮১

জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৮৮

শাবান ঃ ১৪০১

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ৬৪৬

ই ফা গ্রন্থাগার ঃ ভারত-ইতিহাস
বাংলাদেশ-ইতিহাস
৯৫৪'০৩

প্রকাশনায় :

শেখ ফজলুর রহমান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ,
৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

মুদ্রণে :

শিরীন প্রেস,
৭২, পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা—১

প্রচ্ছদ :

হারুন-আল-রশীদ

বাঁধাই :

শেলিনা এন্টারপ্রাইজ
২৫, জিন্দাবাহার (১ম লেন) ঢাকা—১

দাম ঃ পঁচিশ টাকা

ITIHAS KATHA KAI : History asserts itself, written by Muhammad Mudabber in Bengali and Published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dacca to Celebrate the 15th Century AL-Hijrah.

Price : Taka Twenty five only. US. $ 3'00

উৎসর্গ

দেশের আযাদীর জন্য সংগ্রাম করে যাঁরা শাহাদৎ বরণ করেছেন তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালাম।

—লেখক

কেন প্রকাশ করা হ'লো

পলাশীর পরে উপমহাদেশের মুসলিম কওমের ইতিহাস যুগ পরম্পরায় বিরাট এক বিপর্যয়েরই ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি তাতে এর কোন আলেখ্য খুঁজে পাওয়া দুস্কর;—প্রসঙ্গ ক্রমে যা দু'এক কথা আলোচনা করা হয়েছে তাও ক্ষমতাসীন শক্তির দণ্ডে নিয়ন্ত্রিত এক অপকৌশল কবলিত বিকৃত ইতিহাসই বলা চলে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে শুরু করে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন,—তাতে মুসলিম কওমের ভূমিকা, পাক-ভারতের জন্মলাভ ও পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সব কিছুই কালের খাতায় যুগের সাক্ষীর মতো ইতঃস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। এ-ও আর এক বিক্ষিপ্ত ইতিহাস, —নীরব দর্শকের মতোই, কিন্তু প্রাণবন্ত।

ইতিহাস কথা কয় না— কওয়াতে হয়। কালের অলিখিত খাতা থেকে খুঁজে খুঁজে বাছাই ক'রে নিয়ে যুগ-সংঘাতের যুক্তি-তর্কে প্রতিষ্ঠিত করতে

পারলেই ইতিহাস কথা ক'য়ে ওঠে। সত্য তখন তথ্য নির্ভর হয়ে বাস্তব মর্যাদার দাবী জানায়। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রবীন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ মোদাব্বের তাঁর নিপুন কলমে সেই পাথরচাপা সত্যকেই তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের আলোকে উপমহাদেশের মুসলিম স্বকীয়তাকে জানার ক্ষেত্রে "ইতিহাস কথা কয়" বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে মুসলিম ঐতিহ্যের একটা অত্যাবশ্যকীয় সংযোজন। মুসলিম ঐতিহ্য চেতনার অনন্য অভিসারী লেখককে আমরা সেই দিক থেকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। তাঁর নিরলস পরিশ্রমের ফসল এই বইটা—মুসলিম চেতনার অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আজ আমরা আনন্দিত। বইটা তথ্যভিত্তিক বহু কিছু অজানা ইতিহাসের দ্বারোদ্ঘাটন ক'রে দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কিছুমাত্র উপকারে এলেও আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

— শেখ ফজলুর রহমান

লেখকের কথা

"ইতিহাস কথা কয়" গ্রন্থখানি ইতিহাসের পর্যায়ে পড়লেও এটা ব্যতিক্রমধর্মী। গণ-মানুষের দুঃখ-বেদনার ইতিবৃত্ত; সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের নানা উত্থান-পতনের ঘটনা এবং উপ-মহাদেশের বৃহত্তর জাতির বঞ্চনার কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের বাইরের চেহারা অনেকে দেখেছেন কিন্তু ভেতরের চেহারা দেখেননি। মুসলমানেরা জাতি হিসেবে পশ্চাদপদ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে—এই মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করা হয়েছে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় এবং গণতন্ত্রে উত্তরণের মাধ্যমে যে গতিধারা আমাদের রাজনৈতিক জীবনে সঞ্চারিত হয়েছে, তার কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবনের ইতিকথাও এই গ্রন্থে সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এগিয়ে না এলে এত শীঘ্র পাঠকদের সামনে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এজন্য ফাউণ্ডেশনের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পান্ডুলিপি-সংশোধন ও অনুলিপির কাজে সাহায্য পেয়েছি আমার সহধর্মিনী কবি হোসনে আরা, পৌত্র জয়, দীপ ও নাতনী প্রিয়ার নিকট থেকে। ওরা আমাকে ঋণী করে রাখলো। শিরীণ প্রেসের মালিক হোসেন কামাল এই গ্রন্থ প্রকাশে ও মুদ্রণে যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে। এ জন্য শিরীণ প্রেসের মালিক ও কর্মীগণকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রচছদ শিল্পী-হারুণ-আল-রশীদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

আমার এই গ্রন্থ পাঠক সমাজের নিকট আদৃত হলে নিজকে ধন্য মনে করবো।

৫/৩, গজনবী রোড,
ঢাকা-৭
১৫ই জুন, ১৯৮১

বিনীত—
মোহাম্মদ মোদাব্বের

সূচীপত্র

॥ ছয় ॥

॥ সাত ॥

॥ আট ॥

॥ নয় ॥

॥ দশ ॥

ইতিহাস কথা কয়

।। এক ।।

একটু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুনে আসছিলাম, আমি এক অভিজাত পরিবারের সন্তান ঃ আমার পূর্ব-পুরুষদের দাপটে আশ-পাশের লোকেরা সন্ত্রস্ত থাকতো, আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে কেউ পাল্কি চড়ে যেতে পারতো না, প্রজারা ঠিক সময়ে খাজানা দিতে না পারলে তাদের ধরে এনে উত্তম মধ্যম দেয়া হত। কিন্তু আমার যখন একটু বুদ্ধি হল, তখন দেখলাম, সে জৌলুস নেই, সে দাপট ও নেই। সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি মাকে বলতাম, মানুষের উপর অত্যাচার করতো আমার পূর্বপুরুষেরা, তাই বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেছে।

ছোট বেলার কথা

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেন, হয়তোবা তাই। তুই বাবা বড় হয়ে কখনো গরীব-দুঃখীকে 'হেকারত' (ঘৃণা) করিসনে। তাহলেই খোদা তোর ভাল করবেন।

কি জানি কেন, মায়ের এই কথাটা সব সময় আমার কানে বাজতো। ছোটবেলায় একজন ভিখারীকেও "আপনি" বলে সম্বোধন করতাম। সংসার আমাদের সচ্ছল ছিল না, তবুও ভাতের চাউল থেকে এক মুঠো ফকীরকে দেয়ার জন্য মায়ের সে কী আকুলতা।

আমার গ্রামের পাঠশালা ছিল বেশ নাম করা। আমাদের পাড়া থেকে একটু দূরে। পাঠশালায় একজন শিক্ষক ছিলেন। আমরা তাঁকে গুরু মশাই বলে ডাকতাম। ক্ষেত্র গুরু মশায়ের অর্থাৎ ক্ষেত্রনাথ দে মহাশয়ের দেহটা বেশ নাদুস-নুদুস। নাকের উপর একজোড়া লম্বা ও মোটা গোঁফ। ছাত্ররা যতনা ভয় করতো গুরুমশাইকে, ততোধিক ভয় করতো তাঁর বিরাট গোঁফ জোড়াকে। তার উপর তাঁর হাতে থাকতো একটা খেজুর ডালের লাঠি। পাঠশালা বসতো সকাল থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত, আবার বিকেল দু'টো থেকে পাঁচটা। নামতা

পড়িয়ে দিনের পাঠ শেষ হত। শুনতাম, ক্ষেত্র গুরুমশাইয়ের পাঠশালা থেকে যে ছাত্র পাস করে বেরুবে, তাকে ভবিষ্যতে অংকের জন্য আর ফেল করতে হবে না। আর গুরুমশাইয়ের অংকের জন্য ছিল সবচেয়ে বেশী কড়াকড়ি। অংক না পারলে ছাত্রের পিঠে হাতে পায়ে এমন বেদেরেগ ছড়ি পড়তো যে, তারা প্রায় কাপড় ভিজিয়ে ফেলতো। আমি যখন প্রাইমারী পাস করে পাঠশালা ছেড়ে চলে যাই, তখন গুরুমশাই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, খোকা, তুই খুব বড় হবি, মানুষ হবি, বলে দিলাম।

মা-বাবার বড় ইচ্ছে, আমি মওলবী-মওলানা হই। দীনী এলেম হাসিল করলে নাকি মা-বাবার বেহেশ্ত নসিব হয়। তাই আমাকে গ্রামের জুনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয়া হল। দুই বছরের মধ্যে আধা মওলবী হয়ে গেলাম। পাড়ায় মিলাদ পড়ি, মানুষ মরে গেলে কোরান শরীফ খতম করি, মসজিদে সন্ধ্যা-সকালে আজান দেই। আর লেবাসটা করে ফেলি একেবারে মুসল্লির মত। মাথায় সব সময় টুপি চড়ানো থাকে। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন এক ঢাকাই মওলানা। নাম আবদুল হাকিম। তিনি ভালো আলেম ছিলেন। আলীয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী, আবার এন্ট্রান্স পাসও।

আমার গ্রামে একটা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল, আর তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন এক হিন্দু জমিদারের ছেলে। তিনি একদিন ধরে নিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ে একেবারে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করে নিলেন। বেতন দিতে হল না। শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করায় উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে আমার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল।

তখন আমাদের মহকুমা সদরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল—বশির-হাট হাই ইংলিশ স্কুল। আর শহর থেকে মাইল খানেক দক্ষিণে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি একটা নতুন উচ্চ বিদ্যালয় সবেমাত্র খুলেছেন। স্যার আর, এন, হাই স্কুল। নতুন স্কুল, ছাত্র পাওয়া কঠিন; ভাল ছাত্ররা সাধারণতঃ নতুন স্কুলে যেতে চায় না। আমার মার্কশীটে নম্বর গুলো বেশ উপরের দিকে ছিল, তাই ভাবলাম, দেখাই যাকনা কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় কিনা। প্রধান শিক্ষক বৃদ্ধ—জ্ঞান-বৃদ্ধও বলা যেতে পারে। সরাসরি তাঁর সামনে হাজির হয়ে বললাম

ভর্তি হতে চাই। প্রধান শিক্ষক আমার প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখে বললেন, বেশ ভর্তি হয়ে যাও। ত্রিশ টাকা লাগবে।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ত্রিশ টাকা দেব কোথা থেকে। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছি, মুখে কোন কথা নেই। প্রধান শিক্ষক বললেন ঃ দাঁড়িয়ে আছ কেন!

"স্যার টাকা নেই।"

"বেশ এখন না থাকে পরে দিয়ো।" প্রধান শিক্ষকের কন্ঠে সহানুভূতির সুর।

এবার সব সংকোচের বাঁধ ভেঙ্গে বললাম ঃ স্যার, আমাকে ফ্রি করে দিতে হবে ; নয়ত আমার লেখাপড়া হবে না। বাবা গরীব, খরচ দিতে অক্ষম।

শিক্ষক মহাশয় কি যেন ভাবছিলেন। তারপর বললেন, বেশ, তোমায় ভর্তি করে নিচ্ছি, তবে প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় যদি ভাল ফল দেখাতে পার, তবে ফ্রি পড়তে পারবে, নয়ত নয়।

তাতেই রাজী হয়ে পরম উৎসাহে ক্লাস করতে শুরু করলাম। বশীরহাট শহরের উপর আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করি। ত্রৈমাসিক পরীক্ষা শেষ হল, অনেক বিষয়ে প্রথম এবং কোন কোন বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলাম। তবে সব বিষয় মিলিয়ে প্রথম স্থান দখল করলাম। ফলাফল দেখে প্রধান শিক্ষক একদিন আমায় ডেকে বললেন ঃ তোমার ফ্রি-শীপটা টিকে গেল দেখছি।

আমাদের স্কুলের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, নিয়মিত বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান। আমি বিতর্কে যোগদান করতে শুরু করলাম। শিক্ষকরা আমার বিতর্কের ধারা লক্ষ্য করে খুশী হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন স্কুলের সঙ্গে যে সব বিতর্ক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হত, তাতে আমাকে পাঠাতে লাগলেন। প্রথম প্রথম আমার ভয় লাগতো। কিন্তু পরে ভয় ভাঙলো। অনেকগুলি প্রতিযোগিতায় আমি পদক জয় করে আনলাম। খবরটা স্যার আর, এন, মুখার্জীর কানে গেলো। তিনি একদিন কলকাতা থেকে ভ্যাবলায় স্বগ্রামে এলেন, তাঁর সম্মানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করলেন। এই সভায় ছাত্রদের মধ্য

থেকে কে বক্তৃতা করবে, তা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলল। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। প্রধান শিক্ষক মহাশয় শেষ পর্যন্ত আমার কাঁধে চাপালেন ছাত্রদের তরফ থেকে বক্তৃতা করার দায়িত্ব। শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ! ছাত্রদের বিতর্ক সভায় বলা এক কথা আর অত বড় জ্ঞানীগুণী জনের সামনে বক্তৃতা করা? না, একাজ আমার দ্বারা হবে না। হেড স্যারের কাছে গিয়ে বললাম, স্যার, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে, আমায় ক্ষমা করুন। কিন্তু তিনি শুনবার পাত্র নন। উপরন্তু তিনি ধমকের সুরে বললেন, বক্তৃতা করলে তোমার ফ্রি-শিপ বহাল থাকবে, চাই কি আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতে পারো। নইলে ফ্রি-শিপটাও কাটা যাবে।

ফ্রি-শীপ কাটা গেলে আমার পড়াশুনারও ইতি টানতে হবে। তাই যা থাকে কপালে, বক্তৃতা করার জন্য মহড়া দিতে শুরু করলাম। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দল বেঁধে বসিয়ে বক্তৃতা শুনাতে থাকি। চীৎকার করে বলতে থাকি, হে মহাত্মন, আপনার আগমনে এই পল্লীভূমি ধন্য হল……

এমন সময় মেজবুবু ছুটে এলেন, "কিরে, অমন করে চীৎকার জুড়েছিস কেন? মহাত্মন-টহাত্মন কি সব বলছিস।"

আমি মেজবুবুকে সান্তনা দিই—"না বুবু, চেঁচাই না, একটা বক্তৃতার মহড়া দিচ্ছিলাম, কাল সভায় বলতে হবে কি না। তা বুবু তুমিও চলনা সভায়। অভিভাবকদের দাওয়াত আছে। আমি বক্তৃতা করবো তুমি শুনবে।"

ফুটন্ত তেলে বেগুন দিলে যেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে তেমনি রেগে মেজবুবু বললেন, পোড়া কপাল আর কি! আমি মেয়েমানুষ, মরদ-মানুষের সভায় যাবো? জাত ধর্ম তোর পাল্লায় পড়ে খোয়াতে হবে নাকি?

"না যাবে, না যাও। এখন তুমি যাও দিকি, আমি আর একটু রিহার্সাল দিয়ে নেই।" আমার কথায় মেজবুবু সরে পড়লেন।

পরদিন সংবর্ধনা সভা। সময় নির্ধারিত ছিল বেলা তিনটা। শিক্ষক ছাত্র, অভিভাবকগণ ও অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আগে থেকেই সমবেত হয়েছেন। ঠিক তিনটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্যার আর, এন, মুখার্জী

সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। মনে হয়েছিল, এমন সময়-জ্ঞান আছে বলেই, দেশব্যাপী ব্যবসায়ে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

স্কুলের শিক্ষকগণের তরফ থেকে মানপত্র পাঠের পর প্রধান শিক্ষক স্কুলের সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা করলেন। এরপর ছাত্রদের তরফ থেকে আমার ডাক পড়লো। কিন্তু বক্তৃতা মঞ্চে উঠে পা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে, গলাও শুকিয়ে যাওয়ার যোগাড়। এদিক ওদিক তাকাই, আর চোখে যেন সর্ষেফুল দেখি। পাশে থেকে হেডমাস্টার ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, ভয় কি, বলে যাও।

আমি এবার মরিয়া হয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে, আমার সামনে ভাগ্নে-ভাগ্নীরা আছে কল্পনা করে, বক্তৃতা শুরু করলাম। হেডস্যার যে সব বিষয় উল্লেখ করতে বলে ছিলেন, তা সবই বললাম।

বক্তৃতা শেষ করে ছুটে গিয়ে টিফিন রুমে একগ্লাস পানি খেতেই যেন জ্ঞানটা ধড়ে ফিরে এল। ইতিমধ্যে আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। আমি ফিরে আসতেই হেডস্যার ডাকলেন। তাঁর কাছে বসিয়ে বললেন, এখানে চুপ করে বসে থাকো।

স্যার রাজেনের বক্তৃতা শুরু হল। আধা বাংলা আধা ইংরেজী। তিনি বললেন যে, টাকা-পয়সা তিনি কম করেননি; এখন সৎ কাজে তা ব্যয় করতে চান। গ্রামের গরীব ছাত্র-ছাত্রী যাতে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পায় তার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ যেন সজাগ দৃষ্টি রাখে। এজন্য যদি স্কুলের অর্ধেক ছাত্রকেও ফ্রি-শীপ দিতে হয়, তাও দেয়ার নির্দেশ থাকলো।

স্যার আর, এন, আসন গ্রহণ করতেই হেডস্যার আমার হাত ধরে স্যার আর, এন,-এর কাছে নিয়ে বললেন, এই যে স্যার, সেই ছেলেটি। ক্লাস সেভেনে পড়ে।

স্যার আর, এন যেন সদয় দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে খুঁজছিলাম, বক্তৃতা দিয়েই কোথায় পালিয়েছিলে?

"জল খেতে গিয়েছিলাম স্যার।"

"কেন, বক্তৃতা করতে গিয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলে বুঝি!" আমি আর কোন উত্তর দেইনি।

স্যার আর. এন. জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বাড়ীর খবর, আর্থিক অবস্থার খবর ইত্যাদি। আর্থিক অবস্থা ভাল নয় শুনে তিনি বললেন যে, যদি আমি ইচ্ছা করি তবে হোস্টেলে থাকতে পারি। কোন খরচ লাগবে না। বইখাতার খরচ স্কুল থেকেই দেয়া হবে। আমি অনেক ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু হোস্টেলে আর যাইনি, কারণ সব হিন্দু ছেলে। কাঁকড়া, কচছপ খায়। ওদের সঙ্গে থেকে পোষাবে না।

বশীরহাটে থাকতে অনেক ছাত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু একটি ছাত্রের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল অকৃত্রিম সৌহার্দ্য। তার নাম দীনেশ মজুমদার। বশীরহাটের মজুমদার পরিবারের বেশ নাম-ডাক ছিল। ওদের বাড়ীতে বছরে দু'তিনবার থিয়েটার হত। দীনেশ একদিন আমায় ওদের বাড়ীর থিয়েটার দেখতে নিয়ে গেল। সেখানে ওর এক-ভাই নৃপেণ মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি পেশায় উকীল। তবে নট হিসাবে তার বেশ নাম হয়েছিল। 'সাজাহান' নাটকে তিনি আওরঙগজেবের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে যদি জাহানারার পার্ঠ দেই, করতে রাজী আছ ?

আমিত একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। হঠাৎ আমার উপর তার নজর পড়ল কেন ? দীনেশ বলল, তোর কথা আমি দাদাকে বলেছি, তাই দাদা তোকে দিয়ে অভিনয় করাতে চান। আমি সবিনয়ে জানা-লাম, যে পরিবারের সঙ্গে আমি থাকি তারা ভয়ানক গোঁড়া। আমি থিয়েটার করছি জানতে পারলে আমার ভাত ওখান থেকে উঠবে।

আমার মনে পড়লো, কয়েক বছর আগের কথা। গ্রামের বাড়ীতে তখন থাকি। পাড়ায় একটা যাত্রার মহড়া চলছে। সুরেন্দ্রনাথ কাব্য-তীর্থ একটি ধর্মমূলক নাটক মঞ্চস্থ করবেন। সেই নাটকে আমাকে একটা পার্ঠ দেয়া হল। স্ত্রী চরিত্র, কথা ও গান দুইই ছিল। আমি অভিনয় ও গান দুইই ভালবাসতাম। নাটকের গান শিখছি ওস্তাদের কাছে। হঠাৎ যমের মত আমার বাবা সেখানে উপস্থিত হয়ে কোন কথা না বলে ওস্তাদের সামনে থেকে আমার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাড়ী নিয়ে সে কী প্রহার। এই প্রহারের চোটে বাপের নাম ভুলে যাওয়ার কথা। গান-বাজনা তো কোন ছার। সেই থেকে যতটা সম্ভব গান-বাজনা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি।

বিপ্লবী দীনেশের সংস্পর্শে

থাক সে পুরনো কথা। দীনেশ আমার সঙ্গ ছাড়ে না, যদিও সে আমার চেয়ে দুই ক্লাস উপরে পড়ে। অনেক সময় সে আমাকে অংক শেখায়। কারণ অংককে আমি ভীষণ ভয় করতাম। সব বিষয়ে সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পেতাম, কিন্তু অংকে ফেল করার কাছাকাছি থাকতেম। ক্লাস নাইনে যখন পড়ি তখন হেডস্যার দুঃখ করে বলতেন, "অংকে যদি ভাল করতে পারিস তবে ম্যাট্রিকে তোর 'লেটার' আর 'স্টার' আটকায় কে? কিন্তু এই অংকের জন্য তোকে দেখছি পাস করানোই মুশকিল হবে।"

দীনেশের কাছে তাই মন দিয়ে অংক শিখতে শুরু করি। অংক শেখানোর মাঝে মাঝে সে আমাকে বিপ্লববাদের উপর লেখা বই পড়তে দিত। বলত, খবরদার, কাউকে দেখাবিনে, লুকিয়ে পড়বি। আমারও বেশ ভাল লাগত বইগুলি। আর ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির উপর ঘৃণা জন্মাতে থাকে।

দীনেশ ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য কলকাতায় চলে গেল। আমিও অথই পাথারে পড়লাম। তবে কোন রকমে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশম শ্রেণীতে উঠলাম। হেডস্যার বললেন, অংকে ত এবার অনেকটা উন্নতি করেছিস। আরও একটু মন দিয়ে অংকটা শিখে নিবি। কিন্তু তিনি তো জানেন না, আমার অংক শেখাবার লোককে আর পাবো না।

১৯২১ থেকে ১৯২২ সাল। অসহযোগ আন্দোলন দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। খেলাফত আন্দোলন চলছে পাশাপাশি। যেন দুইভাই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে দুশমনের মোকাবেলা করতে। গান্ধীজী নেতৃত্ব দিচ্ছেন আন্দোলনে। সঙ্গে আছেন মওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, ডাঃ আনসারী, মওলানা হসরত মোহানী, মতিলাল নেহরু, বালগঙ্গাধর তিলক, চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা আকরম খাঁ, মওলবী মুজীবুর রহমান, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি নেতারা এবং তাদের পিছনে আছে কোটি কোটি জনতা। সে এক প্রাণবন্যা। সংবাদ এল, নেতারা গ্রেফতার হচ্ছেন, জেলে যাচ্ছেন। আরো খবর পেলাম মওলবী মুজীবুর রহমান, আকরম খাঁ প্রমুখ অনেক নেতা কলকাতায় গ্রেফতার হয়েছেন। এই সংবাদে আমার মনে এক অভাবিতপূর্ব প্রতি-

ক্রিয়ার সৃষ্টি হল। মনে হল, এখন আমার বয়স তো কম নয়, পনর বছরে পড়েছি। জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে আমারও তো কিছু করণীয় আছে।

বেশী ভাববার সময় নেই। মেজবুবুকে বলে গ্রামের বাড়ীতে চলে গেলাম এবং বড়বোনের একটা গরু সাত টাকায় বিক্রি করে কলকাতায় রওয়ানা হলাম। এর আগে কোন দিন কলকাতায় যায়নি। সাত আনায় ট্রেনের টিকিট কিনে কলকাতাগামী ট্রেনে চড়ে বসলাম। ভাগ্যটা নেহাত ভালই বলতে হবে, ট্রেনে একজন চেনা লোকের দেখা পেলাম। সে আমার কলকাতা যাওয়ার কারণ শুনে খুব খানিকটা হাসলো, তারপর বলল, এত ছোট ছেলের কি রাজনীতিতে যেতে আছে? সে অনেক বোঝালো, যাতে আমি বাড়ী ফিরে যাই। কিন্তু আমি সংকল্পে অটল।

আমার সঙ্গীটির নাম আবু। পুরো নামটা জানতাম না। আবুর সঙ্গেই তার ডেরায় গিয়ে উঠলাম। দু'দিন ওর কাছেই থাকলাম, তার-পর কংগ্রেস অফিসের খোঁজখবর নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে একজন জাঁদরেল ধরনের নেতার কাছে আমার মনের বাসনা ব্যক্ত করলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পিকেটিং করতে পারবে?

"কেন পারবো না?" আমার জওয়াব।

"পুলিশ লাঠিপেটা করবে সইতে পারবে?"

"পারবো।"

"বেশ, এখানে থাকো, যখন সময় হবে, তোমাকে জানানো হবে।" তিনি অন্য একজনকে ডেকে আমার ভার তাঁকে দিলেন। একটা হলঘরে শতরঞ্জি বিছানো, তার উপর স্বেচ্ছাসেবকদের শোয়ার জায়গা। আমি সেখানে আমার চাদরটা বিছিয়ে শোয়ার জায়গা করে নিলাম। সেখানে আমার সমবয়সী অনেকেই জুটে গেল। এদের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব রকমের মানুষ ছিল। সংখ্যায় ডজন খানেক হবে, সবাই পিকেটারের দল। পুলিশ ধরে নিয়ে যায় ত এরা হবে সরকারের অতিথি, না নিলে আবার এই ডেরায় ফিরে আসবে।

আমার প্রথম দিনের পিকেটিংয়ে পুলিশের লাঠি খেতে হয়নি। পুলিশ শুধু ঘেরাও করে ছোট ছোট ছেলেদের একটা গাড়ীতে তুললো, আর

বড়দের অন্য এক গাড়ীতে। ছোটদের গাড়ী একদিকে চলল, আর বড়দের অন্যদিকে। আমাদের সঙ্গে যে পুলিশ কনেস্টবলটি ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

সে উত্তর দিল, "খোকাবাবু আপলোগোঁকো হাওয়া খেলানে কো ওয়াস্তে শহর কী বাহার লে জাতা হুঁ।"

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। ওরা থানায় নিয়ে যাচ্ছে না কেন, জেলখানাতেও নিচ্ছে না। কি করতে চায় ওরা আমাদের নিয়ে? প্রায় আধঘন্টা চলার পর গাড়ী কলকাতা শহর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে দমদমের কাছে থামলো। পুলিশটা ভ্যানের দরজা খুলে নেমে পড়লো, তারপর আমাদের নামতে হুকুম দিল। আমরা আটজন ছিলাম। গাড়ী থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই কনেস্টবলটি গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে : "বাবুলোগ নমস্তে" বলেই তীরবেগে গাড়ী ছুটিয়ে চলে গেল।

এখন উপায়? পকেট কপর্দক শূন্য। ফেরার উপায় একমাত্র হন্ঠন। নিরুপায় হয়ে দলবেঁধে হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা ধরে যায়। প্রায় ঘন্টা তিনেক হাঁটার পর কংগ্রেস অফিসে ফিরে এলাম। অফিসের সবাই হাসতে লাগলো। আমাদের কষ্ট ওদের হাসির কারণ হল বুঝি? নেতাটি বললেন "তোমরা যতই চেষ্টা করনা জেলে যাওয়ার জন্য, পুলিশ কিছুতেই জেলে নেবে না, অমনি করে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসবে।" এমনি করে একটি বছর পার হল।

রাত্রে খাওয়া শেষ করে শোয়ার চেষ্টা করছি, এমন সময় সেই আবুর আবির্ভাব। বলল, "তোমার বড়চাচা তলব করেছেন, এখনই যেতে হবে।" কথাটা শুনে হৃৎকম্প শুরু হল। বড়চাচা জানলেন কি করে যে আমি কলকাতায় এসেছি। এ নিশ্চয়ই আবুর কাজ। কিন্তু ধরা যখন পড়েছি তখন না গিয়ে উপায় নেই। অগত্যা তার সঙ্গে চললাম কড়েয়া বাজার রোডে। সঙ্গে আমার আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটা কাপড়ের ঝোলা। তার ভিতর দু'খানা পরনের ধুতি ও শার্ট, একটা গামছা, একটা চাদর। ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে রওয়ানা হলেম।

বড়চাচা মওলবী মুজীবুর রহমান তখন দু'তলায় তাঁর অফিস

কামরায় বসে কি যেন লিখছিলেন। আমি তাঁর সামনে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

তিনি একমনে লিখে চলেছেন, কোন দিকে খেয়াল নেই। আমি তখন একটু জোরে আস্‌সালামু আলায়কুম বলতেই তিনি মাথা উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "কি খবর, বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ শুনলাম, দু'বছর ধরে তোমার দেখা নেই। তোমার বাপ-মা তোমার শোকে দানাপানি ছেড়ে দিয়েছে। খুব অন্যায় করেছে।"

আমি রীতিমত ভয় পেয়ে যাই। তবুও মনে সাহস এনে বললাম, "ঠিক পালিয়ে আসিনি, তবে কাউকে বলেও আসিনি। বাড়ীতে চিঠি লিখতাম।"

"লেখাপড়া ছাড়লে কেন?"

"ইংরেজদের গোলমাখানায় আর পড়বো না।" আমি জবাব দেই।

"বেশ, স্বদেশী স্কুল-কলেজ হয়েছে, সেখানে পড়তে রাজী আছ?"—বড়চাচা জিজ্ঞাসা করলেন।

মুজীবুর রহমান সমীপে

আমি রাজী হয়ে গেলাম এবং সেদিন থেকেই 'দি মুসলমান' অফিসে আস্তানা গাড়লাম।

বড়চাচা মওলবী মুজীবুর রহমান চিরকুমার আর মহাত্মা গান্ধীর মতে তিনি ভারতের পয়লা নম্বরের নীতিপরায়ণ। কাজেই তাঁর আওতার মধ্যে থেকে অনেক বাধানিষেধের পাথার পার হয়ে চলতে হত। তাঁর জীবনকে অজান্তে আমার আদর্শ করে ফেলেছিলাম। এমন কি তাঁর রাজনৈতিক জীবন আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছিল। তাই সাংবাদিকতা শিক্ষার মাঝে মাঝে রাজনীতির অংগনে ভীরু পায়ে আনাগোনা করতে শুরু করলাম।

আমাদের বাড়ীর আশপাশে বস্তি, শিক্ষিত লোক বড় একটা পাওয়া যেত না। একটু দূরে সার্কাস এভিন্যুতে কংগ্রেস নেতা মিঃ জে, সি, গুপ্তের বাড়ী। মিঃ গুপ্তের দুই ছেলে—সাধন ও কল্যাণ। সাধন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা ছাত্র। রাজনীতিতে কমিউনিস্ট। বসন্ত রোগ তাঁর দু'চোখই অন্ধ করে দিয়েছে। ছোটছেলে কল্যাণ আই-এ ক্লাসের ছাত্র। তার সংগে আমার গভীর সৌহার্দ্য গড়ে উঠলো।

আমি যাদবপুরে পড়ি, কল্যাণ পড়ে প্রেসিডেন্সীতে। সরকারী কলেজে পড়েও সে যে বিপ্লবী সাহিত্য পড়ে, তা আগে বুঝতে পারিনি। আমাকেও সে ধারাবাহিকভাবে ওই সব বই সরবরাহ করতে লাগলো। ফলে, কংগ্রেস সম্পর্কে আমার ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। সন্ত্রাসবাদীদের ধারণা, বিনা রক্তপাতে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করা যাবে না। তবে কংগ্রেসকে তারা আড়াল হিসাবে ব্যবহার করবে। আমার মনেও এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করলো।

।। দুই ।।

১৯২৮ সাল। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন বসবে ডিসেম্বর ৩০ ও ৩১ তারিখে পার্ক সার্কাস ময়দানে। জওয়াহের লাল নেহরুর পিতা মতিলাল নেহরু সভাপতিত্ব করবেন। তাঁকে সামরিক কায়দায় অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হল। সুভাষচন্দ্র হলেন এই বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং বা সর্বাধিনায়ক। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ছিল সাইকেলারোহী, ক্যাভালরী বা ঘোড়সওয়ার, মোটর সাইকেল ও পদাতিক বাহিনী, তা হবে প্রায় দশ হাজার সব মিলিয়ে। প্রায় সিকি ভাগ ছিল ছাত্রী। সমস্ত বাহিনীর জন্য খাকী পোশাক তৈরী করা হয়েছিল। কল্যাণ আমাকে ধরল, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য। আমি তুমুল প্রতিবাদ করলাম; আমার স্বাস্থ্যের অজুহাত দিয়ে। সত্যিই, আমার স্বাস্থ্য এসব কাজের অনুকুল নয়। তবে তাদের সভায় আমি নিয়মিত যোগ দিয়েছি।

কল্যাণ ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে যোগ দেয়। এই বাহিনীর কম্যাণ্ডে ছিল অনন্ত সিং এবং সেকেণ্ড ইন কম্যাণ্ডে ছিল লোকনাথ বল। এরা দু'জনই চট্টগ্রামের "যুগান্তর" দলভুক্ত। অনন্ত সিং ছিল শিখ, তার

পূর্ব-পুরুষেরা চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ব্যবসা করে দিন গুজরান করত। অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, নির্মল সেন ছিল হাবিবুল্লাহ বাহারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাহারকে এরা দলের সমর্থক হিসাবে পেয়েছিল।

২৯শে ডিসেম্বর রাত্রে সুভাষচন্দ্র এক গোপন সভা ডাকলেন মিঃ জে, সি, গুপ্তের বাড়ীতে। বাছাই করা কর্মীদের শুধু ডাকা হল। কল্যাণ এই সভার মৌখিক নোটিশ নিয়ে এল আমার কাছে। বলল, "আজ সুভাষচন্দ্র এক যুগান্তকারী ঘোষণা করবেন। কয়েকজন মুসলমান কর্মী উপস্থিত থাকবেন। তোমাকে হাজির হওয়ার জন্য জরুরী তলব দিয়েছেন।"

নতুন বিপ্লবী দল

যথাসময়ের অনেক পূর্বে সভায় হাজির হলেম। মাত্র কয়েকজন তখন সভায় এসেছে। কল্যাণ আমার পাশে বসে গল্প শুরু করে দেয়। সে বলে, "দেখ, অনন্ত সিং যেমন ভাল ঘোড়-সওয়ার, তেমন কুস্তীগীর আর 'শার্প শুটার', একেবারে পয়লা নম্বর। চাঁটগার নেতা সূর্য্যসেন। কিন্তু তাঁকে এই সভায় ডাকা হয়নি, কারণ তিনি সবেমাত্র জেল থেকে বেরিয়েছেন। তাঁর পিছনে পুলিশ ফেউ লেগে আছে।"

কল্যাণ হয়ত আরো অনর্গল বকে যেতো, কিন্তু সভায় কর্মী সমাগম হতে লাগলো। বেশ খানিক পরে সভায় ঢুকলেন পয়লা কাতারের নেতা সুভাষচন্দ্র ও কবি নজরুল। আমরা অর্থাৎ সভায় সমাগত সকলেই উঠে দাঁড়ালাম। সুভাষের সঙ্গে আরো ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেজর যতীন দাস। এর কথা পরে বলা হবে।

সুভাষচন্দ্র কোনরূপ ভূমিকা না করেই কাজের কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর মতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপরেখায় পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসকে বহিরাবরণ হিসেবে ব্যবহার করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ জন্য গণসহযোগিতার প্রয়োজন। আয়্যারল্যান্ডকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য এবার যে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে, এই দলকে প্রকৃত কর্মীদল হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সংকল্পবদ্ধ। এই স্বেচ্ছাসেবক দলকে—"বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স" নামে স্থায়ী দলে উন্নীত করা হবে, আর সর্ব-ভারতীয় বিপ্লবী দল হিসাবে "হিন্দুস্তান রিপাবলি-

কান আর্মি" অবিলম্বে গঠন করা হবে। 'যুগান্তর', দলের প্রায় সব কর্মীই "হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি"তে যোগদানের ইচ্ছা জানিয়েছে।

সুভাষচন্দ্র আরো বলেন, "যুগান্তর" দল তার পুরাতন সনাতনী ঐতিহ্য এখনও পুরোপুরি বিসর্জ্জন দিতে পারেনি, মুসলমানরা সে জন্য এই পরিবেশে আমাদের সঙ্গে মিলতে পারছে না। এই জন্য সব গোঁড়ামী বিসর্জন দিয়ে সর্বভারতীয় ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রাজনীতি সার্বজনীন সংগ্রামী নীতি।

এই সভায় কয়েকটি আঞ্চলিক "সেল" গঠন করা হল। প্রত্যেক "সেল" কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের কার্যক্রম ঠিক করবে। তবে অচিরে একটি সর্বভারতীয় কর্মসূচী দেয়া হবে।

সভায় আরো ঠিক হলো যে, কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবে কবি নজরুলের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" গান দিয়ে। সমাপ্তি সঙ্গীত হবে নজরুলের "চল চল চল" গান। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, অবাঙ্গালী নেতারা আপত্তি করেছিল। কিন্তু যখন বললাম, আপত্তি করলে কংগ্রেসের অধিবেশন পন্ড করে দেব, তখন ওরা রাজী হল।

এই সভায় প্রত্যেক কর্মী হাতের আঙ্গুল কেটে রক্ত বের করে স্বাক্ষর দিল দলের শপথনামায়। তারপর কবি নজরুল শপথনামা পাঠ করতে লাগলেন। এরপর কবি নিজের লেখা "টলমল টলমল পদভরে" গানটি গেয়ে সভা ভঙ্গ করলেন।

কর্মীরা একে একে সুভাষ ও নজরুলের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিল। আমি করমর্দন করতে গেলে কবি আমার হাত ধরে বললেন, একে দিয়ে কি কাজ হবে, সুভাষ।

সুভাষচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, "গায়ে ওর জোর নেই সত্যি, কিন্তু বুদ্ধি আছে, ওটাই কাজে লাগাবো।" উভয়েই হাসতে লাগলেন।

৩০শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন। উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে "দুর্গম গিরি" গানটি দীপক চৌধুরীর পরিচালনায় এবং নজরুলের নেতৃত্বে গাওয়া হয়েছিল।

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হল। পার্ক সার্কাস এলাকা এতদিন সর-গরম ছিল, মনে হত যেন মেলা বসেছে। কিন্তু অধিবেশন শেষ হওয়ার পর কি রকম যেন একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। কর্মীরাও যে যার কাজে চলে গেল।

কয়েকদিন যেতে না যেতে একদিন টেলিফোন পেলাম, এক অজানা অচেনা লোক আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন, সাদত আলী আখন্দ। নামটা এর আগে কখনো শুনিনি। তিনি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললেন: "আমি আপনাকে ভাল করে চিনি। আপনার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই। কাল বিকেল ৪টায় যদি পার্ক সার্কাস পার্কে আসেন, তা হলে খুব খুশী হব।"

আমি বললাম: কি আলাপ করতে চান তা না বললে আমি যাবো কেন? তাছাড়া আপনাকে দেখিনি কোনদিন, পার্কে গিয়ে আপনাকে চিনবো কি করে?

"সেজন্য ভাববেন না, আমি আপনাকে চিনি, কাজেই অসুবিধা হবে না, আমিই আপনাকে খুঁজে নেব।"

আমি একটু ভাবনায় পড়ে গেলাম। 'অচেনা লোক' আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় কেন? আর কি আলাপ করতে চায় লোকটা। যাই হোক, দেখাই যাকনা, কোথার পানি কোথায় গড়ায়।

পরদিন যথাসময়ে পার্ক সার্কাস পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। দেখলাম একটা লোক, বেশ মোটা-সোটা, গৌরবর্ণ, খুব লম্বা নয় আবার বেঁটেও নয়, ধুতি পরা, শার্টের উপর একটা কোট চড়ানো, কচ্ছপের গতিতে আমার কাছে এগিয়ে এল, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বলল: "আমার নাম সাদত আলী আখন্দ।"

আমি বললাম: আপনিই আমাকে টেলিফোন করেছিলেন? কি আলাপ করতে চান আমার সঙ্গে?

ভদ্রলোক আমার পাশে বসতে বসতে বলল: "দেখুন, আপনি একজন বাচ্চা সাংবাদিক। বইও লিখেছেন। আমিও সাহিত্যিক। তাই সাহিত্য সম্প.র্ক একটু আলাপ-আলোচনা করতে চাই।"

"তা এই পার্কে কেন? আমার বাড়ীতে গেলে পারতেন।"

"দেখুন, আপনার ওখানে সব সময় মানুষের ভিড় থাকে, কোন কথা বলা যায় না, তাই একটু কষ্ট দিলাম।"

আমি একটু রূষ্টভাবেই বললাম ঃ আমি সবে লিখতে শুরু করেছি, সাহিত্য আলোচনা করার মত বুদ্ধি আক্কেল আমার এখনো হয়নি, এ কথা আমি নিজেও জানি, আপনিও নিশ্চয়ই জানেন। তাছাড়া আপনি আমায় চিনলেন কি করে? এত বড় বড় সাহিত্যিক থাকতে আমার সঙ্গে আলোচনা করার এমন উদ্ভট খেয়াল আপনার কেন হল বলুন ত!

এবার ভদ্রলোকের মুখে এক কুটীল হাসি ফুটে উঠলো। আসল মতলবটা তিনি ফাঁস করলেন ঃ দেখুন, আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্স-পেক্টর। আমরা খবর পেয়েছি, আপনি বিপ্লবীদের দলে ঘোরাফেরা করছেন। কাজটা ভাল করছেন না, আপনি একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক হবেন, কেন ভবিষ্যৎটা নষ্ট করছেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম ঃ আপনার সদুপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে কে বলল যে আমি বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করছি। এসব ডাহা মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে আমার সঙ্গে আর আলাপ করবেন না। ভবিষ্যতেও আর দেখা করার চেষ্টা করবেন না, আমি চললাম।

বাসায় ফিরে ভাবতে থাকি; শেষ পর্যন্ত টিকটিকি লাগলো ভাল-ভাবেই। বড়চাচা যদি জানতে পারেন, তা হলে হয়ত তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। পুলিশ উৎপাত করলে তিনি বিরক্ত হবেন ত বটেই, আবার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশছি জানলেও তাঁর রুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ তিনি অহিংসাপন্থী। কাজেই কিছুদিন চুপচাপ থাকা ভাল।

চুপচাপ থেকেও কিন্তু নিস্তার পেলাম না। বড়চাচা একদিন বললেন ঃ স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের পুলিশ ইন্সপেক্টর মুর্শেদী টেলিফোনে তোমার খোঁজ করেছে। মনে হয়, তোমার গতিবিধির উপর ওরা নজর রাখছে, সাবধানে চলবে।

আমি বললাম ঃ কংগ্রেস অধিবেশনের পর আমিত কোথাও যাইনে। ওরা অহেতুক সন্দেহ করছে।

"যাতে সন্দেহ না বাড়ে সেদিকে খেয়াল রেখো"—এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

মুর্শেদী সাহেবকে আমি চিনতাম। মুর্শিদাবাদের লোক, এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের আত্মীয়। পুরো নাম ইয়াহিয়া মুর্শেদী। মোটা-সোটা কৃষ্ণবর্ণ মানুষ, চোখ দুটি ঈগলের মত তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিও প্রখর। তার পাল্লায় পড়লে সহজে নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই, সেই মুর্শেদীর সঙ্গে একদিন দেখা হল পার্ক সার্কাসের কাছে মল্লিক বাজারে। আমি তখন বাজার করে বেরিয়ে আসছি, অমনি যমের মত আমার সামনে হাজির। বললেন ঃ "কেমন আছেন, ভাই," যেন কতকালের আত্মীয়। আমার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠলো। বললাম ঃ কেন মিছামিছি আমার পিছনে লেগেছেন বলুন ত। আমি ত কারুর পাকা ধানে মই দিইনি।

মুর্শেদী ছাড়বার পাত্র নন। বললেন ঃ আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল। একদিন সময় করে আসুন না আমার অফিসে।

"আপনার অফিসে মানে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে ? বাপরে, ওই নরকে মানুষ কি ইচ্ছে করে যায় কখনো।"

মুর্শেদী হাসলেন, "না না, নরক হবে কেন ? একবার গিয়েই দেখুন না। তাছাড়া, আমার অতিথি হয়ে যাবেন, গল্প-গুজব করে আসবেন। আপনার পত্রিকার জন্য অনেক খবর পাবেন ওখানে গিয়ে।"

আমি বললাম ঃ আমার খবরের দরকার নেই। আমার মাছ পচে যাচ্ছে, চলি এখন।

আমি বাসার পথ ধরলাম। মুর্শেদী আমার যাওয়ার পথে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, পিছনে তাকিয়ে তা লক্ষ্য করলাম।

কংগ্রেসী রাজনীতিতে উপমহাদেশীয় তরুণ সমাজ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল, বিশেষ করে ১৯২১ সালে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে মওলানা হসরত মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধীজীর বিরোধিতার ফলে অগ্রাহ্য হওয়ায় যুবসমাজ গান্ধীজীকে স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক মনে করতে থাকে এবং

কংগ্রেস যে দেশের আযাদী আনতে সক্ষম নয়' এটা তাদের বিশ্বাসে পরিণত হয়। আর এর ফলে যুব সমাজ বেশী করে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মওলানা হসরত মোহানী বলেছিলেন, গান্ধীজী আমাদের স্বাধীনতার তরি মাঝ দরিয়ায় ডুবাবে।

※

১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলকাতায় "হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি" গঠন করার পর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি গঠন সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ অনুশীলন পার্টির শচীন সান্যালের নেতৃত্বে আগেই একটি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়েছিল। শচীন সান্যাল তখন উগ্র হিন্দু জাতীয়তার নীতি ত্যাগ করে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর সৃষ্ট দলের নাম রাখা হয় "হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন"। কিছুদিন পরে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন।" সুভাষচন্দ্র অবশ্য এসোসিয়েশন বা সমিতি ধরনের নাম পছন্দ করেন নি তাই তাঁর দলের নাম রাখা হয় "হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি।" অবশ্য শচীন সান্যালের দলের অস্তিত্বের ধীরে ধীরে বিলোপ ঘটে কারণ শচীন বাবুর আগের মুসলিম বিদ্বেষী চেহারা অনেক অসাম্প্রদায়িক কর্মী ভোলেন নি।

সে যাক। এখানে সুভাষপন্থীদের তৎপরতার কথাই আলোচনা করা যাক। '২৮ সালে রিপাবলিকান আর্মি যখন গঠিত হয় তখন শচীন সান্যালের দলের কর্মী এবং বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর যতীন দাস সুভাষচন্দ্রের অন্যতম কর্মী হিসাবে যোগ দেন। তাঁর কর্মতৎপরতার কথা সুভাষ তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল" পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের মাস খানেক আগে লাহোরে এক জনসভায় ভাষণ দেয়ার সময় পুলিশ সুপার স্কট ও ডি-এস-পি সন্ডার্স লালা লাজপৎ রায়কে বেদম প্রহার করে। সেই প্রহারের ফলে '২৮ সালের নবেম্বর মাসে লাজপৎ রায় দেহত্যাগ করেন। এর প্রতি-

শোধ নেয়ার জন্য বিপ্লবীরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা স্কট ও সন্ডার্সকে হত্যার পরিকল্পনা নেয়।

১৭ই ডিসেম্বর বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, সুকদেব, রাজগুরু ও জয়গোপাল রিভলভার ও বোমা নিয়ে ওতপেতে থাকে। সন্ডার্স যখন তাঁর অফিস থেকে বের হয়ে রাস্তায় নামলেন অমনি ভগৎ ও রাজগুরুর রিভলভার একসঙ্গে গর্জে উঠলো। সন্ডার্সের দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো।

সন্ডার্সকে হত্যার পর লাহোরের দেয়ালে দেয়ালে প্রাচীরপত্র পড়লো "সন্ডার্সকে হত্যা করা হয়েছে লাজপৎ রায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। মানুষের রক্তপাতের জন্য আমরা দুঃখিত কিন্তু যে কোন বিপ্লবে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। আমরা মানুষ কর্তৃক মানুষের অত্যাচারের অবসান চাই।"

ভগৎ সিং লাহোর থেকে ছদ্মবেশে এবং একজন মহিলাকে তার স্ত্রী সাজিয়ে কলকাতায় এলেন এবং এক রাত্রির জন্য যতীন দাসের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। কলকাতায় তিনি দলের কমরেডদের কাছে বলেছিলেন যে, গান্ধী ভারতের জনগনকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার নামে বঞ্চনা করছেন।

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল, দিল্লীতে ভারতীয় আইন সভার অধিবেশন বসেছে। স্পীকারের আসনে ভি. জে প্যাটেল। বিশিষ্ট দর্শকদের গ্যালারীতে স্যার জন সাইমন। সঙ্গে আছেন মতিলাল নেহরু, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ নেতাগণ। অকস্মাৎ কর্ণ বিদারী শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে হলঘর ধোঁয়ায় ভরে গেল। এই সঙ্গে শোনা গেল বাইশ বছর বয়সের দু'টি যুবকের কন্ঠস্বর: আমরা কাউকে হত্যা করবার জন্য বোমা ফাটাইনি। আমরা সরকারের গণ-বিরোধী কাজের প্রতিবাদ জানাতে এসেছি।

যুবকদ্বয় আর কোন কথা না বলে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। যুবকদ্বয়ের নাম ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। বিচারে উভয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ড দেয়া হয়।

যতীন দাস এতদিন নিরাপদ ছিলেন কিন্তু পুলিশ কি করে সন্ধান

গেল যে, যতীন দাস এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। ১৯২৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে যতীন দাসকে তাঁর কলকাতার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার আগে যতীন দাস তাঁর ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পান যে এক ট্রাক পুলিস তাঁর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। তিনি দেখতে পেলেন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মির নূতন সদস্য ফণী ঘোষও পুলিসের গাড়ী থেকে নামলো এবং তাঁর বাড়ী দেখিয়ে দিল। বুঝতে বাকী রইলো না যে ফণী ঘোষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

যতীন দাসকে লাহোর নিয়ে যাওয়া হয়। লাহোর জেলে তখন ভগৎ সিং অনশন ধর্মঘট করতে শুরু করেছেন। ভগৎ সিং এর ২৯ দিন অনশনের পর যতীন দাস অনশন শুরু করেন ১৯২৯ সালের ১৩ই জুলাই থেকে। ১৯ শে জুলাই মওলানা জাফর আলী খান "জমিদার" পত্রিকার সম্পাদক ও ডাঃ আলম লাহোর সরকারের বিরুদ্ধে ও অনশন ধর্মঘটিদের পক্ষে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন, পুলিশ লাঠি চালনা করে সে মিছিল ছত্রভঙ্গকরে দেয়।

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর যতীন দাস লাহোর জেলে অনশন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৬২ দিন অনশনে ছিলেন।

১৯৩০ সালের ৫ই মে লাহোর সেপশ্যাল ট্রাইব্যুনালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হয়। ৭ই অক্টোবর মামলার রায় ঘোষিত হয়। ভগৎ সিং, শুকদেব ও শিবরাম রাজগুরু মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন। নয়জন যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হন। চারজন খালাশ পান।

১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে ভগৎ সিং, শুকদেব ও শিবরাম রাজগুরুকে ফাঁসি দেয়া হয়। ঠিক এই সময় গান্ধীজী লর্ড আরউইনের সাথে চুক্তি আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তিনি এই দেশভক্ত বীরদের পরিণতিতে নিস্পৃহ ছিলেন। এতটুকু প্রতিবাদের ধ্বনি তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি। যুব সম্প্রদায় জানলো গান্ধীজী পূর্ণস্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হবেন না। মওলানা হসরত মোহানী ঠিকই বলেছিলেন, গান্ধীজী আজাদীর তরী ডোবাবেন।

বাংলার বাইরে যখন বিপ্লবী তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ছিলো, বাংলার মাটিতে তখন এই আন্দোলন আরো সংগঠিত হচ্ছিল, সংঘবদ্ধ আক্রমণের

দিকে তাদের কর্ম তৎপরতা প্রসারিত হচ্ছিল। জেলায় জেলায় এদের কার্য্যক্রম পৃথকভাবে অনুসৃত হয়েছিল। অসহিষ্ণুতাই এই বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমের মূল কারণ। এতে সর্ব্বভারতীয় পর্য্যায়ে একই সঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার বানচাল হয়ে যাওয়ার পথে ওঠে। সুভাষচন্দ্রের নীতি ছিল প্রথমে সংঘবদ্ধ হয়ে এবং অগণিত কৃষক-মজুরদের আস্থায় নিয়ে যদি সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে কোন বিপ্লবই সম্ভব হবে না। ভারতের দশ কোটী মুসলমানকে সঙ্গে নিতেই হবে। কিন্তু সে পথে যাওয়াব জন্য সময়ের প্রয়োজন। সে সময় ব্যয় করতে তরুণ বিপ্লবীদের ধৈর্য্য ছিলনা। তাই বিচ্ছিন্নভাবে তারা মেদিনীপুর, কলকাতা, আলিপুর, কুমিল্লায় কর্মতৎপরতা শুরু করে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

অবিভক্ত ভারতে বিপ্লববাদের ইতিহাস আলোচনা করতে বসলে সবার আগে যে নামটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটা হল সুর্য্যসেন। বৃটিশ শাসনের জিঞ্জির ভাংগার শপথদৃপ্ত তৎকালীন তরুনরা মৃত্যুরসাথে পাঞ্জা লড়তে প্রস্তুত হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য নিঃশেষে প্রান দান করে অমর শহীদানের কাতারে শামিল হয়েছিল। আর এদের মধ্যমণি ছিলেন বিপ্লবী সুয্যসেন। আজকের বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বসে আমরা স্বাধীনতার অমৃত স্বাদ গ্রহণ করছি। হয়ত আমাদের অনেকে মুক্ত আবহাওয়ায় বসে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির কথা তুলে বিগত যুগের বিপ্লবীদের নিঃশেষে প্রাণদানের মহত্বকে ছোট করে দেখার প্রয়াস পাবেন, কিন্তু শৃঙ্খলিত মানুষের মনে স্বাধীনতার বীজ বপণে তারা যে কতটা সাহায্য করেছিল, তার সঠিক মুল্যায়ন হওয়া উচিত।

এখন সুর্য্যসেনের কথা আলোচনা করা যাক। ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে সুর্য্যসেনের পরিচয় হয় ১লা জানুয়ারী ১৯২৯ সালে।

কলকাতায় এই সময় 'যুগান্তর' দল ও 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' দলের এক গোপন সভায় নুতন সর্ব্বভারতীয় বিপ্লবী দল গড়া হয়। এই দলের নাম দেয়া হয় "হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি।" একথা আগেও বলেছি। এই দল গড়ার আগে যেসব বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব ছিল, তার সবগুলিই ছিল সাম্প্রদায়িক আদর্শভিত্তিক। মুসলমানরা ওদের বিশ্বাস করতো না; ওরাও মুসলমানদের দলে নিতো না। কালক্রমে যুগান্তর দল ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স তাদের নীতির পরিবর্তন করে এবং

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই এই দলে যোগদানের অধিকার দেয়া হয়। 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি' গঠনের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেক মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ এই দলভুক্ত হয়। সুভাষচন্দ্র বিপ্লববাদে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তাঁর রণকৌশল ছিল ভিন্ন রকমের; কংগ্রেসের মাধ্যমে জনসংযোগ বৃদ্ধি করে যথাসময়ে এক যোগে সারা ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাড়াহুড়া করে বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করলে অনর্থক শক্তিক্ষয় ও জীবনহানি ঘটবে। কলকাতার গোপন সভায় সুভাষচন্দ্র এই কথাটাই পার্টির কমরেডদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু চট্টগ্রামের মাস্টারদা অর্থাৎ সূর্য্যসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবীদল 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মির' অন্তর্গত, সেহেতু ওরা নেতাজী সুভাষের নির্দেশ মাফিক ধৈর্যের সঙ্গে সংগঠন চালিয়ে যাবে, এটাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আশা করেছিল। মাস্টারদার সঙ্গে আলোচনা করে আমি বুঝতে পারি, চাটগার কর্মীরা ধীরে চলার নীতি কতদিন মেনে চলতে পারবে, তা বলা যায় না। তার অন্যতম কারণ, চাঁটগার মত ছোট্ট জায়গায় প্রত্যেকটি বিপ্লবী কর্মী পুলিশের কাছে পরিচিত, কারণে অকারণে ওরাই বারবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আর জেল হাজতে পচে মরে। এই দুঃসহ যন্ত্রণার চেয়ে একবার মরিয়া হয়ে মার দিয়েই মরা ভাল। মাস্টারদা '২৯ সালের ১লা জানুয়ারী কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাঁর ডাইং ক্লিনিংয়ের পিছনের ঘরে বসে বলেছিলেন, পুলিশের জুলুম কতদিন সওয়া যায়। ছমাস, একবছর—তার বেশী আমার ছেলেরা অপেক্ষা করতে পারবে কিনা আমি বলতে পারিনে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করার অর্থ ব্যর্থতা বই কিছু নয়। এতে কি সর্বাত্মক সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারবেন?

মাস্টারদা বললেন: তাতে ক্ষতি হবে জানি। তবে জানেন ত, '২৩ সালে রেলওয়ে কর্মীদের বেতনের টাকা কেড়ে নেয়ার পর থেকে আমাদের উপর নিরন্তর নিপীড়ন চলছে। ডাকাতি করা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তবুও যেখানেই যে কোন দল ডাকাতি করুক না কেন, আমাদের উপর অত্যাচার নেমে আসে। এ অত্যাচার কতদিন সহ্য করা যায়, আপনিই বলুন।

একথার জবাব দিতে পারিনি। এরপর মাস্টারদার সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হয়নি। অবিশ্যি দেখা হয়েছিল মাস্টারদার সহকারী ও বেপরোয়া কর্মী লোকনাথ বলের সঙ্গে।

লোকনাথকে বলেছিলাম, এখন ত সকল সম্প্রদায়ের জন্য আমাদের দলের দরজা খোলা রয়েছে, কাজেই চাটগাঁর মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা কাজ করতে শুরু করেন না কেন?

লোকনাথ বললেন: মাস্টারদা ত চট্টগ্রামের মুসলিম নেতাদের সমর্থনের উপরই দাঁড়িয়ে আছেন। জনাব কাজেম আলী মাস্টার সাহেবত মাস্টারদাকে নিজের ছেলের মত মনে করেন। তাছাড়া রফিউদ্দিন সিদ্দিকী, আমানত খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছাড়া আরো কয়েকজন নেতা অত্যন্ত গোপনে আমাদের নিয়মিত অর্থ সাহায্য করছেন। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্যে কিছু করতে চান না। বাহার তার পকেটের সব টাকাই আমাদের তহবিলে দেয়। কিন্তু সে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে চায় না আর আমরা মুসলমান নেতাদের সঙ্গে না নিয়ে মুসলমান জনসাধারণের কাছে যেতে সাহস করিনে। অনুশীলন পার্টী তাদের উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতির জন্য বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করে রেখেছে। এটাই হচ্ছে আমাদের অসুবিধে। চাটগাঁর বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে অস্ত্রাগার লুন্ঠনের আগে আর কোন আলাপ করার সুযোগ আমার হয়নি।

এখন মাস্টারদার ব্যক্তিগত জীবনের উপর একটু আলোকপাত করা যাক। চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামের রাজমনি সেনের পুত্র সুর্য্যসেন। সংসারে তাঁর বাপ-মা বড় ভাই একবোন ও ছোট দুটি ভাই। ১৯১৬ সালে আই, এ, পাস করে তিনি চলে গেলেন বহরমপুরে এবং কৃষ্ণনাথ কলেজে বি, এ, ক্লাশে তিনি ভর্তি হলেন। এখানেই সুর্য্যসেন বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পাস করে চট্টগ্রামে ফিরে এলেন এবং জাতীয় বিদ্যালয়ে অংকের শিক্ষকের চাকুরী নিলেন। চাকুরী তিনি করতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও বন্ধুদের তিনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিতে লাগলেন। ১৯২০ সালে সুর্য্যসেন চাকুরী ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন।

১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী চৌরি-চৌরায় কংগ্রেসীদের হিংসাত্মক কাজ কারবারের প্রতিবাদে গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। এতে বাংলার তরুণ সমাজ ক্ষুদ্ধ হল। সারা ভারতে নূতন বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রস্তুতি চলল। এই সময় সূর্য্যসেন গড়ে তুললেন সাম্যা শ্রম। চট্টগ্রামের ভাল ভাল ছেলেরা এই আশ্রমে জোট বাঁধলো। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, রাখাল দে, প্রমোদ চৌধুরী এই সময় মাস্টারদার সাথে যোগ দেয়।

মাস্টারদা ঘোষণা করলেন, বিপ্লবের জন্য চাই লোক, অর্থ ও অস্ত্র। সুতরাং—

একটা ঘোড়ার গাড়ীতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের পে-ক্লার্ক বেতনের টাকা নিয়ে যাচ্ছে। টাকার পরিমাণ সতের হাজার। সূর্য্যসেনের দলের চারজন যুবক অনন্ত সিং, দেবেন দে, উপেন ভট্টাচার্য ও রাজেন দাস রিভলভার দেখিয়ে গাড়ীর চালক ও পে-ক্লার্ককে নামিয়ে টাকাসহ গাড়ীটা নিয়ে শহরের উত্তরাঞ্চলে এক মাটির ঘরে সূর্য্যসেনের কাছে উপস্থিত হল। সূর্য্যসেন এখানে বি, আই, এস, এন, স্টীমার কোম্পানীর কেরানীর পরিচয়ে ছদ্মনামে বাস করতেন। পুলিশ এখানে ধাওয়া করল। বিপ্লবীরা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গেল। সূর্য্যসেন চট্টগ্রাম এলাকা ছেড়ে আসামে পালিয়ে গেলেন। এখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন চট্টগ্রামের রাজেন দাস ও খুলনার রতিকান্ত।

আসামের গুপ্ত আশ্রয়ে থেকে সূর্য্যসেন বহুস্থানে কর্মকেন্দ্র গড়ে তুললেন। তাঁরা এবার পরিকল্পনা করলেন বাংলার দশটি জেলার অস্ত্রাগার দখল করার। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সূর্য্যসেন কলকাতায় গিয়ে শোভাবাজারে এক বাড়ীতে ঘাঁটি করলেন। এটা '২৪-২৫ সালের কথা। এর মধ্যে কাকোরী ট্রেন ডাকাতি ও দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা আবিষ্কার হয়ে গেছে। কাকোরী ট্রেন ডাকাতিতে রাজেন লাহিড়ী ও আশফাক উল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ট্রেনের মেলব্যাগে অতি সামান্য টাকা পাওয়া যায়। রাজেন লাহিড়ী ধরা পড়ার মাসখানেক পর আশফাক উল্লাহ ধরা পড়েন। এ'দের ফাঁসি হয়। সূর্য্যসেনের নেতৃত্বে দক্ষিণেশ্বরে যে বোমা তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়, কাকোরী ডাকাতি সেই

কারখানা অস্ত্র সরবরাহ করার প্রয়োজনে সংগঠিত হয়।

সূর্য্যসেন এই সময় শোভা বাজারে। পুলিশ শোভাবাজার ঘাঁটির সন্ধান পেয়ে বাড়ীটা ঘিরে ফেলে। সূর্যাসেন পানির পাইপ বেয়ে পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যান। সূর্য্যসেনের সঙ্গী প্রমোদ রঞ্জন নেতাকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশের হাতে বন্দী হন। সূয্যসেন বেশীদিন পালিয়ে থাকতে পারলেন না। ১৯২৫ সালেই তিনি কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অন্য অনেক বন্দীর সাথে সূর্য্যসেনও বাংলার বাইরে রত্ন-গিরী জেলে বদলি হলেন। এখান থেকেই ১৯২৮ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯২৯ সাল থেকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের আবার প্রস্তুতি চলতে লাগলো। অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আবদুর রাজ্জাক খাঁ আগে অনেক সাহায্য করেছেন। কলকাতার ও চট্টলার বিপ্লবীরা রাজ্জাক সাহেবের কাছে এ জন্য ঋণী। কিন্তু ১৯২৯ সালের পর থেকে রাজ্জাক সাহেব কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। সন্ত্রাসবাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অনেক বেশী মূল্য দিয়ে অস্ত্র সংগৃহীত হতে লাগলো। আর তার অর্থ কর্মীদের আত্মীয়-স্বজনই যোগাতে থাকলেন। আগেই বলেছি, অর্থের জন্য ডাকাতি করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে অনন্ত সিংহের দিদির অর্থে একখানা গাড়ী ও মহেন্দ্র চৌধুরীর টাকায় আর একখানা গাড়ী কেনা হয়।

দলের গোপন সভায় ঠিক করা হল, ১৯৩০ সালে ১৮ই এপ্রিল "আইরিশ বিদ্রোহ" দিবসে তাদের যাত্রা শুরু হবে। এই অভিযানের সর্বাধিনায়ক সূর্য্যসেন। অনন্ত সিং ও গনেশ ঘোষের উপর দেয়া হল, নিজাম পল্টনে সরকারী অস্ত্রাগার ও রিজার্ভ পুলিশ লাইন আক্রমণের ভার, লোকনাথ বল ও নির্মল সেন ভার নিলেন পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী বাহিনীর অস্ত্রাগার লুটের, অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর ভার দেয়া হল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন বিধ্বস্ত করার। উপেন ভট্টাচার্য নিলেন রেল লাইন ধ্বংস করার দায়িত্ব।

ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে রাত পৌনে দশটায় বিভিন্ন দল বিভিন্ন পথে অভিযানে বেরুলেন। কাজও বেশ সুষ্ঠভাবে শেষ হল। সরকারী

অস্ত্রাগার সহজে দখল করে সূর্য্যসেন সেখানে বিপ্লবীদের সদর দফতর করলেন। ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সেখানে তে-রঙগা পতাকা উড়তে লাগলো।

১৯শে ও ২০শে এপ্রিল বিপ্লবীরা প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখান থেকে শহরে ফেরার পথ নেই। পাহাড়ের দু'দিক থেকে কর্নেল ডালাস স্মিথের নেতৃত্বে ইস্টার্ণ রাইফেল ও সুর্মা ভ্যালি রেঞ্জার্স এগিয়ে আসছে। ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় সূর্য্যসেন আদেশ দিলেন : আক্রমণ কর।

সেনাপতি লোকনাথ বল বিপ্লবী বাহিনীকে দু'দিকে ভাগ করে গুলি চালাতে নির্দেশ দিলেন। দু'ঘন্টা ধরে তুমুল যুদ্ধ চলল। শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজরা তাদের আড়াইশ সৈন্যের মৃতদেহ ফেলে রেখে পিছনে হটলো। বিপ্লবীদের পক্ষে ১১ জন মারা গেল। তার মধ্যে ১৪ বছরের এক কিশোর ছিল— লোকনাথ বলের ছোট ভাই হরিপদ বল (টেগরা)।

এই ঘটনার মাত্র ১৩ দিন পর কালার পোলে আর একখণ্ড যুদ্ধ হয়। সেটা ৬ই ও ৭ই মে'র কথা। সূর্য্যসেন তখন কোয়েপাড়ায় বিনয় সেনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর আদেশে চারজন তরুণ বিপ্লবী কালার পোলে রওনা হল। এখানে এক মুসলিম পরিবার এদের তাদের বাড়ীর পিছনে লুকিয়ে রাখে। দিনের আলোয় ওদের দেখতে পেল ইংরেজ সেনারা। চারজন বালকের প্রত্যেকেই যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করলো। কিন্তু আত্মসমর্পণ করলো না।

সূর্য্যসেনকে ধরার জন্য দশ হাজার টাকা এনাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রামের আপনজন, সকলের প্রিয় সূর্য্যসেনকে ধরিয়ে দেবার মানুষ সেখানে বুঝি পাওয়া যাবে না। তাই দেড় বছরের মধ্যে সূর্য্যসেনকে ধরা যায়নি।

কানুনগো পাড়ায় ধলঘাটের গুপ্ত আড্ডায় এসেছেন মাস্টারদা। গৃহকর্ত্রী সাবিত্রী দেবী তাঁর কন্যা স্নেহলতা ও তার পুত্র রামকৃষ্ণসহ এই বাড়ীতে থাকেন। সূর্য্যসেনের সাথে আছেন নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। এই সময় কয়েকজন মেয়ে কর্মী মাস্টারদার সঙ্গে যোগ দিলেন— এদের মধ্যে ভুলু ও রানী অত্যন্ত বেপরোয়া। ভুলুর আসল নাম কল্পনা

দত্ত ও রানীর প্রীতি লতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতি ছিলেন নন্দম কানন বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। এ ছাড়াও কুন্দপ্রভা, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রক্ষিত, নিরুপমা বড়ুয়া ও বকুল দত্ত দলে যোগ দিলেন।

শ্রীপুর গ্রামে কুন্দপ্রভা সেনের আশ্রয়ে থেকে সূর্য্যসেন বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করছেন। এবার তাঁদের লক্ষ্য প্রদেশের ইনস্পেক্টর জেনারেল ক্রেক। একে হত্যা না করলে বিপ্লবীদের রেহাই নেই। এ জন্য নির্বাচিত হল রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, কালীপদ চক্রবর্তী। রামকৃষ্ণ চট্টগ্রাম কলেজের মেধাবী ছাত্র।

১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর। তারা রওনা হল চাঁদপুর ষ্টেশনে। কারণ ক্রেক চাটগাঁ মেলে চাঁদপুর হয়ে কলকাতায় যাচ্ছে। রেল প্লাটফর্মে ওরা অপেক্ষা করে। এমন সময় দেখতে পায় পুলিশের পোশাকে একজন সাহেব ধরণের লোক প্রথম শ্রেণীতে বসে আছে। ওরা লোকটিকে ক্রেক মনে করে গুলি চালায়। ক্রেক নয়, ইনস্পেক্টর তারিণী মুখার্জীর প্রাণহীন দেহ ট্রেনের কামরায় লুটিয়ে পড়লো। ওরা দু'জনই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কম বয়েস বলে কালীপদ চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হল।

রামকৃষ্ণ যে কয়দিন জেলে ছিল, বোন পরিচয়ে অমিতা নাম্নী একটি মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতো। ফাঁসির দিনেও রামকৃষ্ণ অমিতার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছিল। এই অমিতা ছিল পাহাড়-তলি রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণের নায়িকা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

১৯৩১ সালের জুন-জুলাই। কানুনগো পাড়ায় সূর্য্যসেন লুকিয়ে আছেন। পুলিশ সন্দেহের বশে দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে সকলের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অত্যাচারের নায়ক ছিলেন গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ। একেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চৌদ্দ বছরের এক কিশোর হরিপদ ভট্টাচার্যের উপর এই দুরুহ কাজের ভার পড়লো। একদিন সুযোগ এসে গেল।

১৯৩১ সালের ৩০ শে অক্টোবর নিজাম-পল্টন ময়দানে ফুটবল ফাইন্যাল খেলা। জজ, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি জাঁদরেলদের ভিড়।

খেলার শেষে খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ কয়েকজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আলাপে রত। এই সময় কিশোর হরিপদ পর পর চারটি গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে আহসানউল্লাহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হরিপদ স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়। অকথ্য অত্যাচার সত্তেও পুলিশ তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের করতে পারেনি। শেষে বিচারে হরিপদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

আহসানউল্লাহর হত্যার পর পুলিশের তরফ থেকে প্রচারণা চালান হয় যে, আহসানউল্লাহ যেহেতু মুসলমান, সেইহেতু হিন্দুরা তাঁকে হত্যা করেছে। এর ফল ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল। মুসলমান ও গুণ্ডা শ্রেণীর হিন্দুরা শহরের হিন্দুদের দোকানপাট লুঠ করতে শুরু করল। ভয়াবহ পরিণতির সম্ভাবনা রোধ করার জন্য মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ নেতারা শহরে শান্তি স্থাপনের জন্য বের হলেন। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় হাঙ্গামা প্রশমিত হল, তবে বিপ্লবীদের মনোবল অনেকখানি ভেঙ্গে গেল। বিপ্লবীরা যখন মুসলমান জনগণকে সঙ্গে নেয়ার পরিকল্পনা করছে, সে সময় আহসানউল্লাহকে হত্যা করা তাঁদের ভুল হয়েছিল।

’৩২ সালের ১৩ই জুন। একদল সৈন্য সাবিত্রী দেবীর বাড়ী ঘেরাও করে। মাস্টারদা সৈন্যদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন, কিন্তু বিপ্লবী অপূর্ব সেন নিহত ও নির্মল সেন মারাত্মকভাবে আহত হলেন। ইংরেজ ক্যাপটেন নিহত হল বিপ্লবীদের গুলিতে।

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত দশটা। পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে চল্‌লেন দলবল নিয়ে প্রীতিলতা। পরনে পূর্ণ সামরিক পোশাক। সাথে মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, কালী দে, শান্তি চক্রবর্তী ও প্রফুল্ল দাস কাট্টলীর আশ্রয় স্থল থেকে মাস্টারদার আশীর্বাদ নিয়ে।

আক্রমণ ঠিকমতোই চললো। অনেক ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা নিহত ও আহত হল। শ্বেতাঙ্গদের দম্ভ বাংলার এক বীর তরুণী ধুলায় লুটিয়ে দিল। প্রীতির সঙ্গী মহেন্দ্র চৌধুরীকে হাতের রিভলভারটা ফিরিয়ে দিয়ে প্রীতিলতা বললেন, মাস্টারদাকে প্রণাম দিয়ো।

আমি পটাশিয়াম সায়েনাইড খেয়েছি। তোমরা আমার শুভেচ্ছা নিয়ে এগিয়ে যাও।

সূর্য্যসেন কাট্টালীতে আর থাকতে পারলেন না। ধলঘাট থেকে তিন মাইল দূরে গৈরলা গ্রামে বিশ্বাস বাড়ীতে উঠেছেন তিনি। পাশের বাড়ীর নেত্র সেন ইংরেজদের এনামের লোভে পুলিশে খবর দেয়। ফলে ১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী সূর্য্যসেন ধরা পড়েন।

বিচারে সূর্য্যসেনের ফাঁসির হুকুম হয়। মাস্টারদার ফাঁসির তারিখ ঠিক হয় '৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী প্রত্যুষে। কিন্তু ১১ই জানুয়ারী রাত্রে জেলখানায় তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল। বন্দীদের উপর জেল পুলিশও য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গুণ্ডারা অমানুষিক মারপিট শুরু করে। এই মারা-মারিতে মাস্টারদা ভীষণ আঘাত পান। তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। পরে শোনা গিয়েছিল যে, ১১ই জানুয়ারী রাত ১২-৪০ মিনিট অর্থাৎ ভোর হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগেই তাঁর ফাঁসি হয়।

আমি তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে আটক। বেদনাবিধুর মন, কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। মাস্টারদা যে পথ নিয়ে-ছিলেন, সে পথ আজকের বিবেচনায় নির্ভুল ছিল না, কিন্তু বৃটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য এবং তরুণদের মনে স্বাধীনতার আগুন জ্বালাতে মাস্টারদা সক্ষম হয়েছিলেন, এটাই বড় লাভ। আর এ জন্যই মহাবিপ্লবী সূর্য্যসেন অমর হয়ে থাকবেন।

॥ তিন ॥

পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে, একথা জানাজানি হয়ে গেল। অভিভাবকদের ভাবনার অন্ত নেই, বিধবা মা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতে লাগলেন। এবং তাঁরা অনেক শলা-পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, তাঁদের ছেলেকে বাঁচাবার একমাত্র দাওয়াই, একটা বিয়ে দেয়া। আমি বিয়ে করতে রাজী কিনা, তা জানবার দরকার ও তাঁরা মনে করলেন না। পাত্রীর সন্ধান চলতে লাগলো, এ-গাঁও সে-গাঁয়। আমি ঘাড় বেঁকিয়ে বসলে মায়ের কান্নার মাত্রা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। মা এবং অভিভাবকগণ সুন্দরী পাত্রী খোঁজেন, কারণ তাঁদের মতে সুন্দরী বউ না হলে নাকি আমাকে ঘরে আটকে রাখা যাবে না। যখন বুঝতে পারলেম যে শত অনিচ্ছায়ও আমাকে বিয়ে করতে হবে, অন্তত মা-কে বাঁচাবার জন্য, তখন জানিয়ে দিলাম যে সুন্দরী পাত্রী খুজবেন না, গরীবের মেয়ে এবং একটু শিক্ষিতা খুজে বের করতে পারেন। এতেও তাঁদের মনে সন্দেহ জাগলো যে, অসুন্দরী পাত্রী বিয়ে করতে চাওয়ার অর্থই ও মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়তে চায় না। তবু তাঁদের অনুসন্ধান চলতে থাকে।

১৯৩০ সালের শীতকালের দিকে আমার চাচাত বোনের আকদ উপলক্ষে কলকাতা থেকে ঢাকায় আসি। সেখানে আর এক চাচাত বোনকে দেখলাম। সে কৃষ্ণকায়া এবং অবিবাহিতা। তবে তার চোখে-মুখে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। মনে হল, এই মেয়েটা হলে মন্দ হয় না। আত্মীয়-স্বজনরাও বলাবলি করেন এই একই কথা।

আমি বিয়ে করতে রাজী হয়েছি শুনে বড় চাচা মওলবী মুজিবুর রহমান যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তিনি একদিন আমায় পাশে বসিয়ে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিলেন। আমি কিন্তু মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করছিলাম। যিনি চিরকুমার,

তিনিই উপদেশ দিচ্ছেন বিবাহিত জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে।

যাহোক, আমার ইচ্ছাকে অভিভাবকরা মেনে নিয়ে ব'কায়দা পাত্রী পক্ষের সংগে কথাবার্তা চালাতে থাকেন। এর মধ্যে পাত্রীর পিতা এন্তে-কাল করেন। ফলে, আপাতত আলাপ-আলোচনা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিছুদিন পরে আবার আলাপ-আলোচনা শুরু হল এবং শেষও হল। অর্থাৎ বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেল। কন্যাপক্ষের দাবী দুইখানি সোনার গহনা দিতে হবে। অভিভাবকরা আমার মতামত না নিয়েই স্বীকার করে এলেন। কিন্তু এদিকে যে আমার নাভিশ্বাস, তা তাঁরা বুঝলেন না। গহনা কেনার টাকা পাবো কোথায়? যে বেতন পাই, তাতে চার-পাঁচজনের সংসারে কোন রকমে দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া চলে, বিয়ের বিলাসিতা, তার ওপর গহনার চাপ, সহ্য করবো কি করে?

যাহোক, মাথায় একটা বুদ্ধি গজালো। বড় বোনের কিছু গহনা আছে। বড়লোকের বউ-ত, গহনা তাঁর গা-ভরা। এই বোনের গরু সাত টাকায় বিক্রয় করেই কলকাতায় প্রথম পালিয়ে আসি। এবার বিয়ের সময় তাঁর কয়েকখানা গহনা নাহয় চেয়ে নিয়ে কাজ সারবো। আবার ফিরিয়ে দিলেই হল।

পরিকল্পনা মাফিক কাজ হল। ১৯৩০ সালের ২৫শে মে বিয়ে করে ফেললাম। বাচ্চা গৃহিণী ঘরে এল। পাড়াপড়শীরা বউ দেখে নাক সিটকায়। ঘর আলো করা বউ না এনে আনলো কিনা ঘর আঁধার করা কালো বউ! আমি অনেককে ঝাঁঝালো কন্ঠে বলি: রাতে ঘুমাবার সময়-ত ঘর আঁধার করেই শুতে হয়। পড়শীরা চটে না, হাসতে হাসতে চলে যায়।

কয়েক মাস নিরাপদে কাটলো। আমার বড় বোনের পেটের কথা হযম হয়না। কখন যে নতুন গৃহিণীকে বলে দিয়েছে যে, তার গায়ে যে সব গহনা রয়েছে, তা সবই তাঁর। এক শনিবারে গ্রামের বাড়িতে এসে দেখি গৃহিণীর গায়ে একটাও গহনা নেই। কারণ জিজ্ঞাসা করতে

সে বলল : পরের কাছে ধার করা গহনা না নিয়ে বিয়ে করলে অগৌরবের কিছু ছিল না। তুমি ভুল করেছ, অন্যায় করেছ। আমি গহনাগুলি বড় বুবুকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

আমি বেওকুফ বনে গেলাম। এর-পর গহনা সম্পর্কে আর কোন কথা ওঠেনি। যখন আমার অবস্থা একটু ভাল হল, তখনও গহনা বা ভাল কাপড়-চোপড় কিনতে তাকে রাজী করাতে পারিনি। খদ্দরের মোটা কাপড় ছাড়া তার আর কিছু কাম্য ছিল না।

মা আমার স্বপ্ন দেখছিলেন, পুত্রবধূ নিয়ে তিনি সুখের সংসার গড়বেন। পুত্র তাঁর ঘরমুখো হবে। কিন্তু অচিরে তাঁর সে স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমার স্ত্রী একদিন আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলো : "দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সকলের যোগদান করা উচিৎ, একথা তুমি বিশ্বাস কর ?"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

আবার প্রশ্ন : "মেয়েদেরও এই সংগ্রামে শরীক হওয়া উচিত বলে তুমি কি মনে কর ?"

"হ্যাঁ, মনে করি। আমাদের সঙ্গী অনেক মেয়ে আছে। তারাও জীবনপাত করতে প্রস্তুত," আমি জওয়াব দিলাম।

"তাহলে তোমার স্ত্রী যদি স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়, তুমি কি আপত্তি করবে ?"

আমি বললাম : "আপত্তি করব কেন ? তবে তোমার বয়েস তো খুব কম !"

ও আর কিছু বল্ল না। আমিও বিপদ কেটে গেল মনে করে নিশ্চিন্ত হলাম।

❋

১৯৩২ সাল। অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন আবার জোরে-শোরে শুরু হয়েছে। দলে দলে গান্ধীবাদীরা আইন অমান্য করে জেলে যাচ্ছে ২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হবে। এ জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এই সময় আমার স্ত্রী হঠাৎ গ্রাম

থেকে কলকাতায় এলো ২৫শে জানুয়ারী সকালে, সে আমাকে বলল যে ২৬শে জানুয়ারী মনুমেন্টের তলায় এক বিরাট সভা হবে। অধ্যাপিকা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী এই সভায় সভানেত্রীত্ব করবেন কথা ছিল, কিন্তু তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। আমি এই সভায় জাতীয় পতাকা তুলবো ও সভানেত্রীত্ব করবো। তুমি বাঁধা দিতে পারবে না।

আমি গৃহিনীর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিন্তু বারণ করতে পারলাম না। তবে বললাম, তোমার সঙ্গে আমি সভাস্থলে যেতে পারব না, কারণ গান্ধীবাদে আমার আস্থা নেই। পুলিশের মার খেয়ে কখনো স্বাধীনতা আসবে না, মার দিতে পারলে তবেই স্বাধীনতা জয় করে নিতে পারবে।

আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও একদল মেয়ে নিয়ে কয়েকটি মোটরযোগে ময়দানে চলে গেল, সঙ্গে ছিলেন সৈয়দ জালালুদ্দিন হাশেমী। ২৬শে জানুয়ারীর বেলা তখন তিনটা। বেলা ছয়টায় আমার এক মাড়োয়ারী পিয়ন এসে খবর দিল যে ময়দানে আমার স্ত্রী কংগ্রেসের পতাকা উড়িয়ে যখন জনতার সামনে বক্তৃতা করছিল তখন কয়েকশত পুলিশ তাদের ঘেরাও করে পুলিশ ভ্যানে তুলে লালবাজার পুলিশ সদর দফতরে নিয়ে গিয়েছে।

খবর পেয়ে আমি মুষড়ে পড়েছিলাম। বড় চাচা আমাকে বুঝাতে লাগলেন, অতটুকু মেয়ে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তাতে মুসলমানদের মাথা উঁচু হয়েছে। তোমার এত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না। বড় চাচার কথায় আবার আমি সম্বিত ফিরে পেলাম।

পরদিন লর্ড সিংহের এজলাসে বিচার হল। প্রায় সত্তর জন মেয়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। আমার গৃহিণীও তাদের একজন।

আদালত প্রাঙ্গণে আমার স্ত্রী তার গলার হার ও কানের দুল আমার হাতে তুলে দিয়ে শুধু বলল, চললাম জেলে দেখা করবে। আমার সঙ্গে ছিল আমার ফুফাতো ভাই ইসমাইল। সে পরে দাউদ কর্পোরেশনের ডিরেক্টর হয়েছিল। কায়রোর পি আই এ বিমান দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। সে আমার স্ত্রীকে বলল যে অচিরেই সেও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবে। যোগ সে সত্যিই দিয়েছিল।

আমার স্ত্রী হোস্‌নে আরার কারাদণ্ডের খবর ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারীর সমস্ত পত্রিকায় বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হয়। সব পত্রিকায়ই তার পরিচয় দেয়া হয় ডাঃ শহীদুল্লার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিসেবে, আমার স্ত্রী হিসেবে নয়। সাংবাদিকরা এই পরিচয় কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল জানি না। আমি চাইনি, কোনও আত্মীয়ের নাম এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হোক। কিন্তু যা চাইনি, তাই হয়ে গেল।

কলকাতার প্রেসেডেন্সি জেলে প্রায় সত্তর জন রাজবন্দিনীকে এক বিরাট ওয়ার্ডে রাখা হয়। এখানে ছিলেন অধ্যাপিকা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, দেশবন্ধুর বোন উর্মিলা দেবী, বিপ্লবী বীণা দাসের বড় বোন কল্যাণী দাস, কুমিল্লার স্টীভেন্স্‌ হত্যা মামলার আসামী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী, ঔপন্যাসিক প্রবোধ কুমার সান্যালের ভাগিনেয়ী নলিনী মৈত্র পরে পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন যে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, তাঁর বোন যমুনা ঘোষ। বিদ্যাসাগর পরিবারের মেয়ে আরতি মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। প্রতি পনের দিন অন্তর আমি জেলে দেখা করতে যাই। প্রতিবারই কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি হোসনে আরার মধ্যে। জেল জীবনের দুঃখ-বেদনার ছাপ তার চোখেমুখে নেই, তার জায়গায় দেখতাম একটা শান্ত সমাহিত ও আনন্দোজ্জ্বল চেহারা। পরে জেনেছিলাম যে, রাজবন্দিনীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা মেয়ে বলে সে আর সব মেয়ের আদরের পাত্রী হয়ে পড়েছে। তার কল্যাণী দিদি তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমায় আর লেখা পড়া শেখায়। শান্তি ও সুনীতি তাকে হাতে করে ভাত খাওয়ায়। যেন ও সবার আদরের দুলালী। কোনোদিন জেলে দেখা করতে গিয়ে দেখি ফুলের মালা পরে, হাতে ফুলের কাঁকন, মাথায় ফুলের টোপর পরে সে আমার সামনে হাজির। দেখে হাসবো কি কাঁদবো তার দিশা পাই না। জেল অফিসে বসে আলাপের মধ্যে হোস্‌নে আরা বললঃ জানো, আমার দিদিরা আমাকে এত হাসি-খুশীর মধ্যে রাখে যে, আমি বাড়ীর কথা ভাববারও সময় পাইনে। তাছাড়া পড়াশুনার মধ্যে আমি কিছু কবিতা লিখছি। দিদিরা বলেছে, ভাল হচ্ছে। তুমি একটা ফাউন্টেন পেন, খাতা ও রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কিছু বই আমাকে দিয়ে যেয়ো। অবশ্য পরের বার সাক্ষাতের সময় সবই দিয়ে এসেছিলাম।

১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার। বিকেলে কলেজ স্কোয়ারে মুসলিম পাবলিশিং হাউসে আফজালের সংগে গল্প করছি, এমন সময় ইউনিভারসিটি সিনেট হল থেকে দুটি গুলির শব্দ ভেসে এল। সংগে সংগে সমস্ত কলেজ স্কোয়ার ও কলেজ স্ট্রীটে পুলিশের সে কি ছুটোছুটি। সকলের মুখে দারুণ আতঙ্কের ভাব। সবার মুখেই এক কথা, পালান পালান, এখনই পুলিশী জুলুম শুরু হবে।

ব্যাপার কি, জানবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকি। পরে খবর পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বীণা দাস নাম্নী এক গ্রাজুয়েট মেয়ে গবর্ণর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী মেয়েটিকে ধরে ফেলেন, সে জন্য গবর্ণর প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার বীণা দাসের বিচারের রায় বের হয়। তাঁকে নয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। প্রেসিডেন্সী জেলে হোস্নে আরা ও বীণার বড় বোন কল্যানী দাসের সংগে একই ওয়ার্ডে তাকে রাখা হয়।

আমার পারিবারিক জীবনে এবার নতুন করে ঝড় উঠলো। হোস্নে আরার চাচাত ভাই ডঃ শহীদউল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র সফিউল্লাহ আমাকে খুব কঠোর ভাষায় একখানা পোস্টকার্ড লিখে জানালো: আমার বোনকে জেলে পাঠিয়ে নিজে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুতরাং আমি নাকি কাপুরুষ। হোস্নে আরার পরিবারের অনেকে চেস্টা করতে থাকে ওকে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য। ওর খালু জেলের একজন বড় কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ছাড়িয়ে আনার মতলব আঁটছিলেন, কিন্তু প্রেসিডেন্সী জেলে আটক থাকায় সে সুযোগ তাঁর ঘটেনি।

পয়লা মার্চ, ১৯৩২ সাল। সোমবার। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলায় রায় বের হয়। দু'জনের ফাঁসি ও ১২ জনের দ্বীপান্তর দণ্ড দেয়া হয়। এর কয়েকদিন আগে অস্ত্রাগার মামলার আসামী বিধু সেন আমার গ্রামের বাড়ীর কাছে অন্তরীণ ছিল। সে অন্তরীণ আদেশ অমান্য করে আমাদের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে তাঁর ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

'৩২ সালের' ৪ঠা মার্চ কলকাতায় এবং দেশের অন্যান্য স্থানে "গান্ধী দিবস" পালিত হয়। এই দিন আইন অমান্য করে মিছিল করায় আমার ফুফাতো ভাই ইসমাইল গ্রেফতার হয়। তার ছয় মাসের জেল হয়। এই সময় আমি হাড়োয়া থানা এলাকায় একটি বিপ্লবী সমিতি গড়তে উদ্যোগী হই। দুঃখের বিষয়, এই সমিতিতে যারা আগ্রহভরে যোগ দিতে এল তাদের বেশীর ভাগই হিন্দু। যাহোক, জনসেবা সংঘ নাম দিয়ে সমিতি গড়া হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কম্যুনিস্টরা সে সমিতি দখল করে কিষাণ সমিতি গড়ে ফেলল। এই কাজটা করেছিল আমারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাসবিহারী ঘোষ। পরে এই সমিতি হাড়োয়া সন্দেশখালী থানা এলাকার কম্যুনিস্টদের সুদৃঢ় ঘাঁটি হয়েছিল। এবং মুসলমানরাও দলে দলে এই সমিতিতে যোগদান করেছিল। ওদের তৎপরতার ফলে সে এলাকায় কোনদিন সম্প্রদায়িক হাংগামা হয়নি। এমনকি, ভারত ভাগ হওয়ার সময় পূর্ববঙ্গের রিফুজিরাও সে অঞ্চলে জায়গা পায়নি।

কম্যুনিস্টদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিশের দৃষ্টি এই অঞ্চলের উপর পড়েছিল। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে একদল পুলিশ হাড়োয়া থানার (২৪ পরগনা) কুলগাছি গ্রামে ধরপাকড়ের জন্য হানা দেয়। কিন্তু তরুবালা নাম্নী এক মাছওয়ালীর নেতৃত্বে শত শত কিষাণ ও জেলে পুলিশদের ঘেরাও করে ফেলে এবং পুলিশ ইনস্পেক্টর আবদুল লতিফকে পানির তলায় জীবন্ত কবর দেয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু আমার এলাকার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপের ফলে ইনস্পেক্টর ও তার দল নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায়। শুনেছি, এই ঘটনার পর ইনস্পেক্টর সাহেব সেখান থেকে বদলী হয়ে যান। পুলিশ আর কোনদিন এই এলাকায় হানা দিতে সাহস করেনি।

'৩২ সালের ৭ই মার্চ সোমবার বিকেলে কবি শাহাদৎ হোসেন অক্টারলোনী মনুমেন্টের পাদদেশে সভা করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। পরদিন তাঁর বিচার হয়। কবিকে চার মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ইতিমধ্যে হোসেনে আরাকে তার দলবলসহ কলকাতা থেকে মেদিনী-

পুরের হিজলী মহিলা স্পেশাল জেলে বদলী করা হয়েছে। ১০ই মার্চ তার সংগে দেখা করতে যাবো ঠিক হয়ে আছে। জেলখানায় দেয়ার জন্য এক শিশি মীরা স্নো নয় আনায়, তিনপোয়া বোতলের এক বোতল নারিকেল তেল এক টাকায়, একজোড়া স্যাণ্ডেল এক টাকায় এবং আমার গায়ের একজোড়া খদ্দরের শার্ট এক টাকা বার আনায় কিনলাম। বাসায় ফিরে দেখি হিজলী জেল থেকে পত্র এসেছে যে, আমার ইন্টারভিউ বাতিল হয়ে গেছে, কারণ হোস্‌নে আরার খালু ও খালাতো ভাই বিশেষ অনুমতি নিয়ে সাক্ষাৎ করে গেছেন। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়ে। যে সব আত্মীয়-স্বজন আমাদের দু'জনকে গালিগালাজ ছাড়া আর কিছু করে না, তাদের আবার দরদ উথলে উঠলো কেন?

আমি প্রায় ক্ষেপে গেলাম। সংগে সংগে আমার খালা শাশুড়ীর কাছে পত্র লিখে কৈফিয়ত চাইলাম, কেন খালু দেখা করতে গিয়েছিলেন, এবং কোন অধিকারে?

খালা শাশুড়ী আমার সে পত্রের জবাব দিয়েছিলেন, তবে অত্যন্ত নির্মমভাবে। তিনি লিখেছিলেন, হোস্‌নে আরা তার স্বামীর সংগে দেখা করতে চায় না, তাই আমরা তার দেখা-শুনার ভার নিয়েছি। অভিনব সংবাদ বইকি!

পরের তারিখে জেলে গেলাম দেখা করতে। হোস্‌নে আরা হাসতে হাসতে বলল: জান, খালু এসেছিলেন দেখা করতে। আমি হুকুম দেইনি, তবুও তিনি দেখা করেছেন এবং আমার হাতে একখানা কাগজ দিয়ে বলেছিলেন, এটায় সই করে দাও, তোমাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যাই। আমি খালুকে ইংরেজের দালাল, দেশদ্রোহী আরো কত কি বলেছি। তিনি শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচলেন। বলেই তার সে কি হাসি!

আমি তখন তার খালার পত্রের কথা বললাম! সে তো অবাক! বলল, ওদের কথা কোনোদিন বিশ্বাস করো না! অন্য জাতের মানুষ ওরা। মান-সম্মানের কোন জ্ঞান নেই ওদের। হোস্‌নে আরার কাছেই জানলাম, শীগ্‌গির ওদের বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেবে।

এ আর এক ফ্যাসাদ বাধালো দেখছি। বহরমপুর, সে কি কম

দূর? যাওয়া-আসায় কমছে-কম তিনদিন লাগবে। যাক, ভেবে আর লাভ নেই, যেতেই হবে।

হিজলী থেকে বাসায় ফিরে বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি। রাত তখন দশটা। ফরোয়ার্ড ব্লকের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এসে খবর দিলেন যে ক্ষিতীশ বাবু কাল সকালে তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে বলেছেন, জরুরী কাজ পড়ে গেছে।

যাবো বলে সম্মতি দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলাম।

ক্ষিতীশ বাবু অর্থাৎ ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সুরেন ঠাকুরের জামাতা এবং কলকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার। সুভাষ চন্দ্রের তিনি ডান হাত। আমি তাঁকে মামা বলে ডাকতাম। কারণ, আমার স্ত্রীর বান্ধবী আরতির তিনি মামা। রাতের প্রতিশ্রুতি মত আমি ক্ষিতীশ বাবুর সংগে দেখা করলাম। তিনি বললেন, একটা দুরূহ কাজ তোমার উপর দেবার নির্দেশ এসেছে। জানি, তোমার স্ত্রী জেলে আছে, তবুও দেশের স্বার্থে তোমাকে মাত্র পনের দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে।

কোথায় যেতে হবে জানতে চাইলাম। তিনি যা বললেন, তাতে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। যে পাঠানদের ভয়ে বৃটিশ সরকার কম্পমান, তাদের এলাকায় যেতে হবে। তুরাঙগজাইয়ের হাজী সাহেবের দরবারে। সুভাষ বাবুর সঙ্গে তাঁর আগে নাকি কি কথা হয়েছিল, তারই সূত্র ধরে আলাপ করতে হবে অস্ত্র সরবরাহ করার ব্যাপারে। হাজী সাহেব ভীষণ ইংরেজ বিদ্বেষী। ফিরিঙ্গী মারার জন্য তিনি যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। বাঙলা থেকে কোন মুসলমান গেলে ভাল হয় বলে আমার উপর ভারটা দেয়া সাব্যস্ত হয়েছে। সৈয়দ জালাল উদ্দিন হাশেমীকে আগে পাঠাবার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্তু তাঁর একখানা পা নেই, আর তাছাড়া তিনি সারা ভারতে খুবই পরিচিত ব্যক্তি, কাজেই পুলিশের ভয়ও আছে।

আমি যাওয়ার জন্য রাজী হয়ে ক্ষিতীশ বাবুর বাড়ী থেকে ফিরলাম। পরদিন কিছু নগদ টাকা ও ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট

ক্ষিতীশ বাবুর লোক আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল। তারিখটা ৭ই এপ্রিল ১৯৩২।

অতিরিক্ত দুই সেট কাপড় একটি কাপড়ের থলিতে নিয়ে রওয়ানা হলেম অজানার উদ্দেশে। পেশোয়ার পর্যন্ত দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে দুই দিনের বেশী সময় লেগেছিল। পথের নয়নাভিরাম দৃশ্য আমার ভাবনাকে দূর করতে পারেনি। ভাবনা আর কিছুর জন্য নয়, যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর দেয়া হয়েছে তা কতটা পালন করতে পারব, তার জন্য। তাছাড়া, পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে পারবো কিনা, সে ভাবনাও কিছুটা ছিল বইকি।

পেশোয়ার স্টেশনে যখন নামলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। স্টেশন থেকে একটা টোঙগা নিয়ে কাশ্মীর হোটেলে গিয়ে নামলাম। হোটেলে একটা কামরা ভাড়া করে কাপড়-চোপড় বদলিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নেই। দু'দিন ভাত পেটে পড়েনি। প্রথমেই খেয়ে নিলাম। মাংস, ডাল ও ভাত, মনে হল অমৃত সমান।

রাত নয়টায় হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার কোণায় পানওয়ালার দোকান পেলাম। হ্যাঁ, ঠিকইত সেই দোকানটাই, সেখানে সব খবর পাওয়ার কথা ক্ষিতীশ মামা বলে দিয়েছেন। এক খিলি পান মুখে দিয়ে উর্দু ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম: ভাই সাহেব, আকবর শাহকে কোথায় পাবো বলতে পারেন?

পানওয়ালা আমার মুখের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে থাকলো খানিক-ক্ষণ, তারপর মাথা নীচু করে আবার পান বানাতে থাকলো।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করতে লোকটা যেন বিরক্ত হয়ে বলল: আহ, থামুন না একটু। আপনি দেখছি ভারি না-ছবর।

অগত্যা থামতে হল। আকাশ-পাতাল ভাবি। যদি আকবর শাহের দেখা না পাই? যদি তার খোঁজ কেউ না দেয়। ইতিমধ্যে পানের দোকানের সব খদ্দের বিদেয় হয়েছে। দোকানদার একটা ছেঁড়া ন্যাক-ড়ায় হাত দুটো মুছে ভাল হয়ে বসলো এবং আমাকে তার পাশে ডেকে নিয়ে বসতে দিল। তারপর পরম বন্ধুর মত আমার পিঠে হাত রেখে বলল: আপনি ঠিক বাঙ্গালী, তাই না।

আমার স্বীকৃতি জ্ঞাপনের পর সে বলল ঃ শাহ মোহাম্মদ আকবর এই এলাকায় খুব মশহুর লোক। সবাই তাকে ভালবাসে, কিন্তু পুলিশ তার পিছনে হরদম লেগে আছে। তবে তার গায়ে হাত দিতে ভয় পায়। আকবর ভাইয়ার কিছু করলে সারা "য়্যাগস্তান" (সীমান্তের শাসন বহির্ভূত এলাকা) ভেঙ্গে পড়বে।

হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে তখন কথা বলিনি বলে রাগ করেননি তো? জানেন, খদ্দেরের মধ্যে হয়তো টিকটিকি থাকতেও পারে।

আমি তো সব বুঝলাম, কিন্তু আকবর শাহের মেহমান হয়ে এসেছি তো, তাঁকে খবর দিতে হয় একটু।

পানওয়ালা বলল ঃ এসেছেন যখন, এতমেনান সে থাকুন, আপনার হোটেল খরচ সবই তিনি দিয়ে দেবেন। তাঁকে পাওয়া তো মুশকিল, কখন ঘরে থাকে আর কখন থাকে না, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। জানেন, বাঙ্গাল মুলুকের অনেক বড় বড় আদমীর সাথে তার খুব মোহব্বত আছে। এই তো গেল বছর তাঁর মেহমান হয়ে এসেছিলেন আর এক বাঙ্গালী বাবু। যাক, আমি খবর পাঠাচ্ছি। কাউকে না পাই, নিজেই যাবো।

আমি একটু আশ্বস্ত হয়ে হোটেলের কামরায় ফিরে এলাম। সারাদিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

পরদিন বেলা প্রায় ন'টার সময় ঘুম ভাঙ্গালো। দরজায় খট্ খট্ শব্দ। গায়ে শার্টটা চড়িয়ে দরজা খুলতে দেখলাম এক সৌম্যমূর্তি দীর্ঘদেহী পাঠান, মাথায় পাগড়ী, পরণে ঢিলা পাজামা ও কোর্ত্তা। তার সঙ্গে সেই পানওয়ালা। ভদ্রলোক সালাম আলায়কুম করে জানালো তার নাম আকবর। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ওদের ঘরের মধ্যে টেনে এনে বসতে দিলাম।

আকবর জিজ্ঞাসা করলেন, হোটেলে কোন কষ্ট হয়নি তো? খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত হয়েছে কিনা। ইতিমধ্যে পানওয়ালা বিদায় নিয়ে চলে গেল। আকবর বললেন ঃ এই পানওয়ালা আমার পোস্ট অফিস।

খুব বিশ্বাসী আর দেশভক্ত। আজ বিশ বছর ধরে পানের দোকান চালাচ্ছে। পান বিক্রি করে সে পেশোয়ারে দু'খানা পাকা বাড়ী করেছে। ও আগে লালকোর্তা ছিল, কিন্তু এখন আর কোন দলে নেই, তবে সব স্বাধীনতাকামী দলের সঙ্গে ওর মহব্বত আছে।

হঠাৎ আকবর শাহ বেরিয়ে গেলেন এবং খানিক পরেই ফিরে এসে বললেন ঃ এখনই আপনার নাশ্‌তা এখানে আসবে। পেশোয়ার দেখার জন্য তৈরী হয়ে নিন। নাশ্‌তা করে বেরিয়ে পড়া যাবে।

আমরা দু'জনে রাস্তায় বেরিয়ে একটা টাঙগাওয়ালাকে ঠিক করলাম, সে চুক্তিতে শহর ঘুরাবে। প্রথমে আমরা বাস স্ট্যান্ডে গেলাম। দেখলাম, বাস চালক, কন্ডাক্টর সবাই ছুটে এসে আকবরের সঙ্গে মোসাফা (করমর্দন) করতে শুরু করলো। দেখলাম, ওদের উপর আকবরের অসাধারণ প্রভাব। স্টার্টারের সঙ্গে আকবর অনেকক্ষণ ধরে কি সব আলাপ করলো পোস্তু ভাষায়, তার এক রত্তিও বুঝতে পারলেম না।

ফেরার পথে পেশোয়ার দুর্গ দেখলাম। পাহাড়ের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাঠান আমলের এই প্রাচীন দুর্গ। পাশে কোহাট রেল লাইন। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের সারি তা অনেক। পাঠান উপজাতীয় ও যাযাবরদের বস্তি। এই বস্তিবাসীরা কিন্তু খুব পরিশ্রমী, পুরুষ নারী সবাই খেটে খায়। ভিক্ষা করে না, তবে সুযোগ বুঝে কেড়ে কুড়ে নেয় পয়সা-কড়ি। আকবরের মুখে এই সব কাহিনী শুনতে শুনতে হোটেলে ফিরে এলাম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর খুব কষে এক ঘুম দিলাম। যখন জাগলাম, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রাত্রে আকবর এলো। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল। ওর মুখে শুনলাম, সুভাষবসু দু'বার সীমান্ত সফর করেছিলেন। তখন অনেক নেতার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ একবার য়্যাগস্তান গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তুরাঙগজাইয়ের হাজী সাহেব ও ইপির ফকীর ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মওলানা আজাদ গান্ধীজীর অনুসারী হয়ে গেলেন। কিন্তু সুভাষ তাঁর নীতি ছাড়েননি, তবে কংগ্রেসের ভিতরে ঢুকে তিনি জনগণকে তাঁর মতে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমি বুঝতে পারলাম, বাংলায় থেকে সুভাষকে আমরা যতটুকু চিনি, সুদূর সীমান্ত প্রদেশে থেকে এই পাঠানরা তার অনেক বেশী বুঝেছে বা চিনেছে।

অনেক রাত পর্যন্ত আকবর শাহ আমার সঙ্গে থাকলেন এবং চলে যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে ভোর পাঁচটার সময় তিনি আসবেন আমি যেন তৈরী হয়ে থাকি। আমার আর তৈরি হওয়ার কি আছে। একটা ঝুলি আর তার ভিতর এক সেট কাপড়।

※

পেশোয়ার থেকে ঠিক পাঁচটায় বাস ছাড়লো। আমি আকবরের সঙ্গী। আকবরের পরণে পাঠানের পোশাক। পাগড়ী, লম্বা ঢিলা কোর্তা তার উপর কোটি। আর তার সঙ্গে বাঙ্গালী আমি। পরণে পাজামা, শার্ট স্যান্ডেল অর্থাৎ একেবারে বেমানান। বাসে কারুর কারুর মুখে বিস্ময়—মানে এ লোকটা আবার কে? কোথা থেকে এই দুর্বল কালো চিড়িয়াটা এল?

বাস ঘণ্টায় ৩০ থেকে চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে চললো পাহাড়ের গা বেয়ে সরু পথ ধরে। পাশে চেয়ে দেখতে ভয় হয়, এই বুঝি খাদে পড়ে যায়। আর পড়ে গেলে নিস্তার নেই। পাশে কোথাও ত্রিশ ফিট আবার কোথাও দু'শ ফিট গভীর খাদ। কিন্তু পাঠান ড্রাইভাররা এই রকম সরু পথ দিয়েই চলতে অভ্যস্ত। তাই তাদের হাতে স্টিয়ারিং থাকলে দুর্ঘটনার ভয় খুব কম।

একটানা পাঁচ ঘন্টা চলার পর বাসটি খাইবার পাসের এক-প্রান্তে এক বিরাট দুর্গের কাছে এসে দাঁড়ালো। আকবর বললো, এটাই ইংরেজ শাসনের শেষ এলাকা। এরপর থেকে শুরু হয়েছে বৃটিশের শাসন বহির্ভূত এলাকা। এই বৃটিশ শাসন বহির্ভূত এলাকায় পাঠান বা পাখতুনদের আধিপত্য। ইংরেজরা এই পাখতুনদের অনেককে নিয়মিত মাসিক সালামী দিয়ে থাকে।

বৃটিশ শাসন বহির্ভূত এলাকা ছেড়ে আমাদের বাস আরো ঘণ্টাখানেক চলার পর থামলো। এখানে আমাদের নামতে হবে। তারপর যাওয়ার যে তরিকা শুনলাম তাতে পিলে চমকে উঠল।

আকবর আমাকে নিয়ে এক সরাইখানায় উঠলেন। বললেন এখানে কিছু খেয়ে না নিলে পথে ভীষণ কষ্ট হবে। আর কোথাও খাবার পাওয়া যাবে না। সরাইখানার যে অবস্থা দেখলাম, তাতে ক্ষুধা উধাও হওয়ার কথা। ময়লা টেবিল, আধভাংগা চেয়ার আর চটা ওঠা এনামেলের থালা-গ্লাস। দেখলে গা ঘিনঘিন করে। কিন্তু ক্ষুধার তাগিদ ঘৃণাকে ঠেলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আকবর নিজে রান্নাঘরে গিয়ে গরম দুটো নান রুটি ও দু'প্লেট দুম্বার গোশত নিয়ে এলেন। রুটি দেখে তো ভীরমী লাগার যোগাড়। এক-একটা রুটি যেন এক-একটা সাম্রাজ্য। ওজন করলে হয়তো আড়াই সের হয়ে যাবে। গোশতের পেয়ালায় মনে হয় আধখানা করে ভেড়া কেটে রাখা হয়েছে। অবশ্য রুটি ও গোশত থেকে টাটকা ঘি-এর গন্ধ বের হচ্ছে। স্বাদে অতুলনীয়। কিন্তু রুটির সিকিভাগ খেয়েই আমার আর খাওয়ার ক্ষমতা রইল না। এক টুকরা গোশত শেষ করতে পারিনি। আকবর কিন্তু গোশত রুটি সাবাড় করে আরো এক গ্লাস লসসি খেল! আমার পেটে জায়গা ছিল না, তা লসসি ঢালবো কোথায়? তবুও আকবরের গ্লাস থেকে এক চুমুক খেয়ে পেশোয়ার থেকে আনা পান মুখে পুরে দিলাম।

সরাইখানা থেকে বের হয়ে আকবর কাকে যেন হাঁক-ডাক শুরু করলেন। একটা ছোকরা ছুটে এসে জানালো যে সব ঠিক, তার বাপ এক্ষুণি আসছে। বুঝলাম, এরা আকবরের পরিচিত। হয়তো, এই পথে তার প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে হয়।

সগীর খাঁ এল একটা তরতাজা খচ্চরের লাগাম ধরে। খচ্চর হলেও তার আভিজাত্য আছে বলতে হবে, কারণ অবয়বের দিক থেকে সে ঘোড়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আকবর বললেন: এটাই এখন আমাদের বাহন। শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। আমি খচ্চরে চড়তে রাজী হইনি। অনেক আপত্তির পর আকবর বললেন: বেশ, আপনি আলাদা খচ্চরে না চড়ুন, আমার পিছনে বসবেন এবং আমাকে ধরে থাকবেন। সগীর খাঁ লাগাম ধরে আমাদের আগে আগে চলবে। কোনো ভয় নেই।

কথায় বলে: পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

ঘোড়া চড়তে ভয় হয়, আর খচ্চর চড়তে হয় লজ্জা। কিন্তু লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে আকবরের পিছনে উঠে বসলাম। সগীর খাঁ ধরে উঠিয়ে দিল আমাকে। তার পর সগীর খাঁ খচ্চরের লাগাম ধরে চলতে শুরু করে, আর খচ্চরটা তার পিছে পিছে গদাই লশকরী চালে হেলে-দুলে চলতে থাকে।

রাস্তা বলতে শরম হয়। সরু পাহাড়ী পথ, পাশে খাদ। এই পথ ধরে ঘণ্টা দুই চলতে হবে। আরো একটা ভাল পথ নাকি আছে, তবে সে পথে গেলে রাত হয়ে যেতে পারে। এই সরু পথ ধরে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবো।

কিছুদূর যাওয়ার পর শুনলাম ছোট এক পাহাড়ের চূড়া থেকে কে যেন হাঁকলো। সগীর তার বাহন থামিয়ে আকবরকে পস্তু ভাষায় কি যেন বলল। আকবর তখন চিৎকার করে কিছু বলার পর দেখা গেল বারো কি তের বছরের এক কিশোর পাহাড়ের গা বেয়ে তর তর করে নেমে এসে আমাদের সামনে আকবরকে সালাম করে দাঁড়ালো। কাঁধে রাইফেল ঝুলানো। আকবর তার সংগে কয়েকটি কথা বলার পর সে আবার সালাম করে চলে গেল। আকবর বললেন, এরা পাহারাদার। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এই সব ছেলেরা গুহার মধ্যে থাকে আর চারিদিকে নজর রাখে। ফিরিঙ্গী দেখলে আর নিস্তার নেই। তখনই সাফ করে দেবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এতটুকু বাচ্চারা রাইফেল চালাতে পারে?

আকবর বললেন: জানেন, আমাদের দেশে শিশুরা জন্মানর সংগে সংগে রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে তাদের অভ্যর্থনা করা হয়। সাত-আট বছর বয়েস থেকে তারা ভেড়া চরায় হাতে রাইফেল নিয়ে। রাইফেল ওদের খেলার সামগ্রী।

পথে আমাদের আর কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

হাজী সাহেবের প্রাসাদে পৌঁছে গেলাম বিকেল ছয়টার দিকে। সে এক এলাহী কাণ্ডকারখানা। প্রাসাদটা পুরো পাথরের তৈরী, পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রাসাদের সামনের ফটকে রাইফেলধারী কয়েকজন পাঠান জওয়ান। যেমন চেহারা, তেমনি দেহ। আমরা খচ্চর

থেকে নামতেই ওদের একজন এগিয়ে এসে পস্তু ভাষায় আকবরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

তারপর একজন এসে সগীর খাঁ ও তার খচ্চরকে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। আকবর বললেন, ওকে মুসাফির খানায় থাকবার জন্য নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে একজন জওয়ান ফটকের বিরাট দরজা খুলে ভিতরে চলে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে জানালো যে, আমাদের হাজী সাহেবের দরবারে হাজির করার হুকুম এসেছে।

সীমান্তের লৌহমানব তুরাঙ্গজাইয়ের হাজী সাহেবকে দেখার সৌভাগ্য হবে একথা ভাবতেই মনে কি এক অপার আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। জওয়ানটির পিছনে পিছনে আকবর ও আমি ভিতরে চললাম। একটা চক্কর পার হয়ে আর এক প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের দরবার কামরায় হাজী সাহেব জীর্গায় বসেছিলেন। একজন আমলা এসে জানালো যে পাশের কামরায় আমাদের থাকার জায়গা করা হয়েছে, সেখানে আজ রাতের জন্য বিশ্রাম করুন। কাল বেলা দশটায় হাজী সাহেব আমাদের সাক্ষাৎদান করবেন। অগত্যা আমরা নিজ নিজ বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যার সময় মাগরেবের আজানের মধুর স্বর ভেসে এল। আমাদের কামরা থেকে মসজিদ দেখা যায়। দেখলাম, অনেক নামাজীর সমাবেশ হয়েছে সেখানে। আকবর পাশের গোসলখানা থেকে ওজু করে নামাজ পড়তে চলে গেলেন। কোমরে বেদনা হওয়ায় আমার নামাজ পড়া হল না।

আকবর নামাজ পড়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন খেদমতগার একটা ট্রেতে দু'গ্লাস সরবত ও কিছু ফল এনে টেবিলে রাখলো। আকবরকে বললেন: রাত নয়টায় রাতের খানা দেয়া হবে। তিনি গোসলখানায় তোয়ালে, সাবান ও সুগন্ধি মাথার তেল রেখে চলে গেলেন।

শরীর ক্লান্ত। খচ্চরে চড়ার ফলে কোমরে বেদনা। তৃষ্ণায় ও কাতর হয়ে পড়েছিলাম। পাঠান আকবরের পক্ষে যে কষ্ট সহ্য করা সম্ভব ছিল, ক্ষীণ দেহী বাঙ্গালী, আমার পক্ষে সে কষ্ট অসহনীয়। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য শরবতের গ্লাস তুলে নিলাম। কিন্তু হায় আল্লাহ,

শরবতে যত পানি, তার চেয়ে বেশী বাদাম, পেস্তা আর আঙ্গুরের টাটকা রস। শরবত পান করার পর খানিক পানি পান করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আকবরকে বললাম, দোহাই আপনার, রাতের খাবার সময়ে ডাকবেন, এখন আমায় একটু ঘুমাতে দিন।

রাত নয়টার পরে খানার ডাক পড়লো। পাশের ঘরে কার্পেটের উপর মোটা চাদর পাতা; তার উপর দস্তারখান। দস্তরখানের উপর বিরাট বিরাট খাঞ্চায় আস্ত দুম্বার রোস্ট, পোলাও, দুই বর্গগজ আকারের এক ইঞ্চি মোটা নান রুটি, কাবাব, দই, চাটনি প্রভৃতি। আস্ত দুম্বা দেখে আমার খাওয়ার রুচি চলে গেল। কেবল মনে হতে লাগলো এই রাক্ষসদের কবল থেকে রক্ষা পেলে বাঁচি।

আমার মনোভাব বোধহয় আকবর বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আরো কয়েকজন পাঠান আমাদের খানার সঙ্গী ছিল বলে কোন কথা না বলে আমার প্লেটে রোস্টের একটা ছোট টুকরা ও পোলাও তুলে দিলেন। অন্য সবাই বিরাট বিরাট টুকরা নিয়ে খেতে শুরু করলো। আমি যে এত কম খাচ্ছি তা লক্ষ্য করে ওদের চোখে-মুখে পরিহাসের ছবি ফুটে ওঠে। তবে বলে রাখছি, দুম্বার রোস্ট দেখে যে মনোভাবের উদয় হয়েছিল, রোস্ট খেয়ে তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছিল। এমন সুস্বাদু রোস্ট আমি আগে কখনো খাইনি।

রাতে আহারের পর একজন পাঠান খাঁ সাহেব আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। সে নাকি একজন ছোটখাট জমিদার। আকবরের মধ্যস্থতায় আমার সঙ্গে বঙ্গাল মুলুক সম্পর্কে অনেক কথা বললো এবং বঙ্গাল মুলুকে যে তেজারতের সুবিধে আছে, সে কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলো। এই এলাকার অনেক লোক নাকি কাবুলীদের সঙ্গে মিলে হিন্দুস্থানে তেজারতি করে খুব মালদার হয়েছে। একথা সেকথার পর লোকটি দু'দিন পর তার বাড়ীতে রাতে আহারের দাওয়াত করে বসলো। আমার গাইড আকবর দাওয়াত কবুল করলেন। পাঠান ভদ্রলোকের নাম শেরগুল খান। অনেক রাত পর্যন্ত বকর বকর করে খাঁ বিদায় নিল।

পরদিন সকালে হাজী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তার সঙ্গেই

সকালের নাশতা করতে হবে। আমরা গোসল করে তৈরী হয়ে আছি, এমন সময় একজন আর্দালী এসে জানালো যে হাজী সাহেব তার বৈঠকখানায় এসেছেন। তিনি আমাদের সালাম দিয়েছেন।

আমরা তার সঙ্গে চললাম। বৈঠকখানায় হাজী সাহেব বসে আছেন দেখলাম। কিন্তু দেখে আমার ধারণা বদলে গেল। আমি মনে করেছিলাম হয়ত তিনি ছয়ফিট সাতফিট লম্বা তাগড়া জোয়ান, কাইজার অথবা ফন হিণ্ডেনবার্গের মত লম্বা ও মোটা গোঁফওয়ালা, মাথায় পাগড়ী আর তার চুড়া কম-সে-কম দু'ফুট উঁচু। কিন্তু হায় আল্লাহ, এসবের কিছুই না। অত্যন্ত নিরীহ মুসল্লির মত চেহারা, মাথায় একটা সাদা গোল টুপি, পরণে সাদা পাজামা ও পিরহান। মুখে সাদা-কালো দাঁড়ি। দেখলে বিশ্বাসই হয় না যে ইনি সেই ইংরেজ ত্রাস দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সরদার তুরঙ্গজাইয়ের হাজী। আকবর ও আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েই মোগলাই কায়দায় কুর্নিশ করলাম। হাজী সাহেব উঠে এসে আমাদের সঙ্গে পরম অন্তরঙ্গতায় মুসাফা করে তাঁর পাশে ফরাশের উপর বসতে দিলেন। হাজী সাহেবের পাশে বসেছিলেন তাঁর বড় ছেলে, ভবিষ্যতের পীর। ছেলেও বাপের মত খুব সাদা-সিধা এবং ব্যবহারে অমায়িক। তবে চেহারার দিক থেকে রাজপুত্তুরের মত।

পাঁচজন বেয়ারা বড় বড় খাঞ্চায় করে নাশতা এনে ফরাশের উপর নামিয়ে রেখে গেল। রুপার জগ, রুপার গ্লাস, রুপার চায়ের কেতলী ও চীনা মাটির চায়ের পেয়ালা। হাজী সাহেবের শান-শওকত দেখে মনে হল, যেন কোন রাজপুরীতে এসেছি। খাবার আয়োজন দেখে তো চোখ চড়ক গাছ। বিভিন্ন খাঞ্চায় আলাদা করে পাকা পেঁপে, ওজন এক-একটার প্রায় পাঁচ সের হবে, ডিমপোচ ও সিদ্ধ; মুরগীর রোস্ট, পরটা কাবাব, দহিবড়া। সঙ্গে চা তো আছেই। তবে পৃথক কোন প্লেট দেয়া হয়নি, একই খাঞ্চা থেকে সবাইকে খেতে হবে। এটাই নাকি পাঠানদের নিয়ম। ওদের তুলনায় আমি যা খেলাম তাতে তো ওরা হেসেই খুন। বলে বেশী করে খাওনা বলেই এত দুর্বলা পাতলা হয়েছ। বলে, বঙ্গাল মুলুকের আদমী খেতে

জানে না। কথাটা শুনে মনে মনে রাগ হয় বইকি। কিন্তু জবাব দেবার সাহস কোথায়?

চা-নাশতার পর্ব শেষ হল। হাজী সাহেব কাজের কথা পাড়লেন। বললেন, যে জন্য তুমি এসেছ, তা আমি জানি। আগেই আমি খবর পেয়েছি। বছর পনের আগে রায় সাহেবের (এম. এন. রায়) লোক এসে অনেক কথা বলে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি রাশিয়ায় পালিয়ে গেলেন। মুসলমানদের দলে নিয়ে কম্যুনিস্ট বানিয়ে ছাড়লেন। কাজ কিছুই হলনা। তারপর বোস সাহেব ১৯২৮/২৯ সালে আমার সঙ্গে পেশোয়ারে দেখা করেছিলেন। বড় নেক আদমী এই বোস সাহেব। তাঁকে বলবেন; পাঁচ হাজার রাইফেল আর দু'লাখ গুলী আমি যোগাড় করে দেব। দাম লাগবে না। আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খবরদারির ভার আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারেন। ইসলামের নিশান আমরা নীচু করতে দেবনা কোনো দিন। তবে মালামাল বঙ্গাল মুলুকে পৌঁছে দেয়ার ভার আমি নিতে পারবো না। নিজেরা যদি নিয়ে যেতে পারেন, তবে জানাতে বলবেন।

সঙ্গে সঙ্গে হাজী সাহেব একটা ছোট খাতা বের করে বললেন, এই খাতায় তোমার একটা স্বাক্ষর দিয়ে রাখো।

আমি স্বাক্ষর দিয়ে তার তলায় তারিখ লিখে দিলাম। হাজী সাহেব খাতাটা নিয়ে তাঁর ছেলের হাতে দিলেন।

আমাদের আলোচনার আর কিছু নেই, তাই আকবরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কামরার উদ্দেশে রওয়ানা হচ্ছি; এমন সময় হাজী সাহেব আকবরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

আকবর জানালেন, আমরা পরম আরামে আছি। হাজী সাহেব খুশী হলেন। আমরাও নিজেদের কামরায় ফিরে এসে মতলব আঁটলাম যে, কথা যখন শেষ হল তখন আর থেকে লাভ নেই। কাল ভোরেই পেশোয়ার রওনা দেয়া যাক। আকবরও রাজী। কিন্তু সেই শেরগুল খাঁ, যে দাওয়াত করেছে, তার কি করা যায়? আকবর বললেন, তাঁর দাওয়াত ফিরিয়ে দেয়া যাক। চল শেরগুলের বাড়ী।

পায়ে হেঁটে অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে শেরগুলের বাড়ী

পৌঁছে যাই। শেরগুল তখন বাড়ীতেই ছিল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার, হাজী সাহেবের মত এত শান-শওকত নেই। তবুও অভ্যর্থনার কমতি নেই। সে তাড়াতাড়ি বিরাট একজগ ঘন গরম দুধ এনে বললো ঃ পিয়ো।

না বললে হয়ত রেগে যাবে, তাই গ্লাসে ঢেলে দুধ পান করলাম। খাঁটি দুধ, তবে মহিষের কি গরুর তা বুঝলাম না। তবে এত সুস্বাদু দুধ খুব কমই খেয়েছি আমাদের দেশে।

আকবর বেশ ধীরে ধীরে খুব বিনয় সহকারে শেরগুলকে বললেন যে একটা জরুরী কাজে কাল ভোরেই আমাদের পেশোয়ার যেতে হচ্ছে, তাই রাতে তার দাওয়াত রক্ষা করা সম্ভব হবে না, সে জন্য মাফ চাচ্ছি।

আকবরের কথায় শেরগুল যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। দাওয়াত কবুল করে না রাখলে অপমান করা হয়। এসব যুক্তি দেখানোর পর সে যা বললো তাতে আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল। বললো, দাওয়াত রক্ষা না করলে সে আমাদের দু'জনকেই গুলি করে মেরে ফেলবে। কী মুসিবতে পড়া গেল আকবর শাহের জন্য! তিনি দাওয়াত কবুল করতে গেলেন কেন সাত তাড়াতাড়ি।

আমি আকবরকে বললাম, এক কাজ করুন; ওকে বলুন; আজ রাতেই ও আমাদের যদি খাওয়ায় তাহলে ত গুলির মুসিবত থেকে রক্ষা পেতে পারি। প্রস্তাবটা শুনে শেরগুল কিছুটা শান্ত হয়। বলে; বেশ তাই হবে। আজ রাতেই খানার বন্দোবস্ত করা হবে; কিন্তু খবরদার; আর যেন কথার বরখেলাফ না হয়।

যাক বাঁচা গেল সরল অথচ হিংস্র পাঠানের কবল থেকে।

আকবর হাজী সাহেবকে আনুপূর্বিক ঘটনাটা বললেন। হাজী সাহেবও খুশী হলেন। বললেন, ওরা সিধা মানুষ; ওদের দিল বহুত সাফ, কিন্তু রাগলে আগুনের হলকা, খুশী হলে একেবারে ঠাণ্ডা।

পরদিন ভোরে হাজী সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলেম। আমাদের পথে খাওয়ার জন্য হাজী সাহেবের পুত্র বড় বড় চারটি পরটা, দুটো আস্ত মুরগীর রোস্ট এবং ফ্লাস্ক বোঝাই পানি

সগীর খাঁর হাতে দিলেন। হাজী সাহেব নিজে এসে আমাদের মাথায় হাত রেখে অনেক দোয়া-দরুদ পড়লেন। যথারীতি সালাম জানিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বেলা দু'টো নাগাদ পেশোয়ারে পেঁাছে গেলাম। বাস থেকে যখন নামলাম তখন গায়ে মাথায় ধূলা লেগে ধূসর হয়ে গিয়েছি। হোটেলে উঠে গোসল সেরে চায়ের অর্ডার দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আকবর আমাকে দুপুরের খানা খেতে হুকুম করে নিজের বাড়ী চলে গেলেন। বলে গেলেন যে, সন্ধ্যার পরে আসবেন। আজ আর কলকাতা রওনা হওয়া যাবে না, আগামীকাল যাওয়া হবে।

খচ্চরের পিঠে চার ঘন্টা এবং বাসে প্রায় চার ঘন্টা সফর করে শরীর ক্লান্তিতে ভেংগে পড়েছিল। তিনটার দিকে দুপুরের ভাত খেয়ে একটা লম্বা ঘুম দিলাম। রাত নয়টার দিকে আকবরের দরজা ধাক্কা দেয়ার শব্দে ঘুম ভাঙলো। দেখলাম, আকবরের পিছু পিছু বেয়ারা দু'কাপ চা এনে টেবিলে রেখে গেল। আমি তাকে খিলি চারেক পান আনতে নির্দেশ দিলাম। গত তিনদিন পান খেতে পারিনি, কি যে কষ্ট হচ্ছিল তা আর কি বলব।

গল্প করতে করতে এক সময় জিজ্ঞাসা করলাম যে, হাজী সাহেবের মুখে শুনলাম; স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হলে পাখতুনরা প্রস্তুত আছে। সীমান্তের পাঠানরাও কি সে সংগ্রামে যোগ দেবে?

আকবর একটু হেসে বললেন: পাখতুনদের মধ্যে নানান গোত্র আছে। তাঁদের মধ্যে রেষারেষি আবহমানকাল থেকে। এক গোত্র যদি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যায়; অপর গোত্র ইংরেজদের পক্ষে যাবে, তবে ইংরেজ-বিরোধী গোত্রই সেখানে শক্তিশালী।

সীমান্তের পাঠানদের সম্পর্কে আকবর বললেন, ওরা বেশীরভাগ বাদশা খাঁর (সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফার খাঁ) ভক্ত। ওরা রাজনীতি বোঝে না, কংগ্রেস; সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম, কিছুই জানে না। বাদশা খাঁ যা বলেন ওরা তাই করে। বাদশা খাঁর হুকুমে ওরা জান দিতে পরোয়া করে না। পুলিশ ওদের অনেক সময় বেদম ঠ্যাঙায়; কিন্তু নীরবে মার খায়, পাল্টা মার দেয় না। এই বাদশা

খাঁ পাঠান জাতটাকে ভীরু, কাপুরুষের জাত না বানিয়ে ছাড়বে না।

কেন, কোন শিক্ষিত যুব-নেতা কি এই অঞ্চলে নেই ?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আকবর বললেন : এ অঞ্চলে দুজন ছাত্রনেতা আছেন, তারা পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা গ্রাজুয়েট ; একজনের নাম গোলাম রহমান খান চৌহান ; আর একজন আবদুর রহমান আচকজায়ী ; তরুণ সমাজের উপর এদের প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু তাঁরাও বাদশা খাঁর খপ্পরে পড়েছেন। এখন তাঁরা কড়া রকমের গান্ধীবাদী ; অহিংস-অসহযোগ অস্ত্রে তাঁরা নাকি দেশ স্বাধীন করবেন। তবে বাদশা খাঁর প্রভাব সীমান্তের সীমিত এলাকায়। গান্ধী বিরোধী শক্তিও প্রবল। এবং সে শক্তি আবার প্রতি-ক্রিয়াশীলতার দিকে ঝুঁকে আছে। তাছাড়া, "পেটি বুর্জোয়া" চরিত্র এই দু'ই দলের মধ্যেই প্রকট।

রাতে আমরা এক সঙ্গে আহার করলাম। আকবর আমাকে বললো, ভোরবেলা আমার জন্য ট্রেনের টিকিট কিনে এবং বার্থ রিজার্ভ করে একটা শ্রমিক সভায় যাবেন। আমি যেন বাই'রে কোথায় না যাই। বিকেলে এসে আমাকে নিয়ে বেরুবেন। রাতে আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে তবে তাঁর ছুটি।

॥ চার ॥

১৫ই এপ্রিল '৭২, রাত দশটায় কালকাহাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে আকবর আমার কানে কানে বললেন, পথে কারুর সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করবেন না, আর পেশোয়ারের বাইরে গিয়েছিলেন, এ কথাও বলবেন না। ট্রেন ছাড়ার সংকেতধ্বনি হতেই তিনি আমার সঙ্গে কোলাকুলি করে বিদায় নিলেন। ট্রেনের কামরা থেকে তাকিয়ে দেখি আকবর আমার কামরার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। বলতে ভুলে গিয়েছি, কাশ্মীর হোটেলের বিল আমাকে দিতে দেননি আকবর। তাছাড়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনের টিকেট তিনিই কিনেছেন। আমার কাছ থেকে টাকা নেননি।

রাতের গোড়ার দিকে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুম হয়নি, তবে শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি। যখন জাগলাম তখন চারি দিকে রোদ ঝলমল করছে। ট্রেন ততক্ষণে লাহোর পার হয়ে অমৃতসর ছোঁয় ছোঁয় করছে। অমৃতসর স্টেশনে ট্রেন থামলে কিছু পুরি, তরকারী ও প্যাঁড়া (এক রকম সন্দেশ) খেয়ে-পেট ভরে পানি খেয়ে নিলাম। অতিরিক্ত গরমে গা জ্বলে যাচ্ছিল। আমার কাছে কোন তোয়ালে ছিল না, ছিল একটা গামছা, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী অথচ পোঁটলা থেকে গামছা বের করবো, কেমন যেন সঙ্কোচ লাগালো, কিন্তু গরজ বড় বালাই। লজ্জা শরমের মাথাখেয়ে গামছাটা ভিজিয়ে এনে ঘন ঘন হাত মুখ মাথা মুছতে লাগলাম। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ট্রেন দিল্লী স্টেশনে থামলো। এখানে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট থামবার কথা। আমি তাড়াতাড়ি একটা হোটেলে ঢুকে কিছু ভাত-ডাল চাইলাম। হোটেলওয়ালা জানালো, বাবু এটা মুসলমান হোটেল। আপনাদের হিন্দু হোটেল ওই পাশে আছে। হোটেলওয়ালার কথা শুনে আমার রাগ সপ্তমে চড়ল। বললাম, কে বলেছে আমি হিন্দু? তোমরা হিসেব করে কথা বল না?

হোটেলওয়ালা মুখ কাচুমাচু করে মাপ চাইতে লাগলো। বললো হুজুর আপনার খদ্দর পরা দেখে আমি আন্দাজে বলে ফেলেছিলাম।

ট্রেন দিল্লী থেকে ছাড়লো। জানালার কাছে বসে বসে মোগল আমলের গৌরবমন্ডিত রাজধানীর চেহারা দেখছি আর আমাদের পরাধীনতার কথা ভাবছি। এমন সময় প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেন শাহদারা স্টেশনে থামলো। শাহদারাও একটা নামকরা স্টেশন। এখান থেকে আগ্রার দিকে রেলপথ গিয়েছে। বসে বসে এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারছি, এমন সময় দশ বারোজন পুলিশ একজন অফিসার-সহ আমার কামরায় ঢুকে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো। আমি এক কোনে চুপ করে বসেছিলাম। অফিসারটি সোজা আমার সামনে এসে উর্দুতে বলল, আপনি কি বাঙ্গলী? আমি "জী হ্যাঁ" বলতেই সে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল আপনাকে একটু তকলিফ দেব। স্টেশনে আমাদের বড় সাহেব রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একটু মোলাকাত করতে হবে; আমার সঙ্গে আসুন।

আমি বললাম, আপনার অফিসারের সঙ্গে মোলাকাত করতে গেলে যে ট্রেন ছেড়ে দেবে; তখন কি হবে?

অফিসারটি বলল, দরকার হলে টিকিটের টাকা ফেরত পাবেন। এখন চলুন তাড়াতাড়ি। আপনার সামান পত্তর কোথায় দিন আমরা নিয়ে যাচ্ছি।

সামান পত্তরের কথা শুনে হাসি পেল। একটা ঝুলি আর দু'টো খদ্দরের কাপড়। ঝুলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে পড়লাম। দেখলাম আমার চারপাশে কড়া পুলিশ পাহারা। নিজেকে বেশ 'হীরো' 'হীরো' মনে হচ্ছিল। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না, কেন ওরা আমার উপর এমন শ্যেন দৃষ্টি ফেলল। আমিত অপরাধ আইনের আওতায় এমন কিছু করিনি; যার জন্য মাঝপথ থেকে এমন হাইজ্যাক করতে পারে।

স্টেশনে রেলপুলিশের অফিসে ওদের বড় কর্ত্তা বসেছিল। সে যুক্ত প্রদেশের কি পাঞ্জাবের বুঝতে পারলেম না, তবে সে যে মুসলমান তার কথা বার্তায় বুঝতে পারলেম। আমাকে তার সামনে হাজির

করার সঙ্গে সঙ্গে সে আস্‌সালামো আলায়কুম বলে প্রথমে সম্ভাষণ জানালো, তারপর খাঁটি উর্দু ভাষায় আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে তশরীফ রাখতে বললো।

আমি চুপচাপ বসে আছি। পুলিশ অফিসার প্রথমে কথা বলল: আপনাকে একটু তকলিফ দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। দু'চারটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আপনাকে এনেছি; আশা করি সব কথা খুলে বলবেন,

আমি উত্তরে বললাম; আমার গোপন করার কিছু নেই; জিজ্ঞাসা করুন।

প্রশ্ন: আপনি ত বাঙ্গালী?

উত্তর: নিশ্চয়ই আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গালী মুসলমান।

"বেশ: 'আপনার রেলওয়ে টিকেটটা দিন; বদলে আনবার দরকার হতে পারে"

আমি টিকিটটা বের করে দিয়ে বললাম; বদল করতে ত হবেই। ট্রেন চলে গেছে অনেকক্ষণ।

অফিসারটি হাসল, মনে হলো ক্রুর হাসি। তারপর আবার প্রশ্ন শুরু হল।

প্রশ্ন: আপনি পেশোয়ারে গিয়েছিলেন তা জানতে পেরেছি। কিন্তু কেন গিয়েছিলেন বলবেন কি?

উত্তর: বৃটিশ ভারতের যে কোন জায়গায় যাওয়ার অধিকার যে কোন নাগরিকের আছে। সেই নাগরিক অধিকারের বলেই আমি পেশোয়ার ভ্রমণে এসেছিলাম।

প্রশ্ন: পেশোয়ারে কোথায় ছিলেন?

উত্তর: কাশ্মীর হোটেলে।

প্রশ্ন: ওখানে কারুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ; অনেকের সঙ্গে হয়েছে। নাম অনেকের জিজ্ঞাসা করিনি।

প্রশ্ন: কারুর নাম মনে আছে কি?

আমি আবোল-তাবোল কয়েকটি নাম বলে গেলাম। এবং ওরা বিশ্বাস করলো কিনা জানিনে। জিজ্ঞাসা করলো: কংগ্রেস করেন কি?

আমি বললাম: কোন রাজনীতিই করিনি। আমি সাংবাদিক। সংবাদপত্র সেবাই আমার ধর্ম।

দিল্লীতে কংগ্রেস বেআইনীভাবে সম্মেলন করছে জানেন কি ?

উত্তরে জানালাম; খবরের কাগজে এরকম কোন খবর পড়িনি।

ওরা আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে আমার ঝুলিটা তল্লাশী করে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বলল; আপনাকে কয়েকদিন আটক থাকতে হবে। সেপাইদের সঙ্গে যান।

সেপাইরা আমাকে একটা জীপে তুলে কুতুব মিনারের নীচে আনলো। সেখানে দেখলাম এলাহী কারবার। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে অস্থায়ী জেলখানা তৈরী হয়েছে। চারদিকে সশস্ত্র প্রহরী; ভিতরে কয়েক হাজার কয়েদী। কংগ্রেসী সবাই। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে এসে সবাই গ্রেফতার হয়। মিসেস নেলী সেন গুপ্তা সভানেত্রী ছিলেন। তাঁকে গ্রেফতার করে দিল্লী সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছে। নেলী ব্যারি-স্টার জে এম সেনগুপ্তের ইংরেজ স্ত্রী। আমাকে জেলখানার মধ্যে একটা ছাপড়ায় থাকতে দেয়া হল।

দুপুরে ও রাতে রুটি ও লাউয়ের তরকারী খেতে দেয়। সকালে ভিজে ছোলা ও একমগ চা। ভাবি; এরকম খাবার খেয়ে এক সপ্তাহও বাঁচবো না।

কংগ্রেসের যেসব কর্মীর সঙ্গে জেলখানায় দেখা হল, তাদের অনেকে যে গন্ডমূর্খ তা কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম। এলাহাবাদ থেকে আগত একজনের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে জানলাম; সে এখানে 'দিল্লী গেট' হয়ে এসেছে। এই 'দিল্লী গেট' জিনিসটা যে কি তা অনেক কোশেশ করে বুঝলাম। সে এলাহাবাদের ডেলিগেট হয়ে এসেছে। নেতারা তাকে বুঝিয়েছে এবার গেলেই আজাদী পাওয়া যাবে, আর গান্ধীজী হিন্দুস্থানের রাজা হবেন। সেই ভরসা নিয়ে সে আরো অনেক লোকের সঙ্গে এখানে এসেছে। কিন্তু হায়, সব ভাঁওতা; এরকম হবে জানলে সে কখনো আসতো না।

চার-পাঁচজন বেকার যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। তারা বলল; কংগ্রেস রেলগাড়ীর ভাড়া আর খরচ দৈনিক দু'টাকা দিয়েছে তাই

এসেছি। এমনিতে ত উপোসে দিন যায় ; তার চেয়ে কিছু পয়সা আর খাবার পেলাম এটাই লাভ। তাদের কথা শুনে মনে হলো ; শিক্ষিত কংগ্রেসীদের মধ্যে কম লোকই এসেছে।

দু'দিন দু'রাত বিচিত্র ধরনের মানুষের মধ্যে বেশ কৌতুক করে কাটানোর পর আমাকে পুলিশ আবার হাইজ্যাক করলো। এবার জেলখানা থেকে।

শাহদারা ষ্টেশনে যে মুসলমান পুলিশ অফিসার আমাকে অস্থায়ী জেলখানায় পাঠিয়েছিল, সে নিজে আমাকে নিতে এসেছে। আমার ছাপড়ায় এসে বললো : আপনার ঝুলি নিয়ে বাইরে আসুন।

বুঝতে পারিনে ব্যাপারটা কি? মনে হল ; আমাকে নিশ্চয়ই এবার ছেড়ে দেবে। কোন অভিযোগ ত আমার বিরুদ্ধে নেই ; তাই আমাকে আটক রাখার কোন অর্থ হয় না। আমি খুশীমনে জেলগেটে আসতেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার আমার হাতে একটি নোটিশ দিল। পড়ে দেখি ; আমাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হল এবং পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের জন্য কারাগারে আটক রাখা হবে। আমাকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে রাখার আদেশ হয়েছে। নোটিশ পড়ে আমার ত চোখ চড়কগাছ। এই বিদেশে বেভু'য়ে জেলে আটক থাকার মানে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সময় সময় দেখা সাক্ষাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। তাছাড়া, আমার স্ত্রী ও জেলে বন্দিনী। তার মুক্তির সময় যদি আমি না থাকি, তাহলে তাকে বহরমপুর থেকে কে আনবে আর থাকবেইবা কোথায়?

আমার আর ভাববার সময় ছিল না। পুলিশরা সামনে দাঁড়ানো একটা কয়েদী গাড়ীতে আমায় তুলে বলল, আপনাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দীদের সঙ্গে রাখা হবে। সেখানে থাকা, খাওয়া সবই ভাল, আর শিক্ষিত নেতাদের সঙ্গ পাবেন।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় কারাগারকে একটা বিশাল প্রাসাদ বললে ভুল হবে না। জেলগেটে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমার নাম ধাম খাতায় লিখে নিয়ে পুলিশের কাজ থেকে আটকাদেশ বুঝে নিল। আমার ঝুলিটা ও কাপড় পরীক্ষা করে আবার আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। পুলিশ আমার

রেলওয়ে টিকিটের দাম ফিরিয়ে এনেছিল, সে টাকাটাও আমার নামে সুপারের কাছে জমা রাখলো। সুপার গেটগেট খুলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে চললো। অনেকগুলি ওয়ার্ড পার হয়ে একটা বিরাট দালানের সামনে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডারকে হুকুম করতে সে দালানের লৌহ-কপাট খুলে দিল। সুপার আমাকে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করে এক কোণে একটা মাটির লম্বা ঢিবি দেখিয়ে বলল, এটা আপনার শোয়ার খাট। এখনই ওয়ার্ডার আপনার কম্বল, বালিশ, চাদর আর থালা-গেলাস দিয়ে যাবে। পাশের এই চেয়ার ও টেবিল আপনার। কাগজ ও খাম দিয়ে পাঠাবো। ইচ্ছে করলে বাড়ীতে পত্র লিখতে পারবেন। তবে মাসে দুটোর বেশী নয়।

আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে সুপার তার ওয়ার্ডারকে নিয়ে বিদায় হল। এরপর অন্যান্য ওয়ার্ডের কয়েদীরা এলেন আলাপ করতে। একে একে পরিচয় হল সকলের সঙ্গে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মিসির সিং ও পাটনার ভবানী সহায় সবার আগে আলাপ করতে এলেন। খানিক পরে পিছনের কামরা থেকে এলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবের পুত্র কৃষ্ণকান্ত মালব্য। তাঁরা জানতে চাইলেন আমার আটকের কারণ। আমি নিজেই জানিনে তা তাদের বলব কি? ওদের সঙ্গে আলাপ জমতেই খাবারের ডাক পড়লো। আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যেই প্রত্যেকের টেবিলে খাবার দিতে লাগলো; কিন্তু আমার টেবিলে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো পরিবেশকরা। আমাকে থালা গেলাস বাটী কিছুই দেয়নি তখনো। একজন ওয়ার্ডার ছুটলো স্টোরের দিকে।

খাবার যা দিল তা বেশ উঁচুদরের বলতে হবে। চারখানা মোটা মোটা চাপাতি, এক হাতা ভাজি, এক পেয়ালা ডাল, বড় বড় চার টুকরো খাসির মাংস ও এক বাটি দই। প্রথম দু'দিন রুটি কোন রকমে খাওয়া গেল, কিন্তু ক্রমে তা অসহ্য হয়ে উঠলো। রুটির মধ্যে যে প্রচুর পরিমাণে বালু মিশানো হয়েছে তা আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী বুঝতে পারলাম।

সন্ধ্যার পর আমাদের ওয়ার্ডের বাইরের ফটক বন্ধ হয়ে গেল। ততক্ষণে রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে। আমাদের ওয়ার্ড প্রকৃতপক্ষে একটি বড় কামরা। এই কামরার মধ্যে দিয়ে অন্যান্য কামরায় যাওয়া

আসা করা যায়। রাত প্রায় নয়টার দিকে মওলানা আবুল কালাম আজাদ আমাদের কামরায় এলেন এবং নবাগত বলে আমার সঙ্গে আলাপ করতে বসলেন। মওলানা সাহেবকে আমি সত্যপরায়ণ ও ধর্ম-ভীরু বলে জানতাম, কিন্তু আমার সীমান্ত সফরের কথা তাঁর কাছেও গোপন রাখলাম। মওলানার খাবার তাঁর বাড়ী থেকে আসতো। মওলানা প্রায়ই আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে খানা খেতেন। মওলবী মুজীবুর রহমানের আত্মীয় বলে তিনি আমার দিকে বিশেষ নজর রেখেছিলেন।

আমি জানিনে; কেমন করে আমার গ্রেফতারের সংবাদ দিল্লীর সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংবাদ দেখে পণ্ডিত ইন্দ্র আমার সংগে দেখা করতে এলেন। জেলগেটে গিয়ে দেখি ছোটখাট আকারের গৌরবর্ণ এক সুদর্শন ভদ্রলোক আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি পরিচয় দিলেন যে, দিল্লীর দৈনিক "তেজ" পত্রিকার সম্পাদক তিনি। সাংবাদিক হিসেবে আমার নাম তাঁর পরিচিত বলে তিনি দেখা করতে এসেছেন; দিল্লী জেলে বাংলা থেকে কেউ দেখা করতে আসবেন না; তাই বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর এই সাক্ষাৎকার। পরে জেনেছিলাম পণ্ডিত ইন্দ্র স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পুত্র।

সে যাহোক, এই বালুমাখা রুটিত আর খাওয়া যায় না। এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। আমার পাশে ছিল আরও দুজন বাঙালী; কলকাতার মৃণাল সেন ও বরিশালের জনৈক ব্রহ্মচারী। তার আসল নাম জানিনে; তবে সবসময় সাদা লুঙ্গি; পাঞ্জাবী ও পাগড়ী পরে থাকতো বলে তাকে আমরা ব্রহ্মচারী বলে ডাকতাম। এই তিন বাঙালীর সঙ্গে এসে যোগ দিল একজন বিহারী। আমরা এই চারজন ঠিক করলাম; আমরা ভাত দেয়ার দাবী করবো; সে দাবী অগ্রাহ্য করলে আমরা অনশন ধর্মঘট শুরু করব।

প্রথমে আমরা কানুন মাফিক লিখিত আবেদন পাঠালাম। যথা-রীতি তা অগ্রাহ্য হল। মওলানা আজাদ ও পণ্ডিত মালব্যের কাছে সবকথা খুলে বললাম। তাঁরা বন্দী হলেও দিল্লীর সব সরকারী বড়কর্তা তাঁদের সমীহ করে চলে। সুপার মওলানাকে জানালেন; ভাত দেয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং আমাদের চরমব্যবস্থা নিতে হল।

একুশে এপ্রিল থেকে আমরা চারজন বাঙালী অনশন শুরু করলাম। অনেক হুমকি অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করে আমরা সংকল্পে অটল থাকলাম ; অনশনের তৃতীয় দিনে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়লো। ওদের মধ্যে আমিই ছিলাম সবচেয়ে ক্ষীণজীবী ; তাই, অনশনের ধকল সামলানো আমার পক্ষে সহজ হল না ; জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

শুনেছি, জেলে আটক বড় বড় নেতারা সরকারের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন। স্বয়ং মওলানা আজাদ স্বরাষ্ট্র সচিবকে তলব করে তাঁর সংগে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জেলকর্তৃপক্ষের ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছিলেন। স্বরাষ্ট্র সচিব তখনই নির্দেশ দিয়ে যান যে, বাঙালী রাজবন্দীদের এখন থেকে ভাত দেয়া হবে। এজন্য বাঁশমতী চাউল জেলগেটারে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। আমাদের দাবী পূরণ হওয়ায় মওলানা আজাদ ও পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য আমাদের কমলালেবুর রস পান করিয়ে অনশন ভঙ্গ করালেন।

চারদিনে অনশনব্রতী আমরা চারজন এমন বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলাম যে সব রাজনৈতিক বন্দীরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। মে মাসের (৩২ সাল) শেষ দিনে এক রোগাপাতলা মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি কানপুর জেল থেকে দিল্লী জেলে বদলী হয়ে এসেছেন। দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেছেন তিনি। নাম বললেন, শওকত ওসমানী, যুক্তপ্রদেশের বাসিন্দা। কোন এক ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বৎসরের জেল হয়েছে। আমার সাথে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন, এম এন রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কিনা? আমি জানালাম যে, দেখা কখনো হয়নি, তবে আমার বন্ধু রজনী মুখার্জী ও নলিনী সেনগুপ্তের কাছে তাঁর কথা অনেক শুনেছি। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।

ওসমানী তখন বললেন, রায় আপনাকে বলে দিয়েছেন, দিল্লী জেলে আমার সঙ্গে আপনার দেখা হবে, কারণ সংবাদপত্রে আপনার দিল্লী জেলে আটক থাকার সংবাদ দেখেছেন তিনি। আপনাকে রায় সাহেব মুখার্জীর মারফত চিনেছেন। তিনি দু'খানা বই লিখেছেন, পাণ্ডুলিপি কলকাতায় ধরিত্রী গাঙ্গুলী অথবা হোসেনে আরার কাছে পাঠাবেন। বই দু'খানা ছাপিয়ে যেন তাড়াতাড়ি বিলি করা হয়।

আমি ওসমানীকে বললাম, কোনো সূত্র থাকলে রায়কে খবর পাঠাবেন যে, হোসেনে আরা এখন জেলে আছে, কবে ছাড়া পাবে বলা যায় না। ধরিত্রী গাঙ্গুলী চিহ্নিত লোক। বরং শোভা মজুমদারকে পাঠালে হারাবার ভয় থাকবে না।

শোভার ঠিকানা বলে দিলাম।

অনশনের পর খাওয়াদাওয়া বেশ ভালই চলছিল। ইতিমধ্যে একটা সুটকেস, তিনখানা ধুতি, তিনটা শার্ট, তিনটা গেঞ্জী, দুজোড়া জুতা আর কিছু কাগজ পেনসিল সরকারের তরফ থেকে পেয়ে গেলাম। মনে হল যেন, শ্বশুরবাড়ীর সওগাত। জেল জীবনেও এটা কম সুখের নয়। কিন্তু এই সুখ বেশীদিন স্থায়ী হল না। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই নোটিশ পেলাম, আমাকে ও মৃণাল সেনকে মুলতান জেলা কারাগারে বন্দী করা হবে। কানাঘুষা শুনলাম যে, কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে আমাদের রাখা হবে না, কারণ আমরা ভয়ানক মানুষ, পৃথক সেলে রাখাই নিরাপদ।

'৩২ সালের ৯ই জুন ভোর পাঁচটায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারসহ আটজন কনেস্টবল মৃণাল ও আমাকে কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়া দিয়ে একটা ছোট পিকআপ গাড়ীতে তুললো। দিল্লী থেকে সড়ক যোগে মুলতান নিয়ে যাওয়া হবে। গাড়ীতে উঠে আমরা অফিসারকে অনুরোধ করলাম যে দিল্লী যখন ছাড়তেই হচ্ছে তখন লালকেল্লা, নিজাম প্রাসাদ প্রভৃতি দর্শনীয় জায়গাগুলি বাইরে থেকে একটু দেখিয়ে নিয়ে যান। অফিসারটি আমাদের অনুরোধ রেখেছিল, তবে মাঝে মাঝে ফোড়ন কেটেছিল, কি জানি, রাস্তা থেকে কেউ আবার ছিনিয়ে নিয়ে যায় যদি। আমরা হেসে বলেছিলাম, আপনাদের এই ভয়ের মাসুল আমাদের অনর্থক দিতে হচ্ছে। আটক আইনের বন্দীদের হাতকড়া পরানো হয় না জানি, আপনারা তাও পরালেন, আটজন সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় আমাদের দুজনকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাও একজন ত তালপাতার সিপাই! তাদের এত ভয়, ইংরেজ রাজত্ব রাখবেন কি করে।

অফিসার বললো, আমাকে অনর্থক আর লজ্জা দিবেন না।

উপর ওয়ালাদের হুকুম তামিল করেছি মাত্র। অন্যথায় চাকরী যাওয়ার ভয় আছে। কথা বলতে বলতে আমাদের দিল্লী ঘোরা হয়ে গেল। এ যেন অন্ধের হাতি দেখার মত। বাইরে থেকে ইমারতগুলি দেখলাম মাত্র।

প্রচন্ড গরম ও বালুঝড়ের ভিতর দিয়ে দুপুরের পর মুলতান ডিস্ট্রিক্ট জেলে পৌঁছুলাম। জেলসুপার আগেই খবর পেয়েছিল। আমাদের দু'জনকে পৃথক সেলে থাকার জায়গা করে দিল। সেল দু'টি দোতলার উপর। প্রত্যেক সেলে একটি করে লোহার খাট, ছোবড়ার গদী, চারখানা করে কম্বল। থালা, বাটী, গ্লাস, টিনের মগ, একটি করে চেয়ার, একটি ছোট টেবিল ও একটি আলনা আগে থেকেই রাখা ছিল। এই সুবিধা টুকু কেবল মাত্র নিরাপত্তা বন্দীদের জন্য।

জেলসুপার জানালো, আপনাদের খাবার তৈরী, গোসল করে নিতে পারেন। আরো জানিয়ে গেল, দিনের বেলায় আপনারা সেলের সামনে বারান্দায় চলাফেরা করতে পারবেন, কিন্তু সন্ধ্যায় আপনাদের সেলের মধ্যে বন্ধ করা হবে। সেলের মধ্যে অবশ্য টয়লেট ও পানির বন্দোবস্ত আছে, বিশেষ অসুবিধা হবে না। হাসি পেল ওর কথা শুনে। বন্দী করে রেখে আবার সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনায় ওরা।

মুলতান জেলখানাটা অবশ্য এমনিতে ভালই। তবে খুব ছোট। সামনে পাহাড়, কিছুটা জঙ্গল। বারান্দায় বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। গাছে নানারকম পাখী এসে বসে প্রাণখুলে গান গায়। মনে, হয় পাখীরা আমাদের উপহাস করছে। ওরা কেমন স্বাধীন আর আমরা মানুষ হয়েও ওদের মত মুক্ত জীবনের স্বাদ উপ-ভোগ করতে পারছি না। কত অসহায় আমরা!

পাহাড়ের পাদদেশে মাঝে মাঝে ময়ুর-ময়ুরী ঘুরে বেড়ায়। কখনো কখনো ছোট ছোট সাপ ব্যাঙ ধরে উল্লাসে নেচে ওঠে। মৃণাল প্রায়ই গলা ছেড়ে গান গাইত। কখনো রবীন্দ্র সংগীত, কখনো নজরুল গীতি। মাঝে মাঝে আবৃত্তিও করতো। প্রাণের প্রাচুর্যে উজ্জ্বল এই যুবক। মনে হয় ব্রহ্মচারীর কথা। তাকে বাদ দিয়ে কেবল আমাদের দু'-জনকে কেন পাঠালো এই তেপান্তরে?

সপ্তাহ দুয়েক বেশ কাটালো। তারপর এক ঘেয়ে লাগতে লাগলো। বাঙগালী বলতে আমরাই দু'জন' আর সবাই অবাঙগালী আর তার পনের আনাই দাগী কয়েদী, চোর, ডাকাত, খুনী ইত্যাদি। বাকী যে কজন রাজনৈতিক বন্দী আছে, তারা সবাই নীচের তলায়। আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয় না। দোতলার আর দু'টি সেলে থাকতো দুটো ফাঁসির আসামী—খুনী ওরা; তাদের বাইরে আসার উপায় ছিল না।

একদিন এক খুনী আসামীর সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বললাম। সেত প্রথমে কথাই বলতে চায় না, মুখ ফিরিয়ে থাকে। বয়েসে যুবক দেখতে শুনতে মন্দ নয়, জাতিতে শিখ। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললাম। একদিন সে মন খুলে তার অপরাধের কাহিনী বলল।

গ্রামের একটি মেয়েকে ভালবেসে সে বিয়ে করেছিল। কিছুদিন যেতে সে বুঝতে পারলো যে, তার বউ অন্য পুরুষের সঙ্গে গোপনে 'আসনাই' করে। একদিন দুপুরে সে কারখানা থেকে পালিয়ে হঠাৎ বাড়ী ফিরে দেখতে পায় যে, তার বউ পরপুরুষের সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। তার মাথায় খুন চেপে গেল। ঘরের হালকা দরজা টেনে খুলে ফেলে। সে রামদা দিয়ে আওরত ও মরদ দু'জনকেই খুন করে থানায় গিয়ে ধরা দেয় এবং সব কিচছা' বলে দেয়। তিন মাস ধরে বিচার হয়, রায়ে তার ফাঁসির হুকুম হয়। তার আত্মীয়-স্বজনরা হাইকোর্টে আপীল করেছে ফাঁসির হুকুম রদ করার জন্য। কিন্তু সে আর বাঁচতে চায় না। তার মতে ফাঁসি হওয়াই তার জন্যে ভাল। সারাজীবন দুঃখ করে কাটাতে হবে না।

২৩শে জুন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুতে যাচ্ছি, এমন সময় একজন মেট এসে সংবাদ দিল, বাবুসাব, আপনার দোস্ত রাতে মারা গেছে। ফাঁসিতে ঝুলছিল। তারপর ফিস ফিস করে জানালো যে, হারামজাদারা গলাটিপে মেরে ফেলেছে। এখন ওরা খুদকুশীর এলজাম (আত্মহত্যার বদনাম) লাগাচ্ছে।

আমার মুখ দিয়ে কথা সরলো না। মাটিতে বসে পড়লাম।

আমার দুঃখের দিনের বন্ধুর এই পরিণতি কল্পনাও করতে পারিনি। রাতে শুয়েছি, অঘোরে ঘুমিয়েছি। ফাঁসি লাগালে অন্ততঃ যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে আসতো মুখ দিয়ে। সে রকম কিছুই শুনতে পাইনি। লাশটা ভোর হবার সংগে সংগে বের করে নিয়ে গেছে। আমাকে একনজর দেখতেও দিল না। মৃণালের বিয়োগে সম্বিত হারিয়ে অঝোরে কেঁদেছি। সকালে চা-নাশতা দিয়েছিল, তার দিকে চেয়েও দেখিনি। জেলসুপার এসে জানালো, তারা দুঃখিত, এমন একজন তরুণ অকালে আত্মহত্যা করল। ওর কথা শুনে সারা গায়ে জ্বালা ধরে গেল, কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা বলতে সাহস হল না। হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাকেও ওই রকমভাবে খতম করে দেবে।

দুপুরে গোসল করে আহারে বসলাম, কিন্তু খাওয়ার রুচি ছিল না। জোর করে কিছু পেটে পুরলাম, রাতে চোখে ঘুম আসে না। কি এক অজানা আতঙ্কে আমার সারা মন ছেয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে ছটফট করি। শেষে রাতে একটু ঘুম এল। সকালে মেট আসতেই তাকে বললাম, জেলার সাহেবকে সালাম দাও। জেলার ছিল মুসলমান। সে অল্পক্ষণের মধ্যে এসে জিজ্ঞাসা করলো ডেকেছেন সাহেব?

হ্যাঁ, মৃণালের লাশ কি করেছেন?—জিজ্ঞাসা করলাম।

জেলার বলল: কাঠের কফিনের মধ্যে করে ট্রেনে কলকাতায় ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে চারজন পুলিশ গেছে।

আমি বললাম, আজ থেকে আমার সেলের সামনে একজন ওয়া-র্ডার রাখবেন। একা এখানে থাকতে আমার সাহস হয় না।

জেলার বলল, বেশ, রাত ১০টা থেকে আপনার সেলের সামনে একজন ওয়ার্ডার শুয়ে থাকবে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম।

দিনের বেলায় কথা বলার লোক নেই। এমন একা একা থাকলে ঠিকই পাগল হয়ে যাবো। ধীরে ধীরে খুনী আসামীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোকটি লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, বাপু-জীর মৃত্যুর খবর জেনেছি। কি বলব বাবু, আপনারা এক-একটা হীরের টুকরো। আযাদীর জন্য লড়াই করছেন আপনারা। আমরা

ত কুকুর-বিড়ালের শামিল। আমাদের জীবনের আর কি দাম আছে। দুঃখ করবেন না বাবু, আপনারা একদিন কামিয়াব হবেন।

একজন খুনী আসামীর এই অনুভূতি আমাকে বিহ্বল করে তুললো। চোখের পানি লুকাবার জন্য সেখান থেকে আমার সেলে এসে ঢুকলাম। এরপর যতদিন মুলতানে ছিলাম, ওর সঙ্গে আলাপ করে সময় কাটাতাম।

৩০শে জুন সকালে জেলগেটে আমায় ডেকে পাঠানো হল। গেটে এসে শুনলাম, দিল্লী থেকে আমার মুক্তির নির্দেশ এসেছে। আজ রাতেই আমাকে কলকাতাগামী ট্রেনে তুলে দেয়া হবে। ওদের একজন অফিসার ট্রেনের টিকিট আনতে গিয়েছে। কোহাট স্টেশনে ফোন করে রিজারর্ভেশনের ব্যবস্থা করেছে। শুনে কি যে আনন্দ হল।

আমি আর বন্দী নেই, তাই সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেলে আর বন্ধ হতে হল না। রাতের খাবার ঠিকই দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমার সুটকেস ও কাপড়-চোপড় একটা মেটের ঘাড়ে চাপিয়ে জেলগেটে হাজির হলাম।

ট্রেনের তখনও ঘন্টা তিনেক দেরী। জেলসুপার আমার হাতে আগের ফেরত টিকিটের দাম এবং তিন দিনের খাবার খরচ ও ট্যাক্সিভাড়া বাবদ আরও চল্লিশ টাকা দিয়ে দিল। রাত ৯টায় একটা টাঙ্গা এনে তাতে চড়িয়ে দিল এবং সঙ্গে একজন জেল ওয়ার্ডারকে দিয়ে বলে দিল যেন আমাকে ঠিকমত গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসে।

মুলতান স্টেশনে আরও ঘন্টাখানেক বসতে হল। ওয়ার্ডার বেচারাও ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এই সুযোগে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবুটার মৃত্যুর কারণ তুমি কিছু জানো কি?

সে জিভ কেটে বলল, আমি কি করে জানবো বাবু, আমার সেদিন ছুটি ছিল। তারপর একটু সহানুভূতির সুরে বলল, আহা বড্ড ভাল ছিল বাবুটা।

ট্রেন বিকট শব্দ করতে করতে প্লাটফরম কাঁপিয়ে স্টেশনে ঢুকলো। হিংস্র অজগর ছোটায় ক্ষান্ত দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে লাগলো। ওয়ার্ডার আমার স্যুটকেস তুলে নিয়ে বললো; চলুন বাবুসাব, আপনাকে বসিয়ে দিয়ে আসি।

ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমার নামের কার্ড দেখে উঠে বসলাম। ওয়ার্ডারকে পাঁচটি টাকা বখশীশ দিতে গেলাম, সে কিছুতেই নেবে না। বলল, এটা ঘুষ হয় বাবু। আমাদের ঘুষ খাওয়া অপরাধ। আমি তাকে বুঝালাম যে এটা ঘুষ নয়, খুশী হয়ে তোমাকে মিষ্টি খাবার জন্য দিচ্ছি। এই বলে তার পকেটে টাকাটা জোর করে গুঁজে দিলাম। আমি খুশী করে দিলাম, কিন্তু সে যেন নাখোশ হল। সে যুগে নীচুস্তরের মানুষের মধ্যে যে নীতিজ্ঞান ছিল, আধুনিক যুগে উঁচুস্তরের মধ্যেও তার অভাব তীব্রতরভাবে অনুভূত হচ্ছে।

ট্রেনের বার্থে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম আমার স্ত্রীর কথা। এখন সে বহরমপুর জেলে আটক আছে। আমার প্রথম কর্তব্য হবে বহরমপুর গিয়ে তার সংগে দেখা করা। হয়ত তার মুক্তির দিন ঘনিয়ে এসেছে।

কলকাতার বাসায় গিয়ে যখন উঠলাম বড় চাচা জানালেন যে হোস্‌নে আরার আরো এক মাস জেল হয়েছে। জেল সুপার চিঠি লিখেছে। তিনি পত্রটি আমার হাতে দিলেন। পত্রে লিখেছে : ২৭শে জুন রাজবন্দিনী হোস্‌নে আরার মুক্তির দিন ধার্য ছিল। এক মাস "রেমিশন" (দণ্ডহ্রাস) হয়েছিল, কিন্তু মুক্তির কয়েকদিন আগে কয়েকজন অল্প বয়স্কা বন্দিনী একটি কাঁঠালগাছে উঠে কাঁঠাল পাড়তে শুরু করে। ওয়ার্ডার বাধা দিতে গেলে কাঁঠাল দিয়ে তারা ওয়ার্ডারকে আক্রমণ করে তাকে জখম করে দেয়। জেলের শৃংখলাভঙ্গের অভিযোগে বিচারে তাদের এক মাস করে জেল হয়। কাজেই "রেমিশন" কাটা গিয়েছে। এখন তাকে ২৭শে আগষ্ট মুক্তি দেয়া হবে।

চিঠি পড়ে মাথা ঘুরে গেল। খবরটা "আনন্দবাজার" অফিসে সুরেশ মজুমদার ও প্রফুল্ল সরকারকে জানালাম। ওরাও সংবাদটা জেনেছেন। বললেন, হোস্‌নে আরার মা জেল থেকে পত্র লিখেছেন। আগামী রোববার আমরা বহরমপুর যাবো। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। হোস্‌নে আরাকে প্রফুল্ল সরকারের স্ত্রী নির্ঝরিণী সরকার নিজের কন্যা বলে পরিচয় দিতেন, সে জন্য হোস্‌নে আরার দেখাশুনার ব্যাপারে তার ধর্মমায়ের তৎপরতার অন্ত ছিল না।

রবিবার রাত্রি বহরমপুর পৌঁছিলাম। সুরেশ মজুমদারের জনৈক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমরা অতিথি হলাম। ভোরবেলা সুরেশ বাবু তাঁর অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গেলেন। ভদ্রলোকের নাম শিশির মিত্র। বহরমপুর জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। শিশির বাবু বন্দীদের সংগে আমাদের সকালেই দেখা করার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

জেল গেটে নির্ঝরিণী সরকার ও হোস্‌নে আরা হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করলো। দেখলাম, বন্দিনীদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ছোট মেয়েদের বাঁদরামিও যথেষ্ট বেড়েছে।

আমি বললাম দু'মাস বেশী জেলে থাকতে হল ; কি দরকার ছিল ওয়ার্ডারকে মারবার ?

ও হেসে জবাব দিল, আমাদের এলাকায় আম-কাঁঠালের গাছে আমাদের অধিকার ; ওরা এখানে আসে কেন ?

নির্ঝরিণী সরকার হেসে বললেন, একটু হাত পাকুক না, আমাদের মেয়েরা ভীরু নয়, এটা ত জানাতে হবে।

দেখলাম, ছোটদের বাঁদরামিতে বুড়োদেরও সমর্থন আছে। জেলে থাকার কষ্টকে ওরা আর কষ্ট মনে করে না।

২৭শে আগষ্ট সকালে আবার বহরমপুর জেলে হাজির হলেম। আজ হোস্‌নে আরার মুক্তির দিন। জেলগেটে উপস্থিত হতেই সুপার ভেতরে খবর পাঠালো। হোসনে আরাকে সঙ্গে করে একদল মেয়ে জেলগেটে এল তাকে বিদায় দিতে। দেখলাম, জেলের ভেতরের বাগানের সব ফুল তুলে ওকে সাজিয়েছে। ফুলের মালা, ফুলের চুড়ি, বাজুবন্দ মাথার টোপর। এক কথায় ফুল দিয়ে ওর সারাদেহ ঢেকে দিয়েছে।

জেলখানা থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনে এলাম। ট্রেনের মধ্যে অনেক যাত্রী গায়ে-পড়ে আলাপ করতে এল। হোস্‌নে আরাকে দেখিয়ে বললো, ইনি কি স্বদেশী করেন ? ইনি কি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন ? যখন জানলো যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরছেন, তখন হিন্দুযাত্রীদের অনেকে এসে দুইহাত জোড় করে নমস্কার করলো। কেউ কেউ মা লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করতে লাগলো।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে হৈ হৈ ব্যাপার। হোসনে আরাকে নেয়ার জন্য কয়েক শত লোকের সমাবেশ হয়েছে, সবাই হিন্দু এবং কংগ্রেস নেতা ও কর্মী। তারা ফুলের মালা ও তোড়া দিয়ে সম্বর্ধনা জানালো।

কলকাতায় মাসখানেক রেখে হোসনে আরাকে গ্রামের বাড়ীতে রেখে এলাম। গ্রামে আমাদের উপর শুরু হল কুসংস্কারে অন্ধ লোকদের অত্যাচার। পড়শীরা সকলেই প্রায় আমাদের বয়কট করে বসলো। আমার এক দূর সম্পর্কের বড় ভাই, প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগলো যে, এই বউকে বাড়ীতে থাকতে দেব না। মুসলমানের মেয়ে বেপর্দা হয়ে মিটিং করবে, জেল খাটবে, এ অনাচার আমরা সইব না। মা ত মাথায় করাঘাত করে চীৎকার করে কাঁদেন, ছেলেকে ঘরমুখো করবো বলে বিয়ে দেওয়ালাম, আর সেই বউ ছেলেকে ঘর থেকে টেনে বের করলো। আরো কত রকম অত্যাচার যে আমাদের উপর দিয়ে চলল, তা বর্ণনা করলে আর একখানা বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে।

আমাদের গ্রামে এবং থানা এলাকায় তরুণদের মধ্যে সংগ্রামী প্রেরণা জেগেছিল। তারা দলে দলে দেখা করতে আসে। কয়েকদিন ধরে জনস্রোত আমার বাড়ী সরগরম করে তুললো। কেউ নিয়ে আসে ফুলের তোড়া, কেউ আনে খাবার জিনিস। তারা যখন আমাদের উপর সামাজিক শাসনের কথা শুনলো, তখন কেউ কেউ ক্রোধে ফেটে পড়ে। তরুণ সমাজের মনোভাব লক্ষ্য করে সমাজপতিরা নীরব হয়ে যায়।

আমার কলকাতা ফেরার সময় হোসনে আরা ফরমায়েস করলো "শতখানেক টাকা খরচ করে আমার জন্য কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, একটা হোমিও মেটেরিয়া মেডিকা এবং একটা ওষুধের বাক্স এনে দিয়ো। একা একা থাকবো, কাজেই গ্রামের লোকের অসুখ-বিসুকে চিকিৎসা করবো। হোমিপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র আমার কিছু কিছু জানা আছে।

পরের সপ্তাহেই তার ফরমায়েশ মত তার সব জিনিষ যোগাড় করে পাঠিয়ে দিলাম? পরে খবর পেয়েছিলাম, তার দাতব্য চিকিৎসা বেশ জোরেশোরে চলেছে।

কলকাতায় চিঠি পেলাম আমার গ্রামের বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়ে খানাতল্লাশী করেছে, তবে আপত্তি জনক কিছু পায়নি। আপত্তিকর

বই-পুস্তক আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল আর বাড়ীর পাশের কলা-বাগানের মধ্যে মাটির নীচে কিছু রিভলভার ও পিস্তল লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতো বিধু সেন। সে নজরবন্দী ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন মামলার আসামী ছিল সে। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোন প্রমাণ না পাওয়ায় বিচারে মুক্তি পায়। কিন্তু নিরাপত্তা আইনে তাকে গ্রেফতার করে আমাদের ওখানে রাখা হয়। সেই বিধু সেন আমাদের বাড়ীতে লুকিয়ে আসতো। পুলিশ তাকে একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলে। বিচারে তার ছয়মাস জেল হয়। অস্ত্রাগার লুটের মামলার আসামীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে সন্দেহ করে হোসনে আরাকে বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখা হল আর আমার পিছনে পুলিশের চর সদাই ছায়ার মত ঘুরতে শুরু করল। সে এক দুঃসহ জীবন।

॥ পাঁচ ॥

১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। '৩২ সালের স্বাধীনতা দিবসের বন্দিনীরা মুক্তি পেয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে কিছুদিন গ্রামের বাড়ীতে রাখার পর কলকাতায় নিয়ে বেনিয়াপাড়া লেনের একটি এক কামরার বাড়ীতে বাস করতে শুরু করলাম। কিন্তু শান্তি আমার ভাগ্যে নেই। আমার স্ত্রীর এক বান্ধবী ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টো-পাধ্যায়ের বাড়ীতে থাকতো। আর সে বাড়ীতেই থাকতো ক্ষিতীশ বাবুর সম্পর্কিত ভাই কমরেড রজনী মুখার্জী। বান্ধবী আরতি মুখার্জী গোপনে কোর্টে গিয়ে রজনীর সঙ্গে বিয়ে করে বসলো। ফলে, ক্ষিতীশ বাবুর বাড়ী থেকে তাদের বাস উঠলো। ওরা বেলিয়াঘাটার এক বস্তিতে ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ীর উপরতলায় একটা কামরা ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগলো। রজনী যখন কলকাতার বাইরে যেতো তখন আরতিকে পাহারা দেয়ার ভার আমার উপর পড়তো। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চালানো যায়। তাই আমার বাসস্থানের পাশে আর একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে রজনীকে সেখানে আনলাম, এতে আর এক বিপদ দেখা দিল। প্রায়ই ওদের হাতে পয়সা-কড়ি থাকতো না, তাই আমার বাজার করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জন্যও বাজার করতে হত। অবশ্য ওরাও হাতে পয়সা এলে আমার জন্যও বাজার করতো। আমারও পয়সা বাড়ন্ত প্রায়ই হত।

এক সঙ্গে বাস করার ফলে এবং ঘনঘন রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার ফলশ্রুতিতে আমি বুঝতে পারলাম, সন্ত্রাসবাদ এদেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান নয়, বরং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, এই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ কলকাতায় এলেন তাঁর বন্ধু রাম মনোহর লোহিয়া কলকাতাকে ঘাঁটি করে কাজ শুরু করেছিলেন। একদিন রজনী মুখার্জী, জয়প্রকাশ, রাম মনোহর

লোহিয়া, কবি প্রণব রায়, অজিত বসু এবং আরো ২০/২৫ জন সমবেত হই মীর্জাপুর স্ট্রীটের তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে। এই বৈঠকেই বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের গোড়াপত্তন হয়। অবশ্য এই দল বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তার কারণ একদিকে কংগ্রেসের এবং অপরদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির চাপ। অবশ্য, পরে এই কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের বেশীর ভাগ কর্মী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগদান করে।

মানবেন্দ্রনাথ মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, সকল জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হিন্দু-মুসলমান এক জাতি নয় বলেই এত দ্বন্দ্ব। তাঁর অভিমত সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের বিক্ষুব্ধ করেছিল, কিন্তু মুসলমানরা তাঁর প্রতি ছিল কৃতজ্ঞ।

সে যাক, সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে সরে আসার উদ্যোগ নিয়েছি, আর কোনও তৎপরতায় তেমন মিশিনা, সলাপরামর্শও করি না। তবু ও পুলিশ পিছু ছাড়ে না। সে কাহিনী এরপর বলবো। তার আগে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাজনৈতিক তৎপরতার চমকপ্রদ কাহিনী বলছি। যে কাহিনী মানবেন্দ্রনাথের মুখেই অনেক দিন শুনেছি।

দ্বিতীয় কোমিনটার্ণ কংগ্রেস

ভারতীয় ব্রাহ্মণ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে দেশের কম লোকই চেনেন। কিন্তু বিশ্বরাজনীতিতে মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায় অত্যন্ত সুপরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বশীরহাট মহকুমার আড়বালিয়া গ্রামে মামার বাড়ীতে তাঁর জন্ম হয়। এবং কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে চাংড়িপোতা গ্রামে পিতৃগৃহে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নরেন ভট্টাচার্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারেননি কিন্তু রাজনীতির ইতিহাসে ছোটবেলাতেই অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেন। তিনি প্রথমে গদর আন্দোলনে যোগ দেন। পরে যতীন মুখার্জীর সাথে 'যুগান্তর' পার্টিতে যোগদান করেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করে তিনি ধীরে ধীরে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯২০ সালের ১৯ শে জুলাই থেকে ৭ ই আগস্ট পর্যন্ত সময়ে। এই সময়ে মস্কোতে দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেস অধিবেশন হচ্ছিলো। এটাকে বলা হতো কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থাপনার জন্য লেনিন একটি খসড়া থিসিস রচনা করেন জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যার উপরে। এই থিসিস সারা দুনিয়ায় প্রতিনিধিগণের নিকট তাদের মতামত আহবান করে পাঠানো হয়। রায় এই থিসিসের উপর তাঁর মতামত লেনিনের নিকট পাঠালেন। ফলে লেনিন তাঁকে অবিলম্বে মস্কোয় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার নির্দেশ দিলেন। লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁকে একটা পরিবর্তে খসড় পেশ করতে বলা হলো। এবং রায় সম্পর্কে লেনিন বললেন যে, আপনার মতামত পড়ে আমার ধারণা হয়েছিলো আপনি একজন পরিণত বয়স্ক রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু মাত্র সাতাশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক যে আমার সঙ্গে, টেক্কা দেবে, তা আমি ভাবতে পারিনি। আমি মুগ্ধ হয়েছি, অভিভুত হয়েছি।

রায় থিসিস রচনা করলেন। এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় লেনিন ও রায়ের দু'টি থিসিসই জাতীয় ও ঔপনিবেশিক কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করা হলো। এর পরের আলাপ-আলোচনায় তাদের মতামতের সঙ্গে দেশের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আন্দোলনের বিরাট পার্থক্য মুর্ত হয়ে ওঠে। এবং এটার কারণ ছিলো বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাসের ফল। রায় বলেছিলেন যে, জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কম্যুনিস্টের আঁতাত থাকা উচিত নয়, কারণ জাতীয় নেতারা সুবিধা বুঝে কম্যুনিস্ট ক্যাম্প ত্যাগ ক'রে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জোট বাঁধবে। কাজেই কম্যুনিস্ট আন্দোলনের উন্নয়ন ও সংগঠনের নিরাপত্তার জন্য শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে গণআন্দোলন শুরু করা অপরিহার্য কর্তব্য। অবশ্য কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর একটা অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যার ফলে লেনিন ও রায় উভয়ের থিসিসই কংগ্রেস গ্রহণ করলো। পরিবর্তিত থিসিসে লেনিন এই কথাটা যোগ করলেন, যার অর্থ হলো, স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলন। এর ফলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আন্দোলন কথাটা থিসিস থেকে উঠিয়ে দেয়া হলো। এই প্রস্তাবটি মূলত এম, এন, রায় তাঁর থিসিসের মাধ্যমে

পেশ করেছিলেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে কম্যুনিস্টদের নীতি হলো কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট পার্টি বুর্জোয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তা করবে। অবশ্য বিরাট কৃষক ও মজুর জনগণের বৈপ্লবিক কর্মধারায় যদি তারা বাধা দান না করে।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে লেনিনের এশিয়া কম্যুনিস্ট আন্দোলন প্রচারে এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। বিখ্যাত কম্যুনিস্ট ভাষ্যকার রবার্ট সি, নর্থ ও জনিয়া জে ইউডিন বলেছিলেন যে, রায় লেনিন ও মাও-সেতুং-এর সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার অনুন্নত দেশসমূহে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নীতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

প্রথমদিকে রায়ের ধারণা ছিল যে ঔপনিবেশিক ও আধা- ঔপনিবেশিক এলাকায় জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন দান করার যে নীতি তিনি প্রচার করেছিলেন ভারতে তা প্রযোজ্য নয়। যখন তিনি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় নেতাদের কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর মনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কথাই উদিত হয়েছিল। লেনিনও স্বীকার করে ছিলেন যে, জাতীয় প্রগতিশীল আন্দোলন প্রথম দিকে কিছুটা জোরদার থাকলেও চরম পর্যায়ে তা কমুনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কম্যুনিস্ট আন্দোলন অকস্মাৎ উপর থেকে চাপিয়ে দেবার পরিবর্তে নীচু থেকে শুরু করবে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। সেই সময়টা অনুকুল মনে হবে যখন কম্যুনিস্ট পার্টি জাতীয় আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি কৃষক, মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্তদের সহায়তায় কাজ শুরু করবে। অবশ্য এটা নির্ধারণ করতে হবে কায়েমী স্বার্থ ও সর্বহারাদের শক্তির পরিমাপ করে। লেনিন এই প্রশ্নে রায়ের সঙ্গে একমত হলেও ভারতের ব্যাপারে তিনি দ্বিমত পোষণ করতেন।

ভারতীর জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিশ্বস্ততায় রায় গভীর সন্দেহ পোষণ করতেন। তিনি ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগ করেন। এই সময় পর্যন্ত ভারতের বুর্জোয়া প্রভাবিত জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে তার যোগাযোগের ফলশ্রুতিতে এই সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। এই বুর্জোয়া শ্রেণী বৃটিশ কালচার এবং কর্মপন্থার উপর যেরূপ আস্থা রাখতো,

তাতে কেবলমাত্র স্বায়ত্তশাসন লাভ ছাড়া আর কিছুর দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। পক্ষান্তরে, মধ্যপন্থী ও পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী মনে করেতা যে অনিয়মতান্ত্রিকপন্থা ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদী শোষক দের নিকট থেকে কোনো-রূপ সুযোগ-সুবিধা আদায় করা সম্ভব নয়। এর ফলে ১৯০৭ সালে সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশনে দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এবং মধ্যপন্থী ও পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী কংগ্রেসের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। এই নতুন দল তাদের যে নীতি ঘোষণা করলো তা তাদের পূর্ব অনুসৃত নীতি থেকে বিচ্যুতি বলা যায়। বলা হলো যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বর্তমানে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বুদ্ধিজীবী ও শিল্প সংস্থাকে সুসংগঠিক ক'রে একটা নৈতিক ও আর্থিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এই নতুন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন মহারাষ্ট্রীয় নেতা বালগঙ্গাধর তিলক।

বঙ্গদেশের প্রগতিপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও বৈপ্লবিক পন্থা নিয়ে দলাদলি ছিল। উগ্রপন্থীরাও আবার দুই দলে বিভক্ত ছিল। এদের কেউ 'যুগান্তর' আবার কেউ 'অনুশীলন' পার্টির। যুবক মানবেন্দ্র 'যুগান্তর' পার্টিতে কাজ করতেন। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় তেইশ বছর কাজ করবার পর গান্ধীজী যখন ভারতবর্ষে ফিরে এলেন, রায় তখন ভারত ত্যাগ করলেন। ১৯১৯ সালে গান্ধীজী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিখিল ভারত আন্দোলন শুরু করলেন। কয়েক বছর পর কংগ্রেস উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর ডিবেটিং ক্লাবের পরিবর্তে উগ্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

ভারতের সর্বহারাদের শক্তি ও আদর্শ সম্পর্কে রায়ের যে ধারণা ছিল, তা অতিরঞ্জিত বলা যেতে পারে। তিনি অনুমান করেছিলেন যে পঞ্চাশ লাখ শ্রমিক এবং তিন কোটি সত্তর লক্ষ ভূমিহীন কৃষক সমবায়ে যে বিরাট গণশক্তি ভারতে আছে, তারা একদিন নিজস্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রকৃত বিপ্লবের চাবি-কাঠি এদের হাতেই থাকবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদীদের ক্ষমতা আর বেশীদিন অব্যাহত থাকবে না। দুনিয়ার অধিকাংশ উপ-নিবেশে সংঘবদ্ধ বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব এখনই অনুভূত হচ্ছে।

লেনিন অবশ্য রায়ের এই মতামতের সঙ্গে একমত ছিলেন না। মার্কস বলেছিলেন যে, শ্রেণী চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দেখা দেবে। এবং সর্বহারার বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। এর দু'বছর আগে লেনিন লিখেছিলেন যে শ্রমিকরা কারখানায় বাঁধাধরা নিয়মে কাজ করে যাবে। সময় এবং সম্ভাবনা কোনোটাই তাদের সমাজতন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে না।

ভারতের অবস্থা সম্পর্কে লেনিনের অভিমত ছিল, স্থানীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগে অস্থায়ী সহযোগিতার মাধ্যমে সুবিধা আদায় করা। রায় কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। সেজন্য তিনি স্বতন্ত্রভাবে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি শ্রমিক ও মজুরদের সোভিয়েট গঠন অবিলম্বে সম্ভব বলেও মত প্রকাশ করেছিলেন।

রায় তাঁর থিসিসে উল্লেখ করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে, যার ফলে সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও নতুন নতুন শিল্প ভারতে ব্যক্তিমালিকানায় গড়ে উঠেছে। সেজন্যই রায় মনে করতেন, নীচু থেকে বিপ্লব সংগঠনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের পথ প্রশস্ততর হয়েছে। তাঁর এই থিসিস "ইন্ডিয়া ইনট্রানজিশন" পুস্তকে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের রুশীয় সংস্করণ ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। রায় মনে করতেন যে শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তায় বুর্জোয়া শিল্পপতিরা বৃটিশ শাসকদের নিকট থেকে যেমন সুবিধা আদায় করবে, তেমনি শ্রমিকশ্রেণী তাদের সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে শ্রেণী-সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করবে। অবশ্য কয়েক বছর পর রায় ও লেনিনের মধ্যে পরিদৃষ্ট মতপার্থক্য অনেকটা কমে আসে এবং উপনিবেশবাদবিরোধী বিপ্লব ও পুঁজিবাদবিরোধী সাম্যবাদ পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসে যায়। ১৯২৭ সাল বিশ্ব কম্যুনিজমের একটা সংকটময় সময়। এই সময় চীনা নীতি সম্পর্কে একদিকে স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে এবং অপর দিকে রায় এবং বরোডিনের মধ্যে আদর্শের সংঘাত প্রবল হয়ে উঠে। দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে তার অবসান ঘটানো যায়নি। কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব

অত্যন্ত অধিক থাকায় তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের প্রতিক্রিয়া বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের উপর পড়ে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির রায় বিরোধী ভূমিকা এই বিরোধের অবিসংবাদিত ফলশ্রুতি।

সোভিয়েট রাশিয়া ও গণচীনের কম্যুনিস্ট আদর্শের পার্থক্য উপরোক্ত ডিবেটের কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কি ভাবে সাম্যবাদে রূপান্তরিত করা যায় তা নিয়ে বিতর্কের অবসান আজ পর্যন্ত হয়নি। বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা ও চিন্তাবিদ ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন যে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতাদের জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের ভূমিকা আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে কি হতে পারে তা ভাবা দরকার। দক্ষিণপন্থী (মস্কো গ্রুপ) ও বামপন্থী (পিকিং গ্রুপ) তাদের মতপার্থক্যের অবসান ঘটাতে হলে দুনিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলন এক সীমাহীন বাধার সম্মুখীন হবে। বিশেষ করে প্রথম জাতীয় আযাদী এবং পরে অর্থনৈতিক আযাদীর যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার সাফল্য সুদূর পরাহত হবে। বিশেষ করে জাতীয় স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনাও ব্যাহত হবে।

উপমহাদেশে সাম্যবাদের অনুপ্রবেশ

১৯২০ সালের পর থেকে এম. এন. রায় ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সার্থকভাবে গোড়াপত্তন করার জন্য কাজ শুরু করেন। তিনি ভারতীয় নাবিক লস্কর প্রভৃতির মাধ্যমে কম্যুনিস্ট পুস্তক ও পত্রিকা ভারতে পাঠাতে লাগলেন এবং ভারতের কংগ্রেসী ও গণতন্ত্রমনা ব্যক্তিদের নিকট সরাসরি পত্রালাপের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রচারে ব্যাপৃত হলেন। তাঁর সঙ্গে ভারতের খিলাফত আন্দোলনের এবং বঙ্গদেশের সন্ত্রাসবাদী নেতাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো। এবং এই যোগাযোগই ভারতে সাম্যবাদী মতবাদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছিল।

মুসলমানদের ভূমিকা

১৯২০ সালের শেষভাগে সোভিয়েট রাশিয়ার তাশখন্দে প্রবাসী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। এই পার্টি গঠিত হয়েছিল বিশেষ করে মোহাজেরদের দ্বারা। তুরস্কে খেলাফতের অধিকার বৃটেন ক্ষুণ্ণ করে, তার প্রতিবাদে ভারতের প্রগতিবাদী মুসলমানরা হিন্দুস্তানকে 'দারুল

হরব' ঘোষণা করে এবং দলে দলে ভারত ত্যাগ করে আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখান থেকে তারা তাশখন্দে চলে যায়। সেখানে সামরিক শিক্ষা লাভ করে তারা ভারতের আযাদী সংগ্রামে শরীক হবে, এই ছিল তাদের আশা। ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল তুরস্কে গণতন্ত্র ঘোষণা করার পর খেলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরবর্তী পরিসংখ্যানে জানা যায় যে পাঁচ হাজারেরও বেশী মুসলমান ভারত ত্যাগ করেছিল। তারা কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করতে চায় এবং মোস্তফা কামালের গণবাহিনীতে যোগদানের ইচ্ছা পোষণ করে। কিছু মোহাজেররা আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করে। এই সময় মধ্য এশিয়ায় বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আগুন জ্বলছিল এবং সোভিয়েট রাশিয়া বিরাট অঞ্চল দখল করে রেখেছিল। মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মোহাজেরদের আশ্রয় দান করে এবং যারা তুরস্কে যেতে চায় তাদের যাত্রার সুযোগ-সুবিধা করে দেয়। ১৯২০ সালের শেষ দিকে প্রায় ৮০ জনের একটি দল হিন্দুকুশ পার হয়ে হেঁটে এশীয় তুরস্কে প্রবেশ করার আগেই তুর্কী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। এই সময় তুর্কীরা এশিয়ায় বলশেভিক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অবিশ্যি কির্কি দুর্গে অবস্থিত সোভিয়েট সেনারা মোহাজেরদের উদ্ধার করে এবং তাদের তুরস্কে অথবা নিকটবর্তী তাশখন্দে যাওয়ার অনুমতি দান করে। তাশখন্দে এদের সামরিক শিক্ষাদানের সুবিধা দেয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। এই দলের চল্লিশজন মোহাজের তাশখন্দে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা তাশখন্দে উপনীত হলে এম, এন, রায় তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনি মস্কো থেকে সবেমাত্র সেখানে গিয়েছেন। কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সেন্ট্রাল এশিয়াটিক ব্যুরোর প্রধান হিসেবে তাঁর কাজ ছিল এশিয়ায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ঘটানো। তাঁর আর একটা কাজ ছিল ভারতের সীমান্ত প্রদেশের পাঠান উপজাতিদের নিকট প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ জোরদার করা। এ জন্য তিনি তুরাঙ্গজাই এর হাজী সাহেব, ইপির ফকীর সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। এ ছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে

যারা দলত্যাগ করবে এবং ভারতের বিপ্লবী যুবকদের প্রয়োজনের সময় যাতে আশ্রয় মেলে, সে কারণে সীমান্তের পাঠানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হয়। এ ছাড়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্ভব হলে সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চলে মূল ঘাঁটি করে সেখান থেকে যথাসময়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা। এজন্য তিনি মস্কো থেকে তাশখন্দ আসার সময় সংগে এনেছিলেন সাতাশ ওয়াগন বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম, দুই ওয়াগন বোঝাই সোনার মোহর ও সোনার বার, পাউণ্ড ও টাকা দশ ওয়াগন বোঝাই বিমানের খোলা অংশ এবং সামরিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য একদল রাজনীতিবিশারদ।

মোহাজেরদের তাশখন্দ আগমনের সংবাদ পেয়েই রায় ঠিক করলেন, ভারতের মুক্তিসংগ্রামে এই দলকে কাজে লাগাতে হবে। এই জন্যই কির্কিতে যাদের উদ্ধার করে রাখা হয়েছিল তাদের তিনি তাশখন্দে নিয়ে গেলেন। এদের সঙ্গে আরো কিছু ভারতীয় মুসলমান যোগদান করলো এবং তাদের স্বতন্ত্রভাবে এক বিরাট আবাসিক প্রাসাদে রাখা হল। এই প্রাসাদের নাম দেয়া হয় "ইণ্ডিয়া হাউস" বা ভারত-ভবন। এইসব মুসলমানেরা অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত। কাজেই কম্যুনিজমের আদর্শ উপলব্ধির সম্ভাবনা তাদের মধ্যে ছিল না। এরা ইসলামী আদর্শ সামনে রেখে সংগ্রামে প্রস্তুত ছিল তবে অল্প কয়েকজন কম্যুনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল এশিয়া ব্যুরো থেকে পার্টি সংগঠনের অনুমতি গ্রহণ করে। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে মোহাম্মদ শফিকের নেতৃত্বে প্রথম প্রবাসী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টির অন্যান্য সদস্য ছিলেন এম. এন. রায় ও তাঁর প্রথমা স্ত্রী এভেলিন রায়, অবনী মুখার্জী এবং তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী রোজা, মাসুদ আলী শাহ, আব্দুর রব, ত্রিমুল আচার্য, শওকত ওসমানী ও আবদুল্লাহ সাফদার। আব্দুল কাদির খান নামক জনৈক মোহাজের পার্টিতে যোগদান করেছিল, কিন্তু পরে সে বৃটিশের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে থাকে। ফলে, তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

তাশখন্দে মোহাজেরদের সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র বেশীদিন চলতে পারিনি। তার কারণ আফগানিস্তান সরকারের অসহযোগিতা। ভারত ও সোভি-

য়েট রাশিয়ার মধ্যবর্তী আফগান এলাকার মধ্যে দিয়ে ভারতে বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে হলে আফগান সরকারের অনুমতি আবশ্যক। কিন্ত আফগানিস্তান অনুমতি না দেয়ার ফলে সীমান্ত উপজাতি এলাকায় বিদ্রোহীদের মূল ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। এদিকে অধিকাংশ মোহাজের কম্যুনিস্ট মতবাদ গ্রহণ না করায় এবং আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে ভারতে যোগাযোগের পথ না পাওয়ায় সোভিয়েট রাশিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে তিক্ততা বৃদ্ধি করা নিরর্থক মনে করলো এবং সেজন্য তাশখন্দে সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হল। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এশিয়ার কোমিনটার্ন বাতিল করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকলো না। মধ্য এশিয়া থেকে এশিয়ার ঔপনিবেশিক এলাকায় বিপ্লব সংগঠনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তাও বাতিল করে মস্কোর সদর দফতর থেকে ইস্টার্ন কমিশনের কাজ চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে উপরোক্ত সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অবনী মুখার্জীর উপর তাশখন্দের কাজ পরিচালনার ভার দিয়ে রায় ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে মস্কোয় প্রত্যাবর্তন করেন। এর আগে ইউরোপীয় অঞ্চলে অবস্থিত প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃস্থানীয় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভার ছিল। কিন্তু এখন তাঁর বদলে রায়ের ওপর ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মস্কোতে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের শিক্ষাদানের পর তাদের ভারতে পাঠিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

রায় ভারতীয় সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রের বাইশজন স্নাতক ছাত্রকে নিয়ে মস্কোয় ফিরে এলেন। এবং তাদের আরো উন্নততর শিক্ষাদানের জন্য কম্যুনিস্ট ইউনিভারসিটি অব টয়লার্স অব দি ইস্ট, যা ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ভর্তি করে দেয়া হয়। বাদবাকী সকলকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে কাউকে ভারতে, এবং যারা ইচ্ছা করলো তাদের তুরস্কে পাঠিয়ে দেয়া হল। ভারতে এসে নতুন করে কম্যুনিস্ট পার্টি পুনর্গঠিত করে মোহাম্মদ শফি পুনরায় পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত হন এম, এন, রায়, অবনী মুখার্জী শওকত ওসমানী,

ফজলে এলাহী, কোরবান এবং খুশী মোহাম্মদ। খুশী মোহাম্মদের অনেকগুলি নাম ছিল, যথা, মোহাম্মদ আলী, ইব্রাহিম, সিপাহী।

১৯২২ সালে রায়ের কর্মকেন্দ্র মস্কো থেকে বার্লিনে স্থানান্তরিত হয়। ওখানেই মে মাসের ১৫ তারিখে পার্টির প্রচারপত্র 'দি ভ্যাংগার্ড অব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেণ্ডেন্স' প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালের শেষভাগে রায়ের তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়, যথা (১) ইন্ডিয়া (২) ইণ্ডিয়ান প্রবলেম এণ্ড ইটস সল্যুশন (৩) হোয়াট ডু উই ওয়ান্ট? এই পুস্তকসমূহের সব কপি মধ্যএশিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতে পাচার করা হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। তিনি ঐ জন্যে নতুন উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু করলেন।

বঙ্গদেশের বিপ্লবীদের সংঙ্গে যোগাযোগ

বঙ্গদেশে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবীদল ছিল, যুগান্তর ও অনুশীলন। অনুশীলন পার্টি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী এবং সেজন্যই মুসলমান-বিরোধী। তারা ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতো এবং মুসলমানদের জাতীয় দুশমন মনে করতো। পক্ষান্তরে, যুগান্তর দল ততটা সাম্প্রদায়িক ছিল না, যদিও এর কিছু কিছু নেতা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিল, তবে রায় এবং দলের অন্যতম নেতা যতীন মুখোপাধ্যায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। রায় যুগান্তর পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলেই তিনি বিদেশ থেকে 'যুগান্তর' দলের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে বিপ্লববাদ তথা সন্ত্রাসবাদের গোড়াপত্তনের কথা বলতে হলে উনিশ শতকের শেষভাগে ফিরে যেতে হয়। প্রথমে কলকাতার একদল ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় ম্যাৎসিনীর তরুণ ইতালী আন্দোলনের কথা শুনে উৎসাহিত হয় এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের আশা পোষণ করতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সন্ত্রাসবাদে আস্থাশীল ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল সন্ত্রাসবাদের পক্ষে সমর্থন দান করতেন।

বঙ্গদেশে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন জোরদার হওয়ার একটা কারণ ঘটে

গেল ১৯০৫ সালে। লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। তিনি শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এবং উপেক্ষিত পূর্ববঙ্গ ও আসামের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে বঙ্গদেশকে দু'টি পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করেন। গঙ্গানদীর পশ্চিম পারের অঞ্চল, উড়িষ্যা ও বিহার নিয়ে গঠিত হলো পশ্চিমবঙ্গ এবং গঙ্গার পূর্ব পারের অঞ্চল ও আসাম প্রদেশ নিয়ে গঠিত হল পূর্ববঙ্গ। এই বিভক্তিতে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিশেষ করে তরুণ সমাজে বিক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা মনে করতে লাগল যে ভারতে বঙ্গদেশের ভূমিকাকে দাবিয়ে রাখার জন্যই এবং ভদ্রলোকদের (হিন্দু জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণী) অধিকার নস্যাত করার জন্যই প্রদেশ ভাগ করা হলো। এই তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণী বলতে বোঝাতো ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ব্রাহ্মদের। এরা হিন্দুদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর। অন্যান্য হিন্দুদেরকে এরা অস্পৃশ্য করে রাখতো এবং সমাজে এদের যোগ্য স্থান দেয়া হত না। মুসলমানদের ত এরা মানুষ বলে মনে করতো না। বিংশ শতাব্দীর গোড়াপত্তনের আগে এই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা বৃটিশ শাসনের আওতায় সবরকম সুবিধা ও সুযোগ ভোগ করে আসছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই কায়েমী স্বার্থ সংকটের মুখোমুখি হয়। তার কারণ ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং ভূমির উপর সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা। বাংলা বিভক্ত হওয়ায় জমিদার শ্রেণীর প্রভাব সংকুচিত হয়ে যায় এবং পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান ও আসামবাসীরা জনসংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশী হওয়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যা যুক্ত হওয়ায় এই শ্রেণীর বাংগালীদের আধিপত্য ভয়াবহরূপে সংকুচিত হয়।

বাংলা বিভাগের পর এই বিভক্তি রোধ করার জন্য উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু তরুণরা আন্দোলন শুরু করে। এবং সন্ত্রাসবাদ তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক বলে মনে করে। হিন্দু কায়েমী স্বার্থ তাদের সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখার আশায় ভাববাদী বিপ্লবীদের গোপনে অর্থ সাহায্য করতে লাগলো। অরবিন্দ ঘোষ এবং যুগান্তর দল তখনো হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল। তারা হিন্দু ধর্মরক্ষার শ্লোগান দিয়ে তরুণদের উত্তেজিত করতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট

১৯১১ সালে বাংলা বিভাগ রদ করে দেয়। আর এই একই সময়ে কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। শুধু তাই নয়, বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিহার ও উড়িষ্যার ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বঙ্গদেশ থেকে ছাঁটাই করে সে দুটোকে দুটো পৃথক প্রদেশ করে দেয়া হয়। এর ফলে বঙ্গদেশের আকার আগের চেয়েও অর্ধেকের বেশী ছোট হয়ে যায়। সরকারের এই দুইটি ব্যবস্থাকে বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায় শাস্তিমূলক বলে মনে করে। এবং তারা তাদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। ঠিক এই সময় ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। গবর্ণমেন্ট এই মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে নিবর্তনমূলক আইনে উগ্রপন্থী নেতা ও যুবকদের গ্রেফতার করে জেলখানা বোঝাই করতে শুরু করে। এতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে পড়লেও একেবারে নিঃশেষে হয়ে যায়নি। মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অনুরোধে আটক বন্দীরা মুক্তি পেলো। এরা দলে দলে কংগ্রেসে যোগদান করতে লাগলো। কিন্তু তারা তাদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নীতি একেবারে বিসর্জন দেয়নি। যেহেতু এরা জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর অন্তর্গত এবং পল্লীর মাটির সঙ্গে এদের সম্পর্ক, সেহেতু তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কতকটা পরিবর্তন হয়েছিল। তাদেরকে জার শাসিত রাশিয়ার সমাজ বিপ্লবীদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তারা কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে সাহায্য লাভ করেছে, কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি করতে রাজী হয়নি।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ায় কবি রবীন্দ্রনাথ "আমার সোনার বাংলা" গান লিখে হিন্দুদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা এতে ক্ষুব্ধ হয়।

রায়ের প্রাক্তন সহকর্মীরা তাঁর নতুন রাজনৈতিক মতবাদকে পছন্দ করেনি। গান্ধীজীর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের যখন রায় সমালোচনা করেছেন, তখন এরা খুশী হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পদ এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রায় যখন কথা বলেছিলেন, তখন রায়কে তারা সমালোচনা করেছে।

বঙ্গদেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলন চালু করার জন্য রায় মস্কো ও

বার্লিন থেকে অর্থ পাচার করতেন। টাকাটা অরবিন্দের পত্রিকা "যুগান্তরের" মুদ্রাকর রামচরণ লাল শর্মা নামক এক ব্যক্তির নিকট আসতো। ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীর বাশিন্দা শর্মার ধরা পড়ার ভয় ছিলনা। কাজেই এ ব্যাপারে তাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

কিন্তু রায় মর্মাহত হলেন, যখন তিনি দেখলেন যে পার্টির জন্য অর্থব্যয় না করে শর্মা সমস্ত অর্থই আত্মসাৎ করেছে। অথচ বঙ্গদেশে যারা সাম্যবাদ প্রচারে এগিয়ে এসেছিল ও রাশিয়া থেকে অর্থসাহায্য পাবার আশা করেছিল তারা সাম্যবাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। রায় অবশ্য তিনজন বিপ্লবীর সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তারা অনুশীলন পার্টির হলেও মতবাদ ত্যাগ করে সাম্যবাদে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এরা হলেন, যোগেশ চ্যাটার্জী, গোপেন্দ্র চক্রবর্তী এবং ধরণী-মোহন গোস্বামী। অবশ্য রায়ের সহকারী নলিনীকুমার গুপ্ত একবার ১৯২১ সালে, পরে ১৯২৩ সালে মস্কো থেকে ভারতে এসে এদের সাম্যবাদের পথে টেনে আনেন। কলকাতার নলিনী দাসগুপ্ত মুজফফর আহমদের সঙ্গে মিলিত হন। মুজফফর আহমদ পরে ভারতীয়, কম্যু-নিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা হিসাবে পরিচিত হন।

চতুর্থ কোমিনটার্ণ কংগ্রেস

১৯২২ সালের ১৭ই নভেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত মস্কোয় চতুর্থ বিশ্ব কম্যুনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রায় এই সম্মেলনে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের উপর আস্থা রাখার বিপদের কথা জোরে-শোরে ঘোষণা করেন এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হবে। তিনি একথাও বলেন যে, ভারতে এখনও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তাদের সংগ্রাম সম্পূর্ণ-ভাবে চলছে না। সেখানে যদি শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা না যায়, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করতে তারা পারবে না। তাঁর এই মতবাদ ইন্টার্ণ কমিশনের সদস্য হিসাবে তিনি সম্মেলনে পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয়। সম্মেলনে এই নীতি গ্রহণ করা হয় যে, চাষী ও মজুর জনগণকে তাদের বর্তমান শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের ভুল-ত্রুটি সুষ্ঠুভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

রায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, এশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি যখন জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে তখন তারা যেন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দেয়।

পেশোয়ার ও কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা

১৯২২ সালের শেষভাগে সাম্রাজ্যবাদী ভারত সরকার কম্যুনিস্ট আন্দোলন দমন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ভারতের যে সকল মুসলমান হিজরত করে তাশখন্দে গিয়ে সামরিক শিক্ষাগ্রহণ করেছিল, তারা ধীরে ধীরে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। কেউ দুর্গম আফগানিস্তানের পাহাড় এলাকা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে, কেউ অন্যপথেও ভারতে প্রবেশ করে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদের যথাসম্ভব দ্রুত এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সহযোগিতায় গ্রেফতার করেন এবং নামমাত্র অভিযোগে এদের বিচার হয়। পাসপোর্ট আইন ভঙ্গ করার অপরাধে এরা দন্ডিত হয়। এদের মধ্যে দশজনকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা নাম দিয়ে বিচার করা হয়। অবশ্য এই দশ জনের নয়জনই কম্যুনিস্ট ছিল। এদের মধ্যে সাতজনকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। মিয়া মোহাম্মদ আকবর শাহ ও গওহর রহমান খাঁ দুই বছর করে কারাদণ্ডিত হন। পাঁচজনকে পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এরা হলেন, পীর আবদুল মতিন, আবদুল মজিদ, ফিরোজ উদ্দীন, মনসুর, রফিক আহমদ, হাবিব আহমদ, নাসির ও সুলতান মাহমুদ।

তাশখন্দ ফেরত এবং যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত মোহাজেররা ভারতে ফিরে আবার কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। ১৯২৫ সালে ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়। এশিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের জন্য যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে শওকত ওসমানী ও ফজল এলাহী, কোরবান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দু'জন ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করেন।

মোহাজেরদের অন্যতম সদস্য শওকত ওসমানীকে অনেক পরে গ্রেফতার করা হয়। তাকে ১৯২৪ সালে কানপুরে আনা হয়। এবং মুজফফর আহমদ, এস এ ডাঙ্গে ও নলিনী দাশগুপ্তের সঙ্গে কানপুর বলশেভিক মামলার আসামী করে বিচার করা হয়। গোলাম হোসেন

ও সিংগাড়া বেলুচেত্তিয়ার এই মামলার আসামী হিসাবে গ্রেফতার হয়। গোলাম হোসেন সরকারের রাজসাক্ষী হয় এবং বার্ধক্যের অজুহাতে চেত্তিয়ারের বিচার হয়নি। কাজেই তারামুক্তি পায়। আসামীর ভূমিকায় এম, এন, রায় ও আর, এ শর্মা ছিলেন। কিন্তু তারা বিদেশে থাকায় গ্রেফতার হননি। চারজন আসামীকেই পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। নলিনী গুপ্ত অসুস্থতার জন্য অল্পদিন কারাভোগের পর মুক্তি পান। শওকত ওসমানী যুক্ত প্রদেশে সর্বপ্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করেন। কিন্তু ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ওসমানী পার্টির সংশ্রব আপাতত ত্যাগ করেন। ১৯২৮ সালে ওসমানী ষষ্ঠ কোমিনটার্ণে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতীয় প্রতি-নিধি ছিলেন না, মস্কোতে তিনি এই অসত্য পরিচয় দিয়েছিলেন। এর ফলে, তাঁকে পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়। এখানেই তাঁর কম্যুনিস্ট কার্যকলাপের অবসান ঘটে।

মুজফফর আহমদ ও এস এ ডাঙ্গের কারাদণ্ডের ফলে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দুই শ্রেষ্ঠতম সংগঠকদের সাহায্য থেকে কম্যুনিস্ট আন্দোলন বঞ্চিত হল। এদের আটকের পরেও অন্যান্য কম্যুনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের উপর সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ল। এর ফলে জনগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় এবং আন্দোলন থেকে অনেকেই সরে যেতে আরম্ভ করে। গবর্ণমেন্টের নিষ্পেষণ নীতির কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রায় প্রস্তাব করলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে আইনানুগ বৈপ্লবিক আন্দোলন চালানোর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত কম্যুনিস্ট আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই গুপ্ত সংগঠনই কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত বামপন্থী দলের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে। ১৯২২ সাল থেকে এম, এন, রায় চেষ্টা করছিলেন যে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ও কিষাণ সভা একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট হিসাবে আইনানুগ উপায়ে কাজ করলে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

১৯২২ সালের নবেম্বর মাসে মস্কোতে ঔপনিবেশিক কমিশনের অধি-বেশনে রায় এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার

পর রায় ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী নেতা ও সংগঠনের কাছে নির্দেশনামা পাঠিয়ে দেন। তাতে বলা হয় যে কম্যুনিস্ট কর্মিগণ যেন কংগ্রেসের বামপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করে এবং খেলাফত আন্দোলনের সক্রিয় সহযোগিতা অর্জনে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তবে বামপন্থীদের এই সংগঠন যেন কম্যুনিস্টদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে আপাততঃ কোনো বিভেদ সৃষ্টি যেন না হয় তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই সময় রায়ের সমর্থন লাভ করে ইণ্ডিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টি নাম দিয়ে একটা দল গঠন করার চেষ্টা চলে। তাও কংগ্রেসের অভ্যন্তরে, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

১৯২২ সালের মে মাসে রায় মুজফফর আহমদের নিকট লিখিত এক পত্রে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের অনুরোধ জানান। এ পার্টিও গুপ্ত সংগঠন হিসাবে কাজ করবে। এ ছাড়াও প্রকাশ্যভাবে পিপলস পার্টি অথবা শ্রমিক ও কৃষক পার্টি নামে একটি দল গঠন করতে হবে, যাতে সকল বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী মিলিত হতে পারবে। এটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্ট হিসাবে কাজ করবে। স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই পার্টি কম্যুনিস্ট স্লোগান ব্যবহার করবে না। ১৯২৪ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর একটি বৈধ দল গঠন করে কম্যুনিস্টদের জন্য একটি আচ্ছাদন সৃষ্টির উপর জোর দেয়া হচ্ছিল।

পঞ্চম কোমিনটার্ণ কংগ্রেস

১৯২৪ সালের জুন মাসে পঞ্চম কংগ্রেসে এম, এন, রায় বলেন যে, গত কয়েক বছর ধরে কম্যুনিস্টরা কেবলমাত্র দেশীয় শোষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। কিন্তু বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হতে পারেনি। আবার দেশী বুর্জোয়া শ্রেণী শোষিতদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতা করতে থাকে। এমতাবস্থায় রায় প্রস্তাব করেন যে কম্যুনিস্টরা সর্বহারা চাষী মজুর ও পাতি বুর্জোয়াদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে। পাতি বুর্জোয়ারা তখনও চিন্তার দিক থেকে কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু চাষী ও মজুর শ্রেণীকে সুসংগঠিত করতে পারলে পাতি বুর্জোয়া-শ্রেণী এদের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের নিকট এক আবেদনপত্রে রায় বলেন যে নিয়মতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে এবং জনগণের বিপ্লবকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যতটা ভয় করে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব ততোধিক ভয় করে। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস তখনই সত্যিকারভাবে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠবে যখন বিপ্লবী জনগণের সমবায়ে এবং সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের কর্মসূচী নির্ধারিত হবে। তিনি একটা বিপ্লবী জাতীয়দল গঠনের জন্য নিম্নরূপ কর্মপন্থা পেশ করেন। (১) জাতীয় স্বাধীনতা; (২) জমিদারী ও সামন্ততন্ত্রের অবসান; (৩) ভূমি, খনি ও জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণ। এই ধরনের কর্মপন্থাই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

ভারতের সীমানার মধ্যে প্রথম কম্যুনিস্ট দল গঠিত হয় ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই সময় সত্যভক্ত নামে জনৈক কানপুরবাসী প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টির ত্রৈমাসিক কার্যবিবরণী পেশ করেন। তাতে তিনি দেখান যে, পার্টিতে সর্বমোট ৭৮ জন কম্যুনিস্ট সদস্য সংগৃহীত হয়েছে, এর কয়েক মাস পরে তিনি ঘোষণা করেন যে, এই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আড়াইশতে পেঁাচেছে, সত্যভক্ত প্রকৃতপক্ষে একটি ছদ্ম-নাম। তিনি পূর্বে গান্ধীজীর সঙ্গে সবরমতি আশ্রমে বাস করতেন এবং সত্য বিশ্বাস করতেন বলে তিনি এই নামটি গ্রহণ করেছিলেন।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে কম্যুনিস্ট পার্টির সম্মেলন আহবানের জন্য সত্যভক্ত সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রচারণা চালাতে লাগলেন। একই সময়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা। কম্যুনিস্ট পার্টির সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য সিংগাড়া ভেলু নির্বাচিত হলেন। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হলেন মওলানা হস্‌রত মোহানী। ইনি একজন বিখ্যাত কবি। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ইনিই উত্থাপন করেন এর ফলে কংগ্রেসে ভীষণ আড়োলন সৃষ্টি হয়। এই প্রস্তাব যাতে গৃহীত না হয়, মহাত্মা গান্ধী সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, ফলে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। মওলানা হস্‌রত মোহানী এই সময় বলেছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধী সাম্রাজ্য-

বাদী ও কায়েমী স্বার্থের দালাল। তিনি ভারতের স্বাধীনতার তরণী মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে দেবেন।

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মুজফ্ফর আহমদ স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলমোরা ডিষ্ট্রিক জেল হতে মুক্তি পান। ডাঙ্গে মুক্তি পান ১৯২৭ সালের মে মাসে। মুজফ্ফর আহমদের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। এই সময় তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি তাই বঙ্গদেশে না এসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আলমোরার পাহাড় অঞ্চলে বাস করতে লাগলেন। এই সময় সত্যভক্ত মুজফ্ফর আহমদকে কানপুর সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান জানালেন। আহমদ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং কানপুর হয়ে বঙ্গদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। কম্যুনিষ্ট নেতা এস, বি, ঘাটে ; জি, পি, বারগার ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট কর্মিগণ এবং রায়ের অনুসারীগণ কানপুরে আগমন করেন। তারা জানতে পারেন যে, সত্যভক্ত আদৌ কম্যুনিষ্ট নন, এবং নেতাদের কেউ তাকে চেনেন না। এই ব্যাপার নিয়ে দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং সত্যভক্ত সম্মেলন ত্যাগ করে পলায়ন করেন। অতঃপর মুজফ্ফর আহমদ ও তাঁর সঙ্গীরা ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেন। বারগার ও ঘাটে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং কে, এন, যোগলেকার ও আর, এস, নিম্বকার বোম্বে থেকে, মুজফ্ফর আহমদ কলকাতা থেকে আবদুল মজিদ, লাহোর থেকে, সি, কে, আয়েঙ্গার মাদ্রাজ থেকে কমিটিতে নির্বাচিত হন। মস্কোর কোমিনটার্ণের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার জন্য বোম্বাইতে পার্টির সদর দফতর স্থাপন করা হয়। এই নতুন পার্টির সকলেই এম, এন, রায়ের প্রচেষ্টায় সমাজ-বাদী মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। এদের কয়েকজন তাশখন্দে কম্যু-নিজমে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এম, এন, রায় এবং অন্যান্য উর্ধতন কম্যুনিষ্ট নেতারা ভারতের বাইরে থাকার সুযোগে সত্যভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেন এবং তার কার্যকরী কমিটির সদস্য হন এবং উত্তর প্রদেশ প্রাদেশিক কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। কানপুর সম্মেলন থেকে বিতাড়িত হবার পর তিনি ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকরী সদস্য পদে ইস্তফা দেন এবং প্রাদেশিক পার্টির নাম বদল করে সাম্যবাদী দল রাখেন।

ইতিমধ্যে রায় মস্কো থেকে পত্রযোগে জানালেন যে, সত্যভক্ত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের গুপ্তচর। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যভক্ত এবং তার অনুসারীগণকে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

১৯২৫ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল ওয়ার্কারস এণ্ড পেজান্টস পার্টি (বঙ্গীয় মজুর ও কৃষক দল) গঠন করা হয়। অবশ্য এই দলের উদ্যোক্তাদের কেউই এম, এন, রায়ের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এই নতুন দলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্ত কুমার সরকার, কুতুব-উদ্দীন আহমদ ও শামসউদ্দীন হোসেন। ১৯২৬ সালে ২রা জানুয়ারী কলকাতা ফেরার পরে কমরেড মুজফফর আহমদ এই পার্টিতে যোগদান করেন। এই ধরনের রাজনৈতিকদল গঠনের ফলে রায়ের বহুদিনের আশা পূর্ণ হয়।

কৃষক, শ্রমিক দল গঠিত হবার ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভিত নড়ে ওঠে। এবং গোঁড়া সাম্প্রদায়িক অনুশীলন পার্টি জীর্ণ দালানের মত ভেঙেগ পড়তে থাকে। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গোপেন্দ্র চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী আরো পাঁচজন সহকর্মীকে নিয়ে এই পার্টিতে যোগ দেন। এদের সাম্যবাদে দীক্ষিত করার ব্যাপারে এম, এন রায়ের সহকর্মী নলিনী দাস গুপ্তের অনেকখানি হাত ছিল। এই ফেব্রুয়ারী মাসেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পার্টিতে যোগদান করেন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই পদে বহাল থাকতে পারেননি। কারণ তাকে রাশিয়ায় চলে যেতে হয়। তার স্থলে কলকাতা সিমেন্স ইউনিয়নের আবদুর রাজ্জাক খাঁ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাজ্জাক খাঁ শ্রমিক আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে যুগান্তর দলে ছিলেন। কৃষক-শ্রমিক দলের সেক্রেটারী নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি বিশেষ কাজ করেননি। ফলে, মুজফফর আহমদকে দলের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই পার্টির মুখপত্র হিসেব প্রথমে "লাঙগল" প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরে লাঙগল বন্ধ করে "গণবাণী" বের করা হয়।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের ফলে এম, এন, রায় যেমন সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন, প্রকাশ্যভাবে কার্যকরী সমিতি গঠিত হওয়ায় তিনি

আবার আতঙ্কিতও হয়েছিলেন। কারণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই পার্টিকে বেশীদিন সহ্য করবে না। ফলে, কমিটি সদস্যদের বেশীদিন কারাগারের বাইরে থাকা সম্ভব হবে না। তাই তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে, এই কার্যকরী কমিটি প্রকাশ্যভাবে আইনসংগত কাজ করে যাবে এবং গুপ্তভাবে কাজ করার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পৃথক কার্যকরী কমিটি গঠন করতে হবে।

কম্যুনিস্ট পার্টির সদর দফতর বোম্বাই থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করায় এম. এন. রায় আবার ক্ষুব্ধ হলেন। কারণ দিল্লী হচ্ছে পার্লামেণ্টারী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। কৃষক শ্রমিক পার্টির সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। এদের কর্মতৎপরতার জন্য বোম্বাই ও বঙ্গদেশ উপযুক্ত স্থান। কারণ, যেখানে কৃষক ও শ্রমিক, সেখানেই তাদের কাজ।

এম. এন. রায়ের সঙ্গে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব শুরু হয় আর্থিক সাহায্যের ব্যাপার নিয়ে। রায় পার্টির নতুন নেতাদের চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহপোষণ করতে লাগলেন। কারণ, রায়ের মতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পার্টির সদস্য নির্বাচিত হয়নি। কাজেই অর্থসাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করায় ভারতীয় কমিটির কেউ কেউ সন্দেহ করতে শুরু করে যে, রায় নিজেই পার্টির অর্থ আত্মসাৎ করছেন। এটা জানার পর রায় এক কড়া পত্র লিখে জানান যে, ভারতীয় পার্টির মধ্যে যেভাবে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দানা বেঁধেছে তাতে পার্টির ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে অনুমিত হচ্ছে। তিনি একথাও জানিয়ে দেন যে, তাকে যেন ভারতীয় পার্টির অর্থ সরবরাহের এজেন্ট হিসাবে মনে করা না হয় এবং বাইরে থেকে অর্থ সরবরাহের ফলে অনেক বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হবে। এই অবিশ্বাসের কারণ যেছিল না, তা নয়। বৃটিশ ইনটেলিজেন্ট বিভাগ অনেক সময় রায় প্রেরিত মার্ক, পাউণ্ড ও রুবল আটক করতো, চিঠিপত্র গায়েব করে দিত। এবং ভারতের বাকী সদস্যগণের কারো কারো কাছ থেকে গোপনে তথ্য সরবরাহ করে এই আটককৃত অর্থ তাদের হাতে তুলে দিত।

১৯২৬ সালের মাঝামাঝি থেকে রায় কর্মপন্থার খানিকটা পরিবর্তন সাধন করেন এবং মজদুর ও কিষাণ পার্টির সুষ্ঠু সংগঠনের দিকে অধিকতর মনোসংযোগ করার নীতি গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি

এটাও ঠিক করেন যে, 'পিপলস পার্টি' গঠনের প্রচেষ্টা কৃষক-মজদুর পার্টির মাধ্যমে চালাবেন। তাঁর এই থিওরী প্রথমে তিনি নিজেই পরিবর্তন করেন। তবে পরে তিনি বলতে শুরু করেন যে, মজদুর ও কিষাণ পার্টি এবং পিপলস পার্টি এক নয়। একটি হলো, ছদ্মাবরণে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং অপরটি হলো, বিপ্লবী জাতীয় পার্টি।

এর কিছুকাল পরে রায় ছদ্মবেশে ভারতে আসেন এবং বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কানপুর জেলে বন্দী অবস্থায় তিনি আরেকটি বিপ্লবী দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। কম্যুনিস্ট, মজদুর ও কিষাণ প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর বিপ্লবপন্থীদের সমন্বয়ে মার্কসবাদের ভিত্তিতে তিনি এই নয়া দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি ভারতে প্রথম 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' গঠন করেন। কম্যুনিস্ট পার্টির ন্যায় এই পার্টিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্র-শক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সরাসরি সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক শক্তিকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করা সম্ভব। কিন্তু যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তি যদি জয়লাভ করে তবে বিশ্বের গণতান্ত্রিক চেহারা একেবারে ধুয়ে-মুছে যাবে। সুতরাং ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয় গণতান্ত্রিক জোটের কাম্য হওয়া উচিত।

কমরেড এম, এন, রায়ের এক সময়ের সহকর্মী মিঃ পি, সি, মিত্র। তিনি রায় সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর এই তথ্য থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ ভারতীয় নেতাদের মধ্যে এম, এন, রায় একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের প্রথম ভারতীয় উদগাতা। তিনি মেক্সিকো, রাশিয়া, চীন ও ভারতে বিপ্লবের আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। তিনি লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি, রোজা, লুক্সেমবার্গ, মাও-সেতুং ও চৌ-এন লাই-এর সহকর্মী ছিলেন। অবশ্য রায় তাঁর জীবনের শেষভাগে কম্যুনিজমের পথ ত্যাগ করে, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মানববাদ দর্শন মার্কসবাদের পরিবর্তন দর্শন হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। তবে কোন কোন

এম, এন, রায় সম্পর্কে মিঃ পি, সি মিত্র

রাজনৈতিক সমালোচকদের মতে অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ সমালোচকদের মতে অত্যন্ত বুদ্ধিজীবী এবং অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় জনগণের মন জয় করতে পারেননি। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি হয়ে থাকলেন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। রাশিয়ায় বলশেভিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দুই বছর পরে এক যুবক মেক্সিকো থেকে রাশিয়ায় এলেন। তিনি একমাত্র অ-রুশীয়, যিনি রাশিয়ার বাইরে প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করেন। এই যুবককে কাউন্সিল অব পিপলস কমিশনের প্রেসিডেন্ট সমীপে নিয়ে যাওয়া হল। ক্রেমলিন প্রাসাদের কড়া প্রহরার মধ্য দিয়ে তাঁকে এমন এক ব্যক্তির সামনে হাজির করা হল যাঁর চিবুকে ছোট্ট একটু দাড়ি এবং মাথা ভরা টাক। আর এই যুবকটি সাতাশ বৎসর বয়স্ক এম, এন, রায়। রুশ বিপ্লবের অন্যতম নায়ক মাইকেল বরোদিন রায়কে মেক্সিকো থেকে রাশিয়ায় ডেকে আনেন। দশ বছর পরে বরোদিন ও রায় চীন বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

লেনিন রায়ের সঙ্গে করমর্দন করে বলেছিলেন, আপনি এত ছেলেমানুষ! আমি মনে করেছিলাম পাকা দাড়িওয়ালা প্রাচ্যের এক জ্ঞানবৃদ্ধ নেতার সঙ্গে আমি দেখা করতে যাচ্ছি।

রায় লেনিনের সঙ্গে আলাপের পর তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছিলেন, বিপ্লবের ইতিহাসে লেনিনের ব্যক্তিত্ব আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, তারপর কয়েক বছর পরে আমি তাঁকে এই প্রথম দেখলাম। ধনতন্ত্রী দেশগুলী লেনিনের সম্পর্কে যে আতঙ্কের ছায়াপাত করেছিল লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর মধ্যে সেরকম কিছু লক্ষ্য করলাম না। তাঁর দেহ এবং তাঁর আলাপ-আলোচনার ভেতর থেকে একনায়কত্বসুলভ মেজাজেরও কোন পরিচয় পেলাম না। আলাপে তিনি স্পষ্টবাদী এবং ব্যবহারে বন্ধুসুলভ।

লেনিনের থিসিস সম্পর্কে এম, এন, রায়ের যে মতদ্বৈধতা ছিল, সে সম্পর্কে রায় ও লেনিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করেন। আমি এ সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে লেনিনের থিসিসের বিরোধিতা করতে চাইনি, সে জন্যই রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমাদের আলোচনা হয়। কিন্তু অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলাবলি করতে থাকেন যে, এই ভারতীয়

স্বয়ংসিদ্ধ নেতাটা লেনিনের বিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্ন করার ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে। হয়ত সে তর্কাতর্কিও করেছে! কিন্তু লেনিনের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহনশীলতায় পূর্ণ। আলোচনার প্রথম দিকে তিনি একটু রহস্যসূচক মন্তব্য করেছিলেন। তাতে মনে হয়েছিল তিনি আমার মতামতের বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কিন্তু আলোচনা যতই এগিয়ে চলতে লাগলো, ততই তিনি আমার যুক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করতে লাগলেন। এটা আমার জীবনের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এক বিরাট পুরুষ তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন আমাকে তাঁর সমপর্যায়ের মনে করে। তিনি অনায়াসেই একজন যুবকের সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক হতে পারতেন এবং তাহলে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমার কথা বলার কোন সুযোগও কখনও হতো না।

রায় বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সৃষ্টি। তাঁর কৈশোরকালেই তিনি যতীন মুখার্জীর সংস্পর্শে এবং ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি যুগান্তর দলের হয়ে কাজ করেন। ১৯১০ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দু'বার গ্রেফতার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এম. এন. রায়কে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো। ঠিক হলো বাটাভিয়া থেকে অস্ত্র আনতে হবে এবং জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জাভা যাত্রা করেন। সেখানে তিনি অস্ত্র ও অর্থ দুই-ই পেয়েছিলেন। জার্মানরা এস, এস, মেভারিক জাহাজে অস্ত্র বোঝাই করে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পেঁাছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ফিলিপাইন, জাপান, কোরিয়া ও চীন ঘুরে রায় এক বছর পর সানফ্রান্সিসকোয় উপস্থিত হন। চীন বিপ্লবের নেতা সানিয়াৎ সেনের সঙ্গে তাঁর টোকিওতে দেখা হয়।

পিকিংয়ে রায় জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারেননি। তবে তিনি রায়ের জন্য একখানি ফরাসী পাসপোর্ট করে দিয়েছিলেন। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে বার্লিনে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নিউইয়র্কে লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। লাজপত রায় তখন কার্ল মার্কস নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলেন। রায়ও নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে কার্ল

মার্কসের রচনাবলী পুনরায় পাঠ করতে শুরু করেন। তিনি মার্কস-বাদের নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন। এখানে তিনি মার্কসের সমাজতন্ত্রের থিওরী গ্রহণ করে বস্তুবাদ বর্জন করলেন।

রায়ের বেশীদিন নিউইয়র্ক থাকা হল না। তিনি লাজপত রায়ের একটি সভায় গ্রেফতার হন। আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত করার পর তিনি জামিনও পেলেন। এই জামিন অবস্থায় ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রায় মেক্সিকোয় পালিয়ে যান। সে সময় মেক্সিকোর জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। রায় সেখানে গিয়ে সমাজতন্ত্রী দল গঠন করেন। পরে এই দলের নাম দেয়া হয়, মেক্সিকো কম্যুনিষ্ট পার্টি। রায় এই পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। দুই বছরকাল মেক্সিকো শহরে কাজ করার পর রায় বার্লিনে যান এবং ভারতীয় বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বার্লিনে তিনি বীরেন চট্টোপাধ্যায়, চম্পকরমন পিল্লাই, ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) ও অবনী মুখার্জীর সঙ্গে মিলিত হন। বার্লিন থেকে রায় ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্দেশে এক ইশতেহার প্রকাশ করে জানান যে, সামাজিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত হবে জনসাধারকে সংগঠিত করে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া। এবং এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হলে বিদেশী শাসনকে উৎখাত করতে হবে। রায়ের এই ইশতেহার সম্পর্কে অবশ্য তাঁর জীবন-স্মৃতিতে তিনি কিছুই লেখেননি। এ সম্পর্কে কমরেড জি. অধিকারী তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "ডকুমেন্টস অব হিষ্ট্রি অব কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯১৭-১৯২২" গ্রন্থে লিখেছেন যে, "রায় তাঁর জীবন-স্মৃতিতে কোথাও উল্লেখ করেননি যে, তাঁর তিন থেকে চার মাস বার্লিনে অবস্থানকালে ভারতীয় বিপ্লবী-দের উদ্দেশে কোনো ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন।" কিন্তু জাতীয় গ্রন্থ-শালায় সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের সাপ্তাহিক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ইন্ডিয়ান কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো নামক এক ইশতেহার ১৯২০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখার্জী ও শান্তি দেবী। এই ইশতেহারটি "গ্লাসগো সোশ্যালিষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বার্লিনে থাকা কালে রায় কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রধান

সেক্রেটারী এনজেলিকা বেলা বানাভার নিকট থেকে মস্কোয় চলে আসার নির্দেশ পান। রায় মস্কোয় গিয়ে প্রায় আট বছর অবস্থান করেন এবং কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি মণ্ডলীর একজন সদস্য হিসেবেও তিনি কিছু কাল কাজ করেন। ১৯২৭ সালে তাঁকে চীনে কোমিনটার্ণের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

১৯২৮ সালের ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেস পর্যন্ত কোমিনটার্ণের সঙ্গে রায়ের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন নি। ১৯২৯ সাল থেকে রায়ের সঙ্গে কোমিনটার্ণের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তিনি কোমিনটার্ণের বিরোধী দলের পত্রিকায় তাঁর মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। এর ফলে, কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক (রেনিগেইড) বলে বহিষ্কৃত করা হয়।

মানবেন্দ্র রায়কে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বলে বিশ্বের সকল দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু খোদ ভারতে তাঁর এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি লাভ ঘটেনি। বহু ভাষাবিদ রায় ছয়টি ইউরোপীয় ভাষায় প্রায় শতাধিক পুস্তক লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থ এবং ইশতেহারগুলি সোভিয়েট ইউনিয়ন, জার্মানী এবং বৃটেনের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। রায়ের প্রথম পুস্তক "ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন" ১৯২২ সালে লেখা হয়। এই গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থখানি জার্মান ও রাশিয়ান ভাষায় অনুদিত হয়। জার্মান সংস্করণের এক লক্ষ কপি এক বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। ১৯৩০ সালে রায় ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে ভারতে ফিরে আসেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯২৪ সালের কানপুর বলশেভিক মামলায় তাঁর বিচার হয় এবং তাঁকে ছয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। রায়ের জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেন এবং নিউ হিউম্যানিজম বা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম নামে এক রাজনৈতিক দর্শন প্রচার করতে থাকেন। তাঁর ধারণা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট নিরসনের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে স্বাধীনতার দর্শন প্রচার করতে হবে। নচেৎ স্বাধীনতা সব সময় বিপদ বাধার সম্মুখীন হবে। চিরকালই রায় ছিলেন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান

ও পাণ্ডিত্য তাঁকে একগুঁয়ে করে তুলেছিল। রায়ের ব্যক্তিগত বন্ধুদের মধ্যে ফিলিপ স্প্রাট, জে টি মারফি, কার্ল র‍্যাডেক ও বরোদিন তাঁকে অনমনীয় ব্যক্তিত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। আর এই জন্যই তিনি জনগণকে তাঁর সাথে নিতে পারেননি। বিশেষ করে রায় নেহরু, গান্ধী ও লেনিনকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। গান্ধী এবং নেহরু উভয়কে তিনি ফ্যাসিস্ট বলে আক্রমণ করেছিলেন। ফলে, তিনি ভারতীয় জনগণের নিকট জনপ্রিয় হতে পারেননি।

কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বহিষ্কৃত হবার পর ভারতীয় কম্যুনিস্টরা তাঁকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত করেছিল। এর কারণ ভারতীয় কম্যুনিস্টরা অন্ধভাবে রুশ কম্যুনিস্টদের নীতি অনুসরণ করতো। ১৯৫৪ সালের ২৫ শে জানুয়ারী তারিখে ৬৫ বছর বয়সে দেরাদুণে রায়ের জীবন অবসান হয়। এম, এন রায়ের স্ত্রী মিসেস এলেন রায় ১৯৬০ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর তারিখে দেরাদুনে তাঁর গৃহে আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

বিদেশে ভারতীয় কম্যুনিস্ট আন্দোলন এবং স্বাধীনতা প্রচেষ্টা সম্পর্কে কমরেড মুজফফর আহমদের সঙ্গে আমার যে আলাপ হয় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাকোর বাড়ীতে, তার কিছু কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯২১-২৪ সাল পর্যন্ত পেশোয়ারে পর পর চারটী কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়ে ছিল। ১৯২৭ সালে হয়েছিল আরো একটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা। সবকটি মোকদ্দমাই ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের) ১২১-এ ধারা অনুসারে দায়ের হয়েছিল। ভারতে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সূত্রপাত পেশোয়ারেই হয়েছিল।

এই মোকদ্দমাগুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলার আগে সংক্ষেপে সেগুলির পিছনকার কিছু বিবরণ দেয়া এখানে দরকার। ভারতবর্ষে গত শতাব্দীতে কিংবা এই শতাব্দীর শুরুর দিকে যারা রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তারা ধর্মীয় সাধনার ভিতর দিয়ে এগুবার চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই বিপ্লবের পথে যে ধর্মাবলম্বীরাই এগিয়েছেন তারা আপন আপন ধর্মাবলম্বীদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

মুসলিম ওয়াহাবীরা বিদ্রোহ করেছিলেন শিখ ও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। তারা মুসলিম রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাদের যুদ্ধকে তারা জেহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ বলেছেন। পাঞ্জাবের নামোহারী শিখেরা বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বলেছেন: "রাজ করেগা খালসা ঔর না রাহেগা কোই।" বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় রচিত মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ "আনন্দমঠ"ই বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়েছে।

বৃটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক আয়োজনও আমাদের দেশে ধর্মীয় প্রেরণাকে বাদ দিয়ে হয়নি। ইসলাম ধর্মবলম্বীদের বাস আবার শুধু ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না।

তাই তাদের ভিতরে একটা আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। এর অবশ্য কোন শ্রেণীভিত্তি ছিল না, ছিল ধর্মীয় ভিত্তি।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর-এর বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ১৫ জন বিপ্লবী মুসলিম ছাত্র ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে প্রথমে স্বাধীন জাতীর এলাকায় চলে যান। সেখান থেকে যান কাবুলে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ছিল। আমাদের দেশের সীমান্তগুলি, বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ছিল কঠোরভাবে সংরক্ষিত। তা সত্বেও তারা সীমান্ত পার হতে পেরেছিলেন। তারাই শুধু যে সীমান্ত পার হয়েছিল তা নয়, মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীও সীমান্ত পার হয়েছিলেন। তিনি এই ছাত্রদের আগে সীমান্ত পার হয়েছিলেন না পরে তা জানা যায় নাই। তবে একটি কথা বলে রাখি যে; লাহোরে দেশত্যাগ করার বৈপ্লবিক প্রেরণা যুগিয়েছিলেন মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সাহেব। এই কাজটি হয়তো তিনি সোজাসুজি করেছিলেন। কিংবা করে থাকবেন তার প্রিয় ছাত্র খাজা আবদুল হাইয়ের মারফতে। খাজা সাহেব একজন শিল্পী ছিলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে তিনি সাংবাদিকতা ও অধ্যাপনার কাজ করতেন।

উল্লিখিত ১৫ জন ছাত্র পরে 'পলাতক ছাত্র' বা 'মুজাহিদ ছাত্র' নামে অভিহিত হয়েছেন। 'জিহাদ' অর্থ ধর্মযুদ্ধ। যারা ধর্মযুদ্ধ করেন তাদের বলা হয় মুজাহিদ। পলাতক ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যদি সীমান্তে সম্ভব না হয় তবে তুর্কীর পক্ষে যোগ

দিয়ে যুদ্ধ করা। তুর্কীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো করছিলেন তাছাড়া, তুর্কীর সুলতান ছিলেন মুসলিম জগতের খলিফা। মুজাহিদরা কাবুলে পৌঁছানো মাত্রই মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহসহ এই ছাত্ররা বন্দী হলেন, শিকল পরানো বন্দী ছাত্ররা হলেন নজর বন্দী।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী ও তুর্কী আফগানিস্তানে একটি মিশন পাঠিয়েছিলেন। ভারত সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করা ছিল এই মিশনের উদ্দেশ্য।

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও মৌলবী বরকতুল্লাহ এই মিশনের সভ্য ছিলেন। ১৯২৫ সালের ২ রা অক্টোবর তারিখে তুর্কী-জার্মান মিশন কাবুলে পৌঁচেছিলেন। মহেন্দ্র প্রতাপের আত্মকথা হতে জানা যায় যে আমীর হাবিবুল্লাহ খানের সঙ্গে যখন এই মিশনের মুলাকাত হয়েছিল তখন মহেন্দ্র প্রতাপ মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও লাহোরের 'পলাতক' ছাত্রদের নজরবন্দী হয়ে থাকার কথা আমীরকে বলেন। দু'জন শিখকে শিকল পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা ভারতে কোন বোমার মামলার সংস্রবে অভিযুক্ত হয়ে আফগানিস্তানে পালিয়ে এসে-ছিলেন। তাদের কথাও মহেন্দ্র প্রতাপ আমীরের গোচরে আনেন। আমীর সঙ্গে সঙ্গেই মৌলবী ওবায়দুল্লাহ ও ছাত্রদের মুক্তি দিয়ে রাজ অতিথি করার হুকুম দেন। শিখ বন্দী দু'জনকেও জেল হতে ছেড়ে দেয়া হয়।

লাহোরের বিভিন্ন কলেজ হতে ১৯১৫ সালের ৫ ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে ১৫ জন ছাত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদের নাম:

(১) আবদুল বারী (২) আবদুল কাদির—এম. এ, অধ্যয়নরত (৩) আবদুল মজিদ খান (৪) আল্লাহ্-নওয়াজ খান (৫) আবদুল্লাহ (৬) আবদুর রশীদ (৭) গুলাম হুসায়ন (৮) জাফর হাসান এবক—বি, এ, ক্লাসের ছাত্র (৯) আবদুল খালেক—বি. এ, ক্লাসের ছাত্র, চীফ কলেজ (১০) মুহম্মদ হাসান—বি, এ ক্লাসের ছাত্র, ইসলামীয়া (১১) খুশী মুহম্মদ ওর্ফে মুহম্মদ আলী (১২) আবদুল হামীদ (১৩) রহমত আলী (১৪) সুজা-উল্লা, মেডিক্যাল কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র (১৫) আবদুল্লাহ নওয়াজ খান—নীচের ক্লাসের ছাত্র, শাহনওয়াজ খানের ভাই। এটা জানা

গেছে যে বিদেশে গিয়ে এই ছাত্ররা ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) করেননি, তাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামেই লিপ্ত হয়েছিলেন।

১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কাবুলে ভারতের একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ হন তার সভাপতি, আর মৌলবী বরকতুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী। মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী তার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে বরিত হয়েছিলেন। লাহোরের পলাতক ছাত্ররাও এই অস্থায়ী গবর্নমেন্টে যোগ দিয়ে নানা পদ গ্রহণ করেছিলেন।

লাহোরের পলাতক ছাত্রদের মধ্য হতে আল্লাহ নওয়াজ বোধহয় আফগান নাগরিক হয়েছিলেন। তাকে বার্লিনে আফগানিস্তানের মিনিস্টার নিযুক্ত করা হয়েছিল। মহেন্দ্র প্রতাপ তাঁর পুস্তকে লিখেছেন "Mr. Allah Nawaz is Afganisthans Minister in Berlin" তাদের মধ্যে হতে ক'জন কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তা আমি সঠিক বলতে পারবো না। লাহোর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আবদুল হামীদ "শ্রমজীবী প্রাচ্যের কম্যুনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে" ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি অন্যদের সাথে দেশেও ফিরে ছিলেন, কিন্তু পামীর পর্যন্ত এসে আর এগুতে পারেননি। পুরোনো পুলিশ রিপোর্ট হতে জানা যায় যে ১৯২৬ সালে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। পেশোয়ারে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও হয়েছিল। তাতে তিনি যে ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা পান উচ্চ আদালতে সেই সাজা বাতিল হয়ে যায়।

পলাতক ছাত্রদের মধ্যে খুশী মুহম্মদ ও রহমত আলী বিদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে অনেক নাম করেছিলেন।

॥ ছয় ॥

ভারতে তখনও কংগ্রেসের বৃটিশ তোষণ নীতি চলছে, স্বাধীনতার কথা তারা চিন্তাও করেনি, সেই সময়, ১৯১০ সালে অক্সফোর্ড ফেরত পাঞ্জাবী যুবক হরদয়াল বিপ্লব আন্দোলন সংগঠনে মনোনিবেশ করেন।

গদর আন্দোলন

তিনি ১৯১১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে বৃটিশ বিরোধীজোট গঠন করতে শুরু করেন। যুক্তরাষ্ট্রে হরদয়ালের পরিচালনায় 'গদর' পার্টি গঠিত হয় এবং গদর নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সময় গদর পার্টিতে অধ্যাপক (ডাঃ) বরকতউল্লাহ, সোহান সিং এবং আরো অনেক মুসলমান যুবক যোগদান করেন। মালয়ের একজন ভারতীয় কন্ট্রাক্টর এই দলে যোগদান করায় আর্থিক দিক থেকে দল অধিক শক্তিশালী হয়। এই দল ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার বজবজে পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ১৯১৫ সালে, বিপ্লবীরা বিদেশ থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে, কিন্তু এ সংবাদ ফাঁস হওয়ায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখনও বিদেশে গদর পার্টির তৎপরতা অব্যহত ছিল। বার্লিনে ডাঃ তারকনাথ দাস, অধ্যাপক বরকত উল্লাহ, হরদয়াল, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখের উদ্যোগে একটা সমিতি গঠিত হয়। এ সময় ডাঃ বরকতউল্লাহ বার্লিন থেকে কাবুল চলে আসেন। এখানে তাঁর সংগে মিলিত হন মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, ফতেহ মোহাম্মদ, আব্দুল্লাহ, মিয়া মাহমুদ আনসারী, মোহাম্মদ আলী। হাতরাসের রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ কাবুলে এসে এই দলের সঙ্গে যোগ দেন। এই সময় কাবুলে ডাঃ বরকতউল্লাহর উদ্যোগে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করা হয়। এই সরকারের কর্মকর্তারা ছিলেন :—

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ—প্রেসিডেন্ট ; অধ্যাপক বরকতউল্লাহ—প্রধান-মন্ত্রী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

গদর পার্টির অন্যতম সদস্য মওলানা মাহমুদুল হাসান হজ্জ পালন করতে মক্কায় গিয়ে হেজাজের শাসনকর্তা গালিব পাশার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় জার্মানী ও তুরস্ক বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র কাবুলের মধ্য দিয়ে ভারতে পাঠাতে থাকেন। আফগানিস্তান সরকার মনে করেছিলেন যে ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়িত হলে সেখানে কাবুলের সালতানাত কায়েম হবে। কিন্তু সে স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সিরাজগঞ্জের গোলাম আম্বিয়া খান লোহানী প্রথমে গদর পার্টিতে যোগ দেন। পরে তিনি এম, এন, রায়ের সঙ্গে মস্কোয় কম্যুনিস্ট আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন। এরপর তিনি স্থায়ীভাবে রুশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। লোহানী মরহুম চিত্রাভিনেতা ফতেহ লোহানীর চাচা।

মক্কার শেরীফ হোসেন ও কাবুলের আমীর হাবিবুল্লাহ খান ভারতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এলেন, কিন্তু শেরীফ হোসেন বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের কাছে এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন। ইতিমধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠনের জন্য মাহমুদ আনসারী আব্দুল্লাহ, ফতেহ মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ যেসব বিপ্লবী ভারতীয় নেতা কাবুল থেকে ভারতের পথে রওনা হয়েছিলেন, সীমান্তে তারা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে যান। বিচারে তাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি, সেজন্য তাঁরা খালাস পান। কিন্তু তাদের ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে কারাগারে পাঠানো হয়। আমীর হাবিবুল্লাহ ইংরেজদের চাপে পড়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের কাবুল ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। সুতরাং বিপ্লবীরা অস্থায়ী ভারত সরকার ভেঙ্গে দিয়ে যে যেখানে পারেন চলে যান।

অনেক আগে থেকেই ব্যাঙকক ও বাটাভিয়ায় বিপ্লবীদের দুটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। ব্যাঙককের কাজ ছিল চীন, জাপান ও আমেরিকার গদর পার্টির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা, আর বাটাভিয়া কেন্দ্রের দায়িত্ব ছিল বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। বাটাভিয়াস্থ জার্মান দূতেরা ভারতীয় বিপ্লবীদের যথেষ্ট সাহায্য দানে স্বীকৃত হয়েছিলেন, আর এজন্যই বাঙ্গালী বিপ্লবী এম, এন, রায় বাটাভিয়ায় জার্মানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য চলে যান। আলোচ-

নার পর জার্মানদের পক্ষ থেকে হেলফারিক নামক একজন অফিসার রায়কে জানান যে, মেভারিক জাহাজযোগে ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য ৩০,০০০ রাইফেল, প্রয়োজনীয় গোলা-বারুদ এবং কয়েক লক্ষ টাকা ক্যালিফো-র্নিয়া বন্দর থেকে পাঠানো হয়েছে। রায় জাহাজখানিকে নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপের কাছে খালাস করার পরামর্শ দিয়ে আসেন। বাংলায় ফিরে এসে রায় যতীন মুখার্জী, ভোলানাথ চ্যাটার্জী ও অতুল ঘোষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই মাল সন্দ্বীপের কাছে, কলকাতার কাছে, এবং বালেশ্বরের কাছে খালাশের নির্দেশ দিয়ে বাটাভিয়ায় সংবাদ পাঠিয়ে দেন।

কথা ছিল, মেভারিক জাহাজ এ্যানিলার্সেন জাহাজ থেকে মাল নিয়ে সন্দ্বীপ আসবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ্যানিলার্সেন জাহাজটাকে আটক করে এবং অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে নেয়। এর পরে আরো ৩ খানি জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মেভারিক জাহাজ বালেশ্বরে মাল খালাশ করবে এই আশায় ৪ জন সঙ্গি নিয়ে যতীন মুখার্জী বালেশ্বরে যান, ইতিমধ্যে মিঃ টেগার্টের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বুড়ি বালাম নদীর তীরে তাদের ঘেরাও করে ফেলে। উভয় পক্ষে গুলি-বিনিময় হয়। চিত্তপ্রিয় ঘটনাস্থলেই নিহিত হন এবং যতীন মুখার্জী বালেশ্বরের হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। অত্যন্ত দু:সাহসী বলে যতীন, বাঘা যতীন নামে খ্যাত ছিলেন। যতীনের মৃত্যুর পর জেলা ম্যাজি-স্ট্রেট, সৈন্য বাহিনী এবং পুলিশের লোকজনেরা তাঁকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে ছিল।

এম, এন, রায় বাটাভিয়া থেকে ভারতে ফিরে আসার কোন উপায় না দেখে মেভারিক জাহাজযোগে আমেরিকায় চলে যান। রায়ের সহকর্মী অবনি মুখোপাধ্যায় জাপানে ছিলেন কিন্তু তিনি ভারতে ফিরে আসার পথে সিঙ্গাপুরে গ্রেফতার হন।

ভারতের নিকট প্রতিবেশী দেশ বর্মায় গদর পার্টির একটা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। খেম চাঁদ দামজি নামক একজন ব্যবসায়ী রেঙ্গুনে থাকাকালে এই পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। এবং পার্টির লক্ষ্য ও আদর্শ প্রচারের কাজে সাহায্য করে বর্মার বাইরে থেকে প্রকাশিত একখানি

পত্রিকা "জাহান-ই-ইসলাম" ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই পত্রিকা খানি প্রথমে তুরস্কের কনষ্ট্যান্টিনপল শহর থেকে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় উর্দু, আরবী ও হিন্দী ভাষার প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন পাঞ্জাবের অন্যতম বিপ্লবী—আবু সাইদ। ইনি বহু দিন বর্মার রাজধানী রেঙ্গুনে শিক্ষকতা ও কেরানীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তুর্ক-ইতালী যুদ্ধের সময় ইনি মিশরে গমন করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর "জাহান-ই-ইসলাম" পত্রিকায় হরদয়ালের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এবং মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা আনোয়ার পাশা ও মনসুর আরিফ লিখিত দুটী বৃটিশ বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় "জাহান-ই-ইসলাম" পত্রিকায় আনোয়ার পাশার এক বিবৃতি ছাপা হয়। এটা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছিল। বিবৃতিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

'ভারতবর্ষে গদর (বিদ্রোহ) ঘোষনার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। ইংরেজদের অস্ত্রাগার লুন্ঠন কর। তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নাও। আর সেই অস্ত্রের দ্বারা তাদের নিধন কর। ভারতের জনসংখ্যা ৩২ কোটি। আর ইংরেজের সংখ্যা মাত্র ২ লাখ। তাদের সকলকে হত্যা কর। তাদের কোন সৈন্যবলও নাই। আমরা শীঘ্রই সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেব। দেশের মুক্তির জন্য যে প্রাণ দেবে সে অমর হয়ে থাকবে। ভারতের হিন্দু-মুসলমান, তোমরা উভয়েই একই দলের সৈনিক। আর নিচ ইংরেজরা তোমাদের শত্রু। তোমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে গাজী বা বীর হও। তোমাদের সকল ভাইকে ঐক্যবদ্ধ কর। ইংরেজ শয়তানদের হত্যা করে দেশের মুক্তি সাধন কর।' *

জাহান-ই-ইসলাম পত্রিকা ভারতবর্ষ ও বর্মায় বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল। তবুও অন্যান্য পত্রিকার বাণ্ডিলের মধ্যে এই পত্রিকা রেঙ্গুনে আনা হত।

বিপ্লবী আবু সাঈদের পারামর্শে তুরস্কের ইয়ং তুর্কী পার্টির বিশিষ্ট নেতা তৌফিকবে ১৯১৩ খৃস্টাব্দে রেঙ্গুনে আসেন। তিনি রেঙ্গুনের মুসলমান ব্যবসায়ী সমাজের নেতা আহমদ মোল্লা দাউদকে রেঙ্গুনে

* Sedition Committe Report, P– 169

তুরস্কের কনসার্ল নিযুক্ত করেন। দাউদ সাহেব বর্মায় বিপ্লব প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন এই ভেবেই তাঁকে কনসার্ল নিযুক্ত করা হয়।

মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই সময় দু'জন ভারতীয় মুসলমান তুরস্ক থেকে রেঙ্গুনে চলে আসেন। এরা হলেন হাকিম সাহীম আলী ও আলী আহম্মদ সাদেকি। এরা ভারত থেকে তুরস্কে গিয়েছিলেন "Red Cresent" সোসাইটির সদস্য হিসেবে। এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডঃ আনসারী এবং বাংলা থেকে গিয়েছিলেন এদের সঙ্গী হিসেবে মওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী শুধু একটি নাম নয়, তিনি ছিলেন মুসলিম জীবনে চেতনার কবি, একটি ইতিহাস, একটি আদর্শ।

যদি বলা হয় তিনি ছিলেন একটি অগ্নিগিরি, তাহলে হয়ত অন্যায় বলা হবে না। যদি বলা হয় তিনি হিমালয়-গিরিশৃঙ্গ, তাহলে তুলনাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর অন্তরে ছিল আগুন, আর অন্যায় অত্যাচার ও অসত্যের সামনে তিনি কোনো দিন মাথা নত করেন নি। হিমালয়ের মতই তিনি মাথা উঁচু করে থেকেছেন চিরজীবন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতের মুসলমান যখন সর্বহারা, তাদের অন্তরে যখন সদ্য পরাধীনতার বিষ-জ্বালা, সেই ক্রান্তি-লগ্নের পটভূমিতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্ম। পিতা শাহ সৈয়দ আবদুল করিম ও মাতা নূরজাহান খানমের ঘর আলো করে এলেন অন্ধকার যুগের আলোক-বর্তিকা ইসমাইল হোসেন।

সিরাজীর বয়েস তখন মাত্র দশ কি এগার বছর, তখন থেকেই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। জগৎকে জানতে হবে, বিশ্বভুবন ঘুরে দেখতে হবে। তাই স্কুলের দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্র দেখতে দেখতে তিনি তন্ময় হয়ে যান। শুধু দেশ-বিদেশের নাম দেখেন না, খোঁজেন সে সব দেশে যাওয়ার পথ।

স্কুল জীবনেই সিরাজী সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন, সঙ্গে সঙ্গে

সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করে সুনাম অর্জন করেন। এই সময় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়ে তাঁকে খ্যাতির পথপ্রান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের গ্রন্থ পড়ে শেষ করেন। তবে তাঁর উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছিল মাইকেল ও জামালুদ্দিন আফগানীর। জামালুদ্দিন আফগানী সে যুগের অগ্নিপুরুষ। এই বিপ্লবী মহানায়কের কর্মজীবন সিরাজীকে অনুপ্রাণিত করলো। তার ফলে অর্ধ-চেতন মুসলমান জাতির প্রাণে জাগরণের পরশ লাগাতে সিরাজীর লেখনী সুতীক্ষ্ণ হল। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হল তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ 'অনল প্রবাহে'। এই গ্রন্থে মুসলমান জাতিকে ঘুম ভাঙানো গান শুনালেন সিরাজী ঃ—

" আর ঘুমাইয়ো না নয়ন মেলিয়া
উঠরে মোসলেম উঠরে জাগিয়া
আলস্য জড়তা পায়েতে ঠেলিয়া
পূত বিভু নাম স্মরণ করি
যুগল নয়ন করি উন্মীলন
কর চারিদিকে কর বিলোকন
অবসর পেয়ে দেখ শত্রুগণ
করিছে কি দৃঢ় কঠোর সাধন
দেখরে চাহিয়া অতীত স্মরি।"

সিরাজীর এই ঘুম-ভাঙানী গান আত্মবিস্মৃত মুসলমানদের মনে আবার আত্ম-প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করলো। এরপর জাতি পেলো 'উচ্ছ্বাস', 'উদ্বোধন', 'নব-উদ্দীপনা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। সিরাজীর মধ্যে মুসলমান জাতি যেন পেয়ে গেল নব-জাগৃতির যুগ-নায়ক। তিনি চলার গান লিখলেন ঃ

'আধার দেখে ভয় পেয়ে ভাই
পথ কখনো ছাড়বো না
চলতে যদি করেছি শুরু
চলবই তবে, থামবো না।'

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার যে আন্দোলন শুরু হয়, সিরাজী তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বৃটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' বাজেয়াফত করে এবং সিরাজীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। 'অনল প্রবাহ' সম্ভবতঃ প্রথম কাব্যগ্রন্থ, যা সরকারে বাজেয়াফত হয় এবং সিরাজী প্রথম কবি যিনি কবিতা লেখার জন্য প্রথম দণ্ডিত হন। সে হিসেবে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী একজন পয়লা কাতারের দেশভক্ত বীর।

দু'বছর কারাবাসের পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে সিরাজী মুক্তি পেলেন। সেই সময় শুরু হয়েছে বলকান যুদ্ধ। তুরস্কে মেডিক্যাল মিশন পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন মওলানা মোহাম্মদ আলী। ডঃ এম, এ, আনসারীর নেতৃত্বে দল গঠিত হল। এই দলে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী অন্তর্ভুক্ত হলেন। এতদিনে সিরাজীর বিদেশ ভ্রমণের সাধ পূর্ণ হলো। তুরস্কে মেডিক্যাল মিশনের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তিনি অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। এজন্য তুরস্ক সরকার তাঁকে গাজী উপাধী দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সিরাজীর এই সম্মান বিদেশে বাঙ্গালী মুসলমানের সম্মান বৃদ্ধি করেছিল।

তুরস্ক থেকে ফিরে কবি সিরাজী চারণের বেশে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে লাগলেন। সে বক্তৃতা জাগরণের। সে বক্তৃতা স্বাধীনতা অর্জনের উদাত্ত আহবান। তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ তাঁর 'বাতায়ন' গ্রন্থে লিখেছেন : এমন ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা এর আগে আর কোথাও শুনিনি। তখন আমাদের চোখে আজাদীর স্বপ্নের আবেগ, আমাদের তরুণ চিত্ত তখন দাউদাউ শিখায় জ্বলে উঠতে উন্মুখ। সেই পরিবেশে তাঁর সেই দিনের বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে আগুন লাগিয়ে দিল। তাঁর কণ্ঠ উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে ওঠে, আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনি, তারপর উচ্চতম গুরুগর্জনে আসে তাঁর চরম আদেশ—'ওঠ, ওঠ, ওঠ'। সে আহবানে শরীর ঘন ঘন শিউরে ওঠে, মনে হয় তখনই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াই। এত দীর্ঘ, এত সুন্দর, এত উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা, অথচ কেউ একটিবার হাততালি দিল না, তারা সমস্ত ভুলে কেবল মুগ্ধ মনে রোমাঞ্চিত দেহে শুনল আর শুনল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজদ্রোহের অভিযোগে সিরাজী তিনবার কারাবরণ করেন। সরকার বিরাশিবার ১৪৪ ধারা জারী করে তাঁর সভা বন্ধ করে দিয়েছিল। শেষবার ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর তিন মাস জেল হয়। জেলে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৯৩১ সালের ১৭ই জুলাই সিরাজীর কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর তিরোধানের এক বছর পরে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম সিরাজগঞ্জে গিয়ে বলেছিলেন, "আজ সিরাজ-গঞ্জে আসিয়া সর্বপ্রধান অভাব অনুভব করিতেছি, আমাদের মহানুভব নেতা বাংলার তরুণ মুসলিমের সর্বপ্রথম অগ্রদূত তারুণ্যের নিশান বরদার মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের। সিরাজগঞ্জে সিরাজীর সাথে বাংলার সিরাজ, বাংলার প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। যাঁহার অনলপ্রবাহসম বাণীর গৈরিক নিঃস্রাব জ্বালাময়ী ধারা মেঘ-নিরন্ধ্র গগনে অপরিমাণ জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছিল। নিদ্রাতুরা বঙ্গদেশ উন্মাদ আবেগ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল,—অনল প্রবাহের সেই অমর কবির কণ্ঠস্বর বাণীকুঞ্জে আর শুনিতে পাইব না।"

ইসমাইল হোসেন সিরাজী একদিকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, অপরদিকে সংগ্রাম করেছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা তিনি ভোগ করতে পারেন নি, কিন্তু স্বাধীনতার যে অমৃত বৃক্ষ তিনি রোপন করেছিলেন তার ফল আমরা ভোগ করছি। তাই তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণ যুগ-যুগান্ত ধরে আজাদীপ্রিয় মানুষদের অনুপ্রাণিত করবে। তিনি রয়ে গেলেন চিরস্মরণীয় হয়ে।

বর্মায় ইংরেজদের অত্যাচারের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর গদর পত্রিকা ও জাহান-ই-ইসলাম পত্রিকার প্রচারের ফলে তা বৈপ্লবীকরূপ ধারণ করল। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বেলুচিস্তানের মুসলমানদের নিয়ে গঠিত ১৩০ নম্বর রেজিমেন্টর ইংরেজ সেনাপতিকে সৈন্যরা হত্যা করে। ফলে শাস্তি স্বরূপ এই রেজিমেন্টকে বোম্বাই থেকে রেঙ্গুনে পাঠানো হয়। রেঙ্গুনে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গেই

রেঙ্গুনের বিক্ষুব্ধ মুসলমানগণ বিদ্রোহে বেলুচ রেজিমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করে। রেঙ্গুনের মুসলমান নেতাগণ ও সৈন্য দলের মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে বিদ্রোহের সব ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বিদ্রোহের কথা ফাঁস হয়ে যায় এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীর শেষ রাত্রে একদল ইংরেজ সৈন্য বেলুচ রেজিমেন্টের সেনানিবাস ঘেরাও করল। এবং সৈন্যদের নিরস্ত্র করে ফেলল। পরে সামরিক আদালতের বিচারে বেলুচ রেজিমেন্টের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডিত করা হয়।

এই সময়ে কানপুরের একজন সরকারী কর্মচারী সরকারের কয়েক হাজার টাকা নিয়ে ভারত থেকে পালিয়ে ম্যানিলায় উপস্থিত হন। এরপর তিনি সিঙ্গাপুরে গিয়ে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বৈপ্লবীক প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। এই বিপ্লবীর নাম মুজতাবা হোসেন। সিঙ্গাপুরে অবস্থিত মালয় এস্টেটস্ গার্ডস ও পঞ্চম পদাতিক রেজিমেন্ট এই দুইটি সৈন্যদল ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত হয়। বিদ্রোহের সময় ঠিক ১৯১৫ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি। এর মধ্যে বিদ্রোহের নেতাদের একখানা গোপন পত্র ইংরেজদের হাতে এসে গেল। পত্রখানি লিখেছিলেন কাসেম মনসুর নামক এক গুজরাটি মুসলমান সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে তাঁর পুত্রের কাছে। এই পত্রখানি রেঙ্গুনে অবস্থিত তুরস্কের কনসালের নিকট পৌঁছাবার জন্যই কাসেম মনসুর তাঁর পুত্রের নিকট লিখেছিলেন। এই পত্রে লেখা হয়েছিল যে মালয় এস্টেটস্ গার্ডস ও অন্যান্য ভারতীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। তুরস্ক যেন কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ তাড়াতাড়ি সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেয়। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কাসেম মনসুরের পত্রখানা ইংরেজ সরকারের হাতে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মালয় স্টেটস্ গার্ডস রেজিমেন্টকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেওয়া হয়। এর ফলে অপর রেজিমেন্টগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করে মালয়ের কয়েকটি অঞ্চল দখল করে নেয়। পরে অবশ্য ইংরেজরা রেঙ্গুন, হংকং প্রভৃতি স্থান থেকে কয়েকটা বড় সৈন্যদল নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের পর তাদের পরাজিত করে। সামরিক আদালতের বিচারে প্রায় চারশত বিদ্রোহী সৈন্যের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

অপর দিকে আলী আহাম্মদ ও ফাহিম আলী তুরস্ক থেকে রেঙ্গুনে

আসার পর মুসলমানদের নিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন। বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো এই সমিতির উদ্দেশ্য। তারা রেঙ্গুনের একটি মোমিন মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাহায্যে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং তার দ্বারা কয়েকটি রিভলবার ও পিস্তল ক্রয় করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে হাসান খাঁ ও শোহন লাল পাঠক নামে গদর সমিতির দু'জন সদস্য ব্যাংকক থেকে গোপনে রেঙ্গুন এসে গেলেন এবং শহরের মধ্যে একখানা ঘর ভাড়া করে সেখান থেকে গদর সমিতির কাজ চালাতে লাগলেন। মালয়ের বিদ্রোহের ব্যর্থতায় মুস্তাবা হোসেন রেঙ্গুনে এসে হাসান খাঁ ও শোহন লালের সঙ্গে মিলিত হলেন। এদিকে রেঙ্গুন ও মালয়ের সৈন্য বিদ্রোহের পর ইংরেজরা অধিকতর তৎপর হওয়ায় এবং বর্মার গদর পার্টির ঘাঁটি এবং বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র খানা তল্লাশি হয়। এবং কয়েকজন বিপ্লবীও গ্রেফতার হয়। ধৃত বিপ্লবীদের কয়েকজনের ফাঁসি ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। বর্মায় বিদ্রোহের সর্বশেষ চেষ্টা হয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে। এই প্রচেষ্টা রেঙ্গুণের মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এবং এর উদ্যোক্তা ছিলেন ফাহিম আলী ও আলী আহাম্মদ। প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখ ঠিক হয় অক্টোবর মাসের ঈদুল আযহার দিনে। বিদ্রোহীরা ঘোষণা করেন যে বকরী ঈদের প্রথা অনুযায়ী ছাগল ও গরু কোরবাণীর পরিবর্তে ইংরেজ শয়তানদের কোরবাণী করা হবে। পরে বিদ্রোহের তারিখ বদল হয় এবং ২৫শে ডিসেম্বর নূতন তারিখ ধার্য্য হয়। বর্মার সামরিক পুলিশের একটি মুসলমান ব্যাটেলিয়ন ও এই বিদ্রোহে যোগদান করতে প্রস্তুত হয়েছিল। নভেম্বর মাসে বিদ্রোহের সকল পরিকল্পনা ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং রিভলবার, ডিনামাইট ও অন্যান্য জিনিষ পত্রের একটি গুদাম পুলিশ আবিষ্কার করে। সঙ্গে সঙ্গে বহু বিদ্রোহীকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং এদের অনেকের দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড হয়। এই ভাবে বর্মার ঘাঁটি করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেকটি পর্যায়ের অবসান ঘটে।

এবার বলছি অনেক আগের কথা প্রথম মহাযুদ্ধের পর মোহাজেরীনদের ওয়াহাবী সংগ্রাম প্রস্তুতি মুসলমানদের বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম বিপ্লব নয়। সিপাহী বিপ্লবের পর বহুদিন ধরে মুসলমানরা সংগ্রাম করেছে,

কিন্তু কায়েমী স্বার্থের ষড়যন্ত্রে তা ব্যর্থ হয়েছে। সে কথা এখানে বিবৃত করবো।

ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী যে সব সংগ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে, তাতে সিংহের ভাগ নিয়েছে উপমহাদেশের মুসলমানরা, ইতিহাস এ সত্য স্বীকার করে। কিন্তু তখনকার ঘটনাপ্রবাহ এত প্রতিকূল ছিল যে, মুসলমানদের নেতৃত্বে এইসব সংগ্রামের বিরোধীতা করেছে ভারতের মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণী এবং তাদের নতুন প্রভু বৃটিশ সরকার। ঘটনার প্রবাহের পটভূমি-বিশ্লেষণ করলে আনুপূর্বিক ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠবে।

১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের পর। এমন কি, তারও আগে ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর মুসলমানরা রাতারাতি ভিখারীতে পরিণত হয়। ১৭৯৩ সালে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" প্রবর্ত্তনের ফলে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সকল জমিদারী হিন্দুদের হস্তগত হয় এবং সংখ্যাগুরু মুসলমানরা একপ্রকার মনুষ্যেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। যেহেতু বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী মুসলমানদের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেয়, সেই হেতু মুসলমানরা যেমন বৃটিশ জাতিকে দুশমন মনে করতো, তেমনি বৃটিশ জাতিও মুসলমানদের দুশমন মনে করতো। তারা হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের সহযোগিতায় মুসলমানদের উপর অত্যাচারের রথচক্র চালিয়ে দিয়েছিল। সেই হেতু মুসলমানরা ও বৃটিশ সংগ্রাম শুরু হতেই একশত বৎসর ধরে তাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম শুরু করে। সুচতুর বৃটিশ জাতি হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের হাতে নিয়ে মুসলমানদের যে কোন বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে ব্যর্থ করে দেয়। পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা যায় যে ভারতের মুসলমান কৃষকরা হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক বেশী সংগ্রাম করেছে। ভারতের মাটি থেকে বৃটিশ শাসনের মুলোচ্ছেদ করার জন্য তারা সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। *

---

* W. W Hunter-The Indian Mussalmans, a sketch of the Wahabis in India (Cal. Review 1866) M. Husain, Origin of Indian Wahabian Indian History Conference. 1930

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানরা ভারতের সকল অঞ্চলে বিপ্লবের আগুণ জ্বালিয়েছিল। যেহেতু বিপ্লবের নায়করা ছিলেন মুসল-মান, সেহেতু এই বিপ্লবের কাঠামো ছিল ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে কিন্তু ক্রমে তা বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারার সংগ্রামে রূপলাভ করে। আর এই সংগ্রামের অগ্র নায়ক বেরিলীয় সৈয়দ আহমদ ছিলেন ওয়াহাবী আন্দোলনের একজন নেতা।

এই সৈয়দ আহমদের জীবনী অত্যন্ত চমকপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কথা। এক পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের সর্বত্র বৃটিশ শাসনের অত্যাচারে জনগণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে, তার উপর কায়েমী স্বার্থ হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার। সাধারণ মানুষের সমাজ জীবন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সকল সম্প্রদায়ের গণমানুষের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার সংকল্প নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সৈয়দ আহমদ সবেমাত্র মক্কা থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নূতন মন্ত্র—ওয়াহাবী মতবাদ।

ওয়াহাবী মতবাদের লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ঠ কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ। ওয়াহাবী শব্দে অর্থ নবজাগরণ। আরবের ধর্মীয়-নেতা আবদুল ওয়াহাবের নামানুসারে এই ওয়াহাবী আন্দোলনের নামকরণ করা হয়।

সৈয়দ আহমদের জীবন কাহিনী প্রকৃতপক্ষে ভারতে বৃটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের কাহিনী। সৈয়দ আহমদ বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার জন্য পিণ্ডারী কৃষক সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং পিণ্ডারী কৃষক সৈন্য দলের সেনাপতিরূপে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তিনি তখন মক্কায় চলে যান।

মক্কা থেকে ফিরে সৈয়দ আহমদ ওয়াহাবী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। ভারতকে বলা হল দারুল হারব। তিনি ভারতকে দারুল ইসলাম করার শপথ নিয়ে সংগ্রাম শুরু করেন। উত্তর ভারত ও বিহারের লক্ষ লক্ষ মুসলমান ও হিন্দু চাষী তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বিহার হয়ে গেল ওয়াহাবী বিপ্লবীদের প্রাণ কেন্দ্র।

বিহারের প্রাণবন্যা বঙ্গদেশেও আঘাত হানলো। বাংলার চাষী হিন্দু মুসলমান সকলেই তখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে ও বৃটিশ আমলা-দের শোষণে অতিষ্ঠ। তারা সৈয়দ আহমদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে, বৃটিশ শাসক ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট হিন্দু জমিদার-মহাজন প্রমাদ গুণতে শুরু করে। সর্ব্বহারা ও পতিত হিন্দুগণ মুসলমান চাষীদের দলে যোগ দেয়।

আপাতত, বঙ্গদেশের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, সৈয়দ আহমদ ১৮২৪ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাত্রা করেন এবং পেশোয়ারে ঘাঁটি করে সেখানে সংগঠন শুরু করেন। দোর্দণ্ড প্রতাপ রণজিৎ সিংহ তখন পাঞ্জাবের শাসন কর্তা। কৃষক প্রজাদের উপর চলছে অকথ্য অত্যাচার। যেহেতু কৃষকদের বেশীরভাগ ছিল মুসলমান, সেহেতু মুসলমান জন-গণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো।

ওয়াহাবী আদর্শের অনুসারী হলেও সৈয়দ আহমদ ছিলেন মনে প্রাণে বিপ্লবী। তাঁর ওয়াহাবী আদর্শ ছিল প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের আদর্শ। পাঞ্জাবের চাষীদের বিদ্রোহে সৈয়দ আহমদ নেতৃত্ব প্রদান করেন। ক্রমে পাঞ্জাবের শাসক রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ আর জনগণ বনাম শোষকের সংগ্রাম থাকলোনা। তার শিখ-মুসলমান সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করলো। এজন্য হিন্দু ও ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এই যুদ্ধকে হিন্দু বিরোধী যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু কৃষক বিদ্রোহ থেকে এই সংগ্রামের উৎপত্তি। তবে শিখ কায়েমী স্বার্থ এই যুদ্ধকে শিখদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ বলে প্রচার চালিয়ে অবস্থা তাদের অনুকুলে আনয়ন করে। শিখ ও হিন্দু চাষীরা শিখ রাজা ও জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করে মুসলমান চাষীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলো।

১৮২৭ সালে সৈয়দ আহমদ পাঞ্জাবে তাঁর বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। প্রথম কয়েকটী যুদ্ধে মুসলমান বিপ্লবী বাহিনী জয়লাভ করে। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে মুসলিম বিপ্লবী বাহিনী পশ্চিম-পাঞ্জাবের তদানীতন্ত রাজ-ধানী পেশোয়ার অবরোধ করে। কিন্তু ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদের

বাহিনীর সহিত শিখ বাহিনীর এক খণ্ড যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদ হন। ভারতের মাটিতে আজাদীর যে অগ্নি শিখা জ্বালিয়ে সৈয়দ আহমদ শহীদ হয়েছেন, যে আগুন ছড়িয়ে গেল সারা ভারতে।

সৈয়দ আহমদের শাহাদতের পর ওয়াহাবীরা দমে গেলেও একেবারে নিষ্ক্রিয় হয় নি। ধীরে ধীরে তারা আবার শক্তি সংগ্রহ করে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো। তারা পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান সিতানয়া দুর্গ স্থাপন করে শিখরাজ্যের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। শুধু পাঞ্জাবেই নয়, বরং সারা ভারতে ওয়াহাবী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। এখন আর শুধু শিখদের উপর নয়। বৃটিশ শাসক ও তাদের অনুসারী জমিদার মহাজনদের উপরও আক্রমণ শুরু হয়ে যায়।

ওয়াহাবীরা যখন কেবলমাত্র শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করছিল, তখন ভারতের বৃটীশ শাসকরা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাদের মতলব ছিল, রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা হ্রাস করা। কারণ বৃটিশ শাসকচক্র তখনো পাঞ্জাব জয় করতে পারেনি। রণজিতের শক্তিক্ষয় হলে তাদের সুবিধা হবে পাঞ্জাব জয় করার। কিন্তু ওয়াহাবী বাহিনী যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করলো তখন বৃটিশ শাসকরা আর নিস্ক্রিয় থাকলো না, ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ শুরু করলো। ক্রমান্বয়ে কয়েকটী যুদ্ধের পর ওয়াহাবীরা সিতানা দুর্গ ত্যাগ করে, কিন্তু গেরিলা কৌশলে তারা বঙ্গদেশসহ ভারতের সকল অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকে। ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র বিহারের কয়েকটি অঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠিত হল। রাজধানী হল পাটনা শহর। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের একটী অংশ কিষাণ বিদ্রোহের অনল প্রজ্জ্বলিত করে। সে কথা পরে বলছি।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের নতুন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সৈয়দ আহমদের দুই শিষ্য—বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী। এদের নেতৃত্বে ওয়াহাবী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে জেহাদী রূপ নিয়ে সারা ভারতে—ছড়িয়ে পড়ে বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোর, বাখেরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, নদীয়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলায়।

সবখানেই কৃষকরা জমিদার ও নীলকুঠি সাহেবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। পাঞ্জাবের উপরও ওয়াহাবীদের নয়া হামলা শুরু হয়। এর মধ্যে ১৮৫০ সালে বৃটিশ শক্তি সারা পাঞ্জাব দখল করে নেয়। রনজিৎ সিংহের ক্ষমতা ওয়াহাবী হামলায় একেবারে কাহিল হয়ে পড়ে। ফলে ইংরেজদের পক্ষে রনজিৎ সিংহের পতন ঘটাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। ওয়াহাবীরা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও পাঞ্জাবে সংগ্রাম শুরু করে। ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত বৃটিশের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীরা ৩৬টি অভিযান পরিচালনা করে।

১৮৬৮ সাল ওয়াহাবীদের জন্য একটি চরম দুঃখময় বছর। এই বছরে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী কুটনীতির দ্বারা ওয়াহাবীদের সমর্থক উপজাতীয় মুসলমানদের ওয়াহাবী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং ভারতের জঙ্গী লাট স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ওয়াহাবীদের সকল ঘাঁটিতে প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করে। ওয়াহাবীরা প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা বিদ্রোহী নায়কদের দলে দলে বন্দী করতে থাকে এবং অনেককে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হয়। ফলে, ভারতের বিদ্রোহী মুসলমান কৃষক প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পরাজয় বরণ করলেও ইতিহাসে তারা অমর হয়ে আছেন।

১৮৬৯ ৭০ সালে কলকাতার কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁ বিদ্রোহের অপরাধে বিচারের সম্মুখীন হন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আমীর খাঁ কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন। হাইকোর্টে তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার এনেস্টি। তিনি স্বদেশী ও বিদেশী বহু ঐতিহাসিকের মনগড়া ইতিহাস মিথ্যা প্রমাণ করে বলেছিলেন যে, ওয়াহাবী বিদ্রোহ মূলতঃ সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, এটা ভারতের বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোটী কোটী ভারতবাসীর বিদ্রোহ। এনেস্টি সাহেবের মন্তব্য যেমন ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে, তেমনি শত শত তরুণকে স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।* কলকাতার মামলার বিচারের পর আমীর

* যোগেশ চন্দ্র বাগল; 'মুক্তি সন্ধানে ভারত।'

খাঁকে দ্বিপান্তরে পাঠানো হয় এবং তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয়। কিন্তু ১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসে আমীর খাঁ মামলার বিচার-পতি মিঃ নরম্যানকে ওয়াহাবীরা গুলি করে হত্যা করে। এর কিছুদিন পরেই আবার ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান সফরে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না। একজন দ্বীপান্তরিত ওয়াহাবীর ছুরি-কাঘাতে তিনি নিহত হলেন। ওয়াহাবী বিদ্রোহীরা ভাল করেই জানিয়ে দিলেন যে, বিদ্রোহকে পরাজিত করা সম্ভব হলেও বিদ্রোহী মনকে পরাজিত করা কোন শাসক শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়।

ওয়াহাবী বিদ্রোহ সম্পর্কে হিন্দু ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিতর্কের অন্ত নেই। যারা এই বিদ্রোহকে একটি জাতীয় বিদ্রোহ রূপে চিত্রিত করতে চায়না তাঁদের মত এই যে, বহুক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় শ্লোগানের ফলে বিদ্রোহ যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি; কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা যে ধনতন্ত্র ও শিল্প বিকাশের পূর্ব যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় যুদ্ধ বা বিদ্রোহের জন্য ধর্মীয় ধ্বনির সাহায্য গ্রহণ করতো। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলার বিপ্লবীরা শিবাজী অথবা, কালীমাতার জয়ধ্বনির মধ্যে বিপ্লবের প্রেরণা খুঁজে বেড়িয়েছে; কিন্তু দুই চারটি হত্যা কাণ্ড ছাড়া তাঁরা আর বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। ওয়াহাবী বিদ্রোহের তুলনায় এই সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন অকিঞ্চিতকর, কারণ এই আন্দোলন জনগণকে সাথে নিতে পারেনি।

সৈয়দ আহমদের বীর বাহিনী যখন উত্তর ভারত ও বিহারে মরণ-পণ সংগ্রামে লিপ্ত, সে সময় বঙ্গদেশে তীতুমীরের নেতৃত্বে ২৪ পরগনা, নদীয়া ও যশোর জেলায় ওয়াহাবীদের আযাদ সরকার গড়ে ওঠে। বৃটিশ শাসক ও হিন্দু জমিদার গোষ্ঠী একজোট হয়ে তীতুমীরের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র ধ্বংস করার জন্য কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করে

তীতুমীরের আসল নাম মীর নেছার আলী। জন্ম ২৪ পরগণা জেলার হায়দার পুর গ্রামে। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতার এক জন পেশাদার পালোয়ান ছিলেন। তিনি মক্কায় হজ্জ করতে যান। সেখানে মহা বিপ্লবী সৈয়দ আহমদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর চিন্তা ধারার অনুসারী হন।

এরপর দেশে তিনি সর্বহারা হিন্দু মুসলমান চাষীদের সংঘটিত করতে থাকেন। এটা জানতে পেরে হিন্দু জমিদাররা তীতুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং আরো কয়েক জন জমিদার ফরমান জারি করে যে, তাদের জমিদারীতে যারা দাড়ি রাখবে তাদের আড়াই টাকা করে খাজনা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে তারা একটা মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। তীতু এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে পুঁড়া গ্রামের পুঁজামণ্ডপে উপস্থিত হয়ে গরু জবাই করলেন। এর ফলে জমিদার ও ওয়াহাবীদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে মন্দিরের পুরোহিত নিহত হয় এবং যে সকল মুসলমান ভূ-স্বামী হিন্দু জমিদারদের পক্ষে যোগদান করেছিল তাদের ঘরবাড়ী লুন্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। লাউঘাটা নামক জায়গায় জমিদার ও ওয়াহাবীদের মধ্যে এক যুদ্ধে জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। ফলে ওয়াহাবীদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং তারা এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘোষণা করেন। ১৮৩১ সালে কৃষ্ণদের রায়ের লাঠিয়াল ও সৈন্য সামন্তরা তীতুমীরের দলকে নারকেল বাড়ীয়া নামক গ্রামে আক্রমন করেন। এই সংবাদে চাঁদপুর থেকে ওয়াহাবী দলীয় সেনাপতি গোলাম মাসুম তীতুমীরের সংগে যোগদেন। এই সময়ে ওয়াহাবীরা যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলেক্সাণ্ডারের বাহিনীকে শোচনীয়-ভাবে পরাজিত করে। আলেক্সাণ্ডারের এই বিপর্যয়ে কর্নেল স্টুয়ার্ড বহু সৈন্য সামান্ত নিয়ে তীতুর প্রধান কেন্দ্র নারকেল বাড়ীয়া যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে নদীয়ার কালেকটার সাতক্ষীরা, গোবর ডাঙ্গা ও নদীয়ার জমিদারদের নিয়ে সম্মিলিত ভাবে তীতুকে আক্রমণ করেন। সেনাপতি মাসুম এই যুদ্ধে ইংরেজদের শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। কালেক্টার ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের কবল থেকে আত্ম রক্ষার জন্য পালিয়ে যান।

সেনাপতি স্টুয়ার্ড তীতুর নারকেল বাড়ীয়ার বাঁশের কেল্লা ঘেরাও করে এবং ১৮৩১ সালের ১৪ই নবেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজরা যখন তীতুর বাঁশের কেল্লার উপর কামান দাগা শুরু করে তখন তীতু যায়নামাজে বসে তসবীহ্ জপছিলেন। সেনাপতি মাসুম হুকুম দিলেন আক্রমন কর যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ কর, তবু আত্মসমর্পণ করোনা।

ইংরেজ সৈন্যের কামানের দুইটি গোলা নামাজরত বীর নেছার আলীর গায় এসে আঘাত হানলো। তিনি আল্লাহর নাম জপ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর ওয়াহাবী বিপ্লবের নায়ক মাসুমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। নারকেল বাড়ীয়ার ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লার সামনে মাসুমকে ফাঁসী দেয়া হয়। তীতুমীরের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁর মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। ১৪ই নবেম্বর উপমহাদেশের ইতিহাসে একটী শোকাবহ স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

গণ-বিদ্রোহের আর এক সোনালী অধ্যায় রচনা করেছে ফারায়েজী আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্গাতা হাজী শরিয়তুল্লাহ। ফরিদপুর জেলার বন্দরখোলা পরগণার বাহাদুরপুর গ্রামে হাজী শরিয়তুল্লার জন্ম। ফারায়েজী বা 'আল্লার আদেশ অনুসরণকারী' মতবাদের মধ্য দিয়ে হাজী শরিয়তুল্লার দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত রচনা করেছিলেন।

ফারায়েজী আন্দোলন

কথিত আছে যে, শরিয়তুল্লাহ মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে মক্কায় হজ্জ্ব করতে গিয়েছিলেন। ১৮২০ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি একদল ডাকাতের হাতে ধরা পড়েছিলেন; তারা শরিয়তুল্লাহ্‌কে নিয়ে বহু স্থান ভ্রমণ করে। এই সময় শরিয়তুল্লাহ্‌র ধর্মমত ও জনসেবার আদর্শ ডাকাতদের মুগ্ধ করে। ফলে, তারা ডাকাতি ত্যাগ করে শরিয়তুল্লাহ্‌র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

শরিয়তুল্লাহ্‌র রাজনীতির মূল বক্তব্য ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের কল্যাণ, ঐক্য, সংগঠন ও ভারতের স্বাধীনতা। তাঁর এই মতবাদে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য সর্বহারা কৃষক তাঁর পতাকা তলে সমবেত হয়। তিনি ঢাকা জেলার নয়াবাড়ীতে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন। কৃষকদের মধ্যে তাঁর প্রচারণা সুফলপ্রসূ হয়। এতে সরকার ও কায়েমী স্বার্থের সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে দেখে সরকারের সহায়তায় জমিদার ও মহাজন শ্রেণী শরিয়তুল্লাহ্‌কে ঢাকা জেলা থেকে বের করে দেয়। ফলে, তিনি নিজ জেলা ফরিদপুরের গ্রাম অঞ্চলে ফিরে যান এবং অল্প দিনের মধ্যে হাজার হাজার কৃষক সাধারণ-সমবায়ে তিনি

এক গণ-বাহিনী গঠন করেন। এবং ঘোষণা করেন যে, চাষীদের স্বার্থ-রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে জেহাদ করতে হবে।

পীরমুরিদ প্রথার বিরুদ্ধে শরিয়তুল্লাহ্ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরীপুজা কবর পুজার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম জেহাদ শুরু হয়। ফারায়েজী মতবাদ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষকদের মধ্যে এমন এক বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি করেন যার ফলে ইংরেজ শাসক, জমিদার ও নীলকর বণিক গোষ্ঠী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক জেমস্ ওয়াইজ লিখেছেন, "শরিয়-তুল্লাহ্ নির্বিকার ও মেরুদণ্ডহীন কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারনের মধ্যে যে অভুর্তপূর্ব কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন তা তৎকালীন ইতিহাসে বিস্ময়কর ঘটনা। শরিয়তুল্লাহ্ সাধারণ দরিদ্র পরিবার হতে আবির্ভূত হলেও তাঁর নির্মল চরিত্র ও আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছিল।" লোকে তাঁকে বলত "বিপদে পরামর্শদাতা ও দুঃখ বেদনায় শান্তনা দানকারী পিতা।" শরিয়তুল্লাহ্ প্রচার করতেন জমিদার মহাজনদের কোন অধিকার নেই কৃষকের শ্রমে নিজেদের ভাগ্য গড়ার। কারো অধিকার নেই মানুষকে শোষণ করার। এই প্রচারের ফলে একদিকে যেমন হিন্দু মুসলিম সর্বহারার দল বিদ্রোহের জন্য তৈরি হতে থাকে, অন্য দিকে তেমনি কায়েমী স্বার্থ শরিয়তুল্লাহ্র বিরুদ্ধে অস্ত্রে শান দিতে শুরু করে।

শ্রেণী সংগ্রামের প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ, তখনই হাজী শরিয়তুল্লাহ্ ইন্তেকাল করেন। তিনি চলে গেলেন কিন্তু রেখে গেলেন তাঁর আদর্শ ও হাজার হাজার অনুসারী। শরিয়তুল্লাহ্র পুত্র মোঃ মোহসীন পিতার আরদ্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে এলেন। জনগণের কাছে তিনি দুদু মিয়া নামে পরিচিত।

দুদু মিয়া তাঁর পিতার ন্যায় অল্প বয়সেই হজ্জ করে আসেন। দেশে ফিরে তিনি জমিদারি শোষণ ও বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেন। ডামপিয়ারের রিপোর্টে জানা যায় যে দুদু মিয়ার পরিচালিত ফারায়েজী বাহিনী ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন বাংলায় স্বাধীন মুসলিম রাজ্য স্থাপনের, সংগ্রামে নেমে ছিলেন। দুদু মিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রচার করেন: "আল্লাহর রাজ্যে কর ধার্য করার অধি-

কার করার নেই।" তাঁর এই অগ্নিমন্ত্র কৃষক, শ্রমিক দীনমজুরদের মুক্তির মন্ত্র। এই মন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিনতি বিপ্লব, বিদ্রোহ। দুদু মিয়া তাঁর শিষ্যগণসহ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জ্বলন্ত প্রতীক রূপে দেখা দিলেন। তিনি ধর্মীয় সমস্যার সমাধান এবং বিরোধের নিস্পত্তি নিজেদের মধ্যে বিচার করে সমাধা করতেন। বয়োবৃদ্ধ ফারায়েজী কৃষকরা বিচারে বসতেন। এই বিচারের রায়ের অসম্মান করে কেউ ইংরেজদের সরনাপন্ন হলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হত।

দুদু মিয়ার সংঘবদ্ধ গন-বাহিনীকে দমন করতে না পেরে হিন্দু মুসলমান জমিদার ও ইংরেজ শাষকরা ঐক্য বদ্ধ হল। কিছু ভণ্ড পীর, মৌলবী ও সুফী নামধারী কতিপয় দরবেশ এই কায়েমী স্বার্থবাদের সঙ্গে হাত মিলায়। জমিদাররা কৃষকদের উপর নির্যাতন শুরু করে। ফরিদপুর গেজেটীয়ার থেকে জানা যায় যে অবাধ্য কৃষকদের কয়েক জনের দাড়ি এক সঙ্গে বেঁধে তাদের নাকের মধ্যে মরিচের গুড়া ঢুকিয়ে দেয়া হত। এতদসত্ত্বেও ফারায়েজী আন্দোলন ও কৃষকদের জাগরণ দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। তারা জমিদারদের খাজনা বন্ধ করে দেয়, নীলকরের কুঠি আক্রমণ করে। এমনি ভাবে যখন দেশে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, জমিদার মহাজনদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পথে, তখন ইংরেজ সরকার ফারায়েজীদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনী পাঠায়, কিন্তু তারা কৃষকদের দাপট ও দুদু মিয়ার নেতৃত্ব উপলব্ধি করে কোন রূপ বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে পালিয়ে যায়। সরকার অবশেষে ১৮৩৮ সালে ঢাকা থেকে একদল সৈন্য পাঠায় এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

ফরিদপুরের দায়রা জজের আদালতে দুদু মিয়া ও তার বাষট্টিজন সহকর্মীর বিচার হয়। বিচারে সব আসামীকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু হাইকোর্টের আপীলে সবাই খালাস পান।

দুদু মিয়ার কৃষক আন্দোলন সারা বাঙলায় বিস্তৃতি লাভ করে। ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও বাকেরগঞ্জে হাজার হাজার লোক ফারায়েজী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহন করে।

১৮৫৭ সালে শেষ বারের মত দুদু মিয়াকে আলিপুর কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। দীর্ঘ চার বৎসর কারাবাসের পর ১৮৬০ সালে

কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর মহানায়ক সংগ্রামী দুদু মিয়া কারাগারেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্বগ্রাম বাহাদুর পুরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

পুর্ণিয়ার এক কুখ্যাত জমিদার দেবী সিংহ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে উৎকোচ দিয়ে মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য কয়েকটী অঞ্চলের ইজারাদারী লাভ করে। সে প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। রংপুর, দিনাজপুর, অঞ্চলের প্রজাগণ দেবী সিংহের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে শুরু করে। "মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে" লেখা আছে : "কৃষকগণ খাজনার দায়ে দলে দলে শৃঙ্খলিত

রংপুরে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বে নূরুদ্দীন

হয়ে কারাগারে প্রেরিত হতে লাগলো। অবিরত বেত্রাঘাতে তাদের দেহ ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সারা অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হল। এই অবস্থায় উত্তর বঙ্গের কৃষক সাধারণ দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহের শপথ নেয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কৃষকদের দ্বারা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটলো। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিলেন নূরুদ্দীন নামক এক মুসলিম কৃষক যুবক। হিন্দু মুসলিম কৃষকগণ ও শ্রমিক জনসাধারণ—জমিদার ও ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। বছরের প্রথম দিকে সারা রংপুর জেলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। সম্মুখ সংঘর্ষে দেবী সিংহের বহু লাঠিয়াল বরকন্দাজ নিহত হল। টেপা নামক স্থানের জমিদারের নায়েব নূরুদ্দীনের বাহিনীকে বাধা দিতে এসে নিহত হয় ও তার সৈন্য সামন্ত প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে।"

কুচবিহারের ইতিহাসে লেখা হয়েছে : "কাকিনা, ফতেপুর, ডিমলা, কাজীর হাট এবং টেপা পরগণার বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হয়ে জমিদার মহাজনদের কর আদায়কারী নায়েব গোমস্তাদের যত্রতত্র হত্যা করতে থাকে। ডিমলার জমিদার গৌর মোহন চৌধুরী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সদলবলে নিহত হয়।

"বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে কুচবিহার ও দিনাজপুরের সর্ব্বত্র। তথাকার কৃষক জনগণ নূরুদ্দীনের নেতৃত্বে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জমিদারের নায়েব গোমস্তা বরকন্দাজের দল এইসব এলাকা থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

"বিদ্রোহীদের কবল থেকে জীবন বাঁচানের জন্য পীশাচ দেবী

সিংহ রংপুরের ইংরেজ কালেক্টরের স্মরণাপন্ন হয়। এই ব্যক্তিটি দেবী সিংহের অর্থভোগী ছিল। কালেক্টর বিপ্লবী নেতা নুরুদ্দীনের বিরুদ্ধে বিরাট এক সিপাহী বাহিনী পাঠায়। মোগল হাট বন্দরে ইংরেজ বাহিনীর সংগে বিদ্রোহীদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিদ্রোহী নায়ক নুরুদ্দীনকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। এই আঘাতের ফলে পরে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইংরেজ বাহিনী রাতের অন্ধকারে গোপনে নুরুদ্দীনের ঘাঁটি আক্রমণ করেছিল বলেই তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

বঙ্গদেশে কৃষক বিদ্রোহে মুসলমান বীরদের অসম-সাহসীকতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। তবে, এখানে সেখানে যে সকল বিক্ষিপ্ত ঘটনা জানা যায় তাতে বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, সর্বহারার সংগ্রামে মুসলিম নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রমাণিত হয়। খুলনা বাখরগঞ্জ এলাকায় যে প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল তাতে বিদ্রোহী ও সে যুগের রবীণ হুড আবদু ডাকাতের কাহিনী জানা যায়। এই আবদু অত্যাচারী সরকার ও জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে আবার ডাকাতি করে টাকা পয়সা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত লিখেছেন ঃ "আমি যেন পর জন্মে আবদু ডাকাতের ছেলে হয়ে জন্ম লাভ করি।"

বরিশালের এক জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই জমিদারকে খুন করে ফাঁসী কাষ্ঠে জীবন দিয়েছিলেন বয়োবৃদ্ধ বিপ্লবী মাগন খাঁ।

১৭৯২ সালে বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে ইংরেজ শাসক ও জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন এক জন সূফী ফকির। তাঁর নাম বালকী খাঁ।

এমনি আরো কত ঘটনা এবং কত বীর মোজাহেদদের নাম পাওয়া যাবে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে দেশের আনাচে-কানাচে খোঁজ-খবর নিলে।

লর্ড কার্জন শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য ১৯০৫ সালে বিশাল বঙ্গদেশকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তা আগেই বলেছি। নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে উত্তর বঙ্গের সঙ্গে আসাম ও পূর্ব বঙ্গ জুড়ে দিয়ে পূর্ব বঙ্গ এবং বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে পশ্চিম-বঙ্গ -প্রদেশ গঠিত হয়। বৃটিশ সরকারের এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী

বঙ্গদেশে গণ-সংগ্রাম ও হিন্দুদের ভূমিকা

হিন্দুরা দেখলো যে তারা নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগুরু জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উপর পূর্ব-বঙ্গ বাঙালী হিন্দুদের আর্থিক স্বার্থ ছিল; তাদের ছিল বড় বড় জমিদারী সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের এবং কলকাতা প্রবাসী পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হল। তারা মধ্যবিত্ত হিন্দু যুবকদের নানাভাবে উত্তেজিত করে দেশে সন্ত্রাসসৃষ্টিতে তৎপর হয়।

এই সময়ের কিছু আগে বঙ্গদেশে অনেকগুলি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠে। অনেক ব্রাহ্মনেতা ও এই সব সমিতি গঠনে সাহায্য করেছিলেন। কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বড় ভাই যতীন্দ্র নাথ ঠাকুর নিজেই একটি সমিতি গঠন করেন। রবীন্দ্র নাথ দেবী কালীর মূর্তি ও মড়ার খুলি সামনে রেখে গুপ্ত সমিতির সদস্য তালিকায় স্বাক্ষর দান করেন। রবীন্দ্র নাথ তাঁর "আত্মপরিচয়" নামক পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ

> "জ্যোতি দাদা এক পোড়ো বাড়ীতে এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন। একটা পোড়া বাড়ীতে তার অধিবেশন। ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি, আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজ নারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"

এই সময় "হিন্দু মেলা" গড়ে উঠে। শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা জাগিয়ে তোলাই এই মেলার উদ্দেশ্য। কিন্তু বিপ্লবের আসল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মুসলিম বিদ্বেষ। হিন্দু-মুসলমান কৃষক-দের মধ্যে যে ঐক্য ছিল, মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের ফলে বঙ্গদেশে তথা সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করা হল। হিন্দুদের ধর্মীয় স্বদেশী আন্দোলন দেশে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিল। ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হল, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার অব-সান হল না, বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ায় উল্লাসিত হিন্দুরা রাখি বন্ধন উৎসব পালন করলো। কবি রবীন্দ্র নাথ এই উপলক্ষে "আমার সোনার বাংলা" গানটি রচনা করেন।

মুসলমান জনগণের মধ্যে এই ধারণা জন্মেছিল যে বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব-বঙ্গের জনগণ জমিদার শ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণ থেকে নিস্কৃতি পাবে।

কিন্তু তা-যখ। হল না তখন তাদের মধ্যে হতাশা ও হিন্দু জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলমান জনগণের বিদ্বিষ্ট হওয়ার কারণ হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই সৃস্টি করেছিল। ১৯০৭ সালের মে মাসের কথা। জামালপুরের কৃষক জনসাধারণ জমিদার ও মহাজনদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যখন সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করল, লক্ষ লক্ষ মানুষের সামাবেশ ঘটলো কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে, তখন হিন্দুদের ঋষি অরবিন্দ বোমা ও রিভলভার সহ কিছু হিন্দু সন্ত্রাসবাদীকে পাঠালেন এই মুসলিম গণ উত্থান পণ্ড করার জন্য। গৌরীপুরের হিন্দু জমিদারের ইঙ্গিতে মুসলমানদের উপর বোমা-রিভলভারের আক্রমণ চলেনো। সন্ত্রাসবাদীরা বুঝলো না যে, জমিদার ও মহাজন শ্রেণী তাদের স্বার্থে সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহার করলেও হিন্দু চাষী জনগণের কোন কল্যাণ তারা করবে না।

ভারতের খ্যাতনামা তরুণ ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় "ভারতের বৈপ্লবীক সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন,

"বঙ্গদেশ জাতীয় আন্দোলনের চরম পন্থী নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রথম হইতে কৃষক আন্দোলনকে এড়াইয়া গিয়া স্বদেশী আন্দোলন অর্থাৎ বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলনকে কেবল মধ্য শ্রেণীর বিশেষতঃ শহরের মধ্য শ্রেণীর গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। চরম পন্থী, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়া, এমনকি জমিদার মহাজন বিরোধী কৃষক বিদ্রোহকেও হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ বলিয়া প্রচার করিতে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতেও ইতস্তত করেন নাই।

"ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে হিন্দু জমিদার মহাজন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহকে (১৯০৭) তাঁহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণরূপে প্রচার করিয়া সেই বিদ্রোহকে বোমা রিভলভার দ্বারা রক্ত বন্যায় ডুবাইয়া দিতে ছুটিয়াছিলেন।"

অধ্যাপক ক্যান্টোয়েল স্মিথ তাঁর গ্রন্থে জামালপুরের কৃষক অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন: "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পশ্চাতের মূল কারণ ধর্মীয় নহে অন্য কিছু। সকল সতর্ক পর্য্যবেক্ষক এমনকি বৃটিশ এবং রক্ষণশীল ব্যক্তিরাও স্বীকার করেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে থাকে অর্থনৈতিক কারন। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গুলি সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশে পরিচালিত শ্রেণী সংগ্রামএরই বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন অন্য কিছু নহে।" *

সেকালের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বুঝে বা না বুঝে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের দুষ্ট চক্রান্তের সহায়তা করে বাংলার বিপ্লববাদের ললাটে চিরকালের জন্য কলঙ্ক লেপন করেছে। অবশ্য গণ-সংগ্রাম তার নিজস্ব গতিতেই চলেছে। স্বদেশী আন্দোলন যখন ক্রমে শ্রেণী সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে, তখন জমিদার মহাজনদের স্বদেশপ্রীতি উবে যেতে শুরু করে। বৃটিশ শাসকরা জমিদারদের স্বদেশী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনার জন্য "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব" আইন সংশোধন করে জমিদারদের যথেচ্ছ খাজনা আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে। আর কৃতজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপ বঙ্গদেশের প্রায় দুই শতাধিক জমিদার বৃটিশ সরকারের কাছে এক দাসখত লিখেদেন।

---

* ডব্লিউ ক্যান্টোয়েল স্মিথ;
মডার্ণ ইসলাম ইন ইন্ডিয়া: ২০৬ পৃষ্ঠা।

।। সাত ।।

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে অধিকতর সুবিধা আদায়ের আন্দোলন শুরু করার জন্য ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস লাক্ষ্মৌ শহরে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যার ফলে সাময়িক ভাবে হলেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠলো। ডাঃ এ্যানে বেসান্ট ভারতের জন্য হোম রুল বা স্বায়ত্বশাসন দাবী করলেন। লক্ষ্মৌ চুক্তি রচনায় যারা সক্রিয় ভুমিকা গ্রহণ করে ছিলেন তাদের মধ্যে অম্বিকা মজুমদার, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, স্যার ওয়াজির হাসান, বিজয় রাঘব আচারিয়া প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের পন্থা হিসাবে ১৯২২ সালে বার্দ্দৌলীতে কর বন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। তিনি অহিংস আন্দোলন চালাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গৌরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা থানা এলাকায় সত্যগ্রহীদের উপর পুলিশের জুলুমে অতীষ্ঠ হয়ে সত্যাগ্রহীরা স্থানীয় জনগণের সহায়তায় চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে এবং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারসহ প্রায় বিশজন পুলিশকে পুড়িয়ে হত্যা করে। গান্ধীজী এটাকে তাঁর "হিমালয়ান ব্লান্ডার" (পর্বত প্রমাণ ভুল) বলে অভিহিত করে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন।

সন্ত্রাসবাদীদের গান্ধী নেতৃত্বে হতাশা

এই ঘটনার পরে, ১৯৩১ সালে যখন লাহোরে বিপ্লবীদের জেল-ফাঁসি চলছে, গান্ধীজীর তখন বড় লাটের সঙ্গে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষর বিপ্লবীরা বরদাশত করতে পারেনি। তাদের মতে গান্ধীজী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তারা এই সময় নুতন উদ্যমে সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিল এবং একের পর এক ইংরেজ ও তাদের দালালদের হত্যা করে চলল। অনেকে এজন্য ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দিলো। গান্ধীজী কোনদিন এদের জন্য আহ্ শব্দটিও করেননি।

দক্ষিণ ভারতের মালাবার, এরনাকুলাম, ওয়ালুভানাদ এলাকাসমূহ মুসল-মান অধ্যুষিত। এরা মূলতঃ আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত। কারণ এদের পূর্ব পুরুষরা ছিল আরবদেশীয় বনিক। বাণিজ্য করতে এসে তারা এখানেই স্থায়ী ভাবে থেকে যায়। ভারতে খেলাফত আন্দোলনে এরা সাড়া দেয়। ফলে বৃটিশ শাসকদের অত্যাচারের রথচক্র এদের উপর চালিয়ে দেয়া হয়। মোপলারাও নির্ভীক ও বীর জাতি। অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ায়। তাদের মন্ত্র হল, "দাঁতের বদলে দাঁত" মোপলারা আর অহিংস থাকলোনা, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে তারা বৃটিশ সরকারের কবল থেকে কয়েকটি তালুক ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধীন মোপলা রাজ্য কায়েম করে। এই সময় হিন্দু জমিদার ও তালুকদাররা বৃটিশ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী ও মহাত্মাগান্ধী মোপলাদের শান্ত করার জন্য দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন, কিন্তু ইংরেজ সরকার বাঁধা দিলে তাঁরা সে বাঁধা মেনে নিয়েছিলেন, আইন অমান্য করে দাক্ষিণাত্যে যাননি।

মালাবারে স্বাধীনতা সংগ্রামঃ মোপলা বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার মালাবারে বিরাট বাহিনী ও সমরাস্ত্র পাঠায় এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জনসাধারণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়। দু'মাস ধরে যুদ্ধ চলে। একদিকে মোপলা বিদ্রোহীরা, অপর-দিকে বৃটিশের সেনাবাহিনী ও হিন্দু জনসাধারণ। ফলে, প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। প্রায় দশ হাজার মোপলা নরনারী নিহত হয় এবং বিশ হাজারের ও অধিক মোপলাকে গ্রেফতার করা হয়। এক হাজার মোপলাকে ফাঁসি দেয়া হয়। কংগ্রেস এই বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি জানায়নি। কারণ তারা এই বিপ্লবের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশংকা করেছিল।

১৯২১—২২ সালের মোপলা বিদ্রোহ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের ধারাবাহিক সংগ্রামের শেষ অধ্যায়। এ সংগ্রামের ইতিহাস অতি দীর্ঘ কালের। মোপলাদের পূর্ব পুরুষরা বহুকাল আগে আরব দেশ থেকে ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী মালাবার অঞ্চলে এসে বাস করতে থাকে। ভারতকে তারা স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের জীবিকা ছিল চাষবাস। স্থানীয় জমিদারদের নিকট থেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতো এবং জমিদারদের খাজনা দিত। তা ছাড়া,

চষের ফসলের অর্ধেক দিত জমিদারকে। ক্রমে এদের শোষনের জন্য মহাজনের ও আবির্ভাব ঘটে।

জমিদার ও মহাজন শ্রেণীয় শোষনের বিরুদ্ধে মোপলা কৃষকরা ক্রমে সংঘবদ্ধ হয়। তাদের শোষকরূপে দেখা দেয় ইংরেজ সরকার, হিন্দু জমিদার ও মহাজন। এই তিন শক্তির অত্যাচার ও শোষনের বিরুদ্ধে মোপলারা রূখে দাঁড়ালো। চাষীরা বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরলো।

মালাবারের ওয়ালুভানাদ ও এরনাদ তালুকের (বর্তমান কেরালা) দশ লক্ষ মোপলা চাষী কেবল মাত্র লাঠি, বল্লম ও তরবারি নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে। সময়টা ১৮৭৩ সাল। ইংরেজ সরকার জমিদার-মহাজনদের রক্ষার জন্য দলে দলে সৈন্য ও পুলিশ পাঠালো। বন্দুকের সামনে টিকতে না পেরে মোপলারা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ও সৈন্যরা মোপলাদের জীর্ণ কুঠীর গুলি ভেঙ্গে চুরমার করে। তবু মোপলারা হাল ছাড়েনি। তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে। দীর্ঘ এক বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে বহু মোপলা চাষী প্রাণ হারায়। শেষ পর্যন্ত সরকারী পুলিশ ও সৈন্যদের মোকাবিলায় মোপলারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। এর পর থেকে মোপলাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ ও ভারতীয় জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ভিতরে ভিতরে সারা দক্ষিণ ভারত জুড়ে বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত হতে থাকে। অবশেষে ১৮৮৫ সালে মোপলারা আবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবার ও কয়েক হাজার বৃটিশ সৈন্য, হিন্দু পাইক বরকন্দাজ ও স্থানীয় পুলিশ—বন্দুক, কামান ও ছোট ছোট দুইটী যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে মোপলাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরিনাম যা হওয়ার তাই হল। বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে কয়েক হাজার মোপলা প্রাণ দিল। বাকী যারা ছিল, আত্মসমর্পন করলো।

১৮৯৪ ও ১৮৯৬ সালে আরো দুবার মোপলারা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। দু'বারই তারা পরাজিত হয়। তবে বৃটিশ সরকার এবার মোপলাদের অভিযোগের তদন্ত করে বর্দ্ধিত খাজনা আদায় বন্ধ করে দেয়।

মোপলাদের শেষ যুদ্ধের কাহিনী আগেই বলেছি।

১৯৩৪ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমীর বাসায় একটা কামরা দখল করে আছি। না, ভাড়া দিয়ে নয়, বিনা ভাড়ায় এবং বিনা খরচে খাওয়াটাও চলে ওর ওপর দিয়ে। তিনি আমায় ভালবাসতেন বলে তাঁর ওপর নানারকমের বোঝা চাপানোর ছাড়পত্র যেন আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। হাশেমী সাহেব কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান, বঙ্গীয় আইনসভার ডেপুটী স্পীকার এবং কংগ্রেসের একজন জবরদস্ত নেতা। সবার উপর সুভাষ চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী।

আন্তঃপ্রাদেশিক

ষড়যন্ত্র মামলা

সে কথা যাক, জানুয়ারীর শীতের রাত। সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরে রাতের আহার শেষ করে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়েছি। রাত তখন প্রায় একটা। লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাবার পায়তারা করছি, একটু তন্দ্রাও এসেছিল। এমন সময় দরজায় ঘা পড়লো, ঠক্ ঠক্ ঠক্।

দরজা খুলতেই দেখি এক শিখ যুবক। খোলা দরজা পেয়ে সে তীরের মত প্রবেশ করলো। এত রাত্রে কেন এই শিখ যুবক, কিছু ঠাহর করতে পারলাম না, খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। বাড়ী-তেও অপর কেউ নেই। হাশেমী দাদা কি কাজে সাতক্ষীরা গিয়েছেন।

ঘরের দরজা আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এখন ভিতরে আমিও আগন্তুক। হঠাৎ সে কোমর থেকে দুই হাতে দুইটি রিভলভার বের করে অস্ফুট স্বরে বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

ভীত সন্ত্রস্ত আমি দুহাত মাথার উপর তুলতে দেখি আগন্তুক মুখ চেপে হাসছে, আর চাপা মুখের ফাঁক দিয়ে তার সামনের দুটো দাঁত দেখা যাচ্ছে। একটি দাঁত পোকায় খাওয়া, তাই কালো দেখাচ্ছে। দেখেই আমার মনে পড়লো এক কমরেডের কথা। অমনি আর একবার তার অবয়বের দিকে লক্ষ্য করে চিনে ফেললাম এই নকল শিখকে। তার মাথায় পাগড়ী আর দাড়ি ধরে টান দিতেই সে খিল-খিল করে হেসে উঠে বললোঃ বড্ড ভয় পেয়ে গিছলে, হয়তো আর একটু হলে হার্টফেল করতে, তাই না?

তার উপর যা রাগ হচ্ছিল, কিন্তু রাগের স্থান দখল করলো কৌতূহল।

জিজ্ঞাসা করলাম, এত রাতে, এই ছদ্মবেশে আর এসব জিনিস নিয়ে কোন সাহসে বেরুলে অনিমাদি?

অনিমাদি অর্থাৎ ডঃ অনিমা ভাদরী আগে কংগ্রেসের একজন কর্মী ছিলেন। বছর দুই হলো হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মিতে যোগ দিয়েছেন। ক্যামবেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে লাইসেন্স পাওয়ার পর প্রাকটিস করছেন না। তবে দলীয় ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখে তিনি চিকিৎসা করে থাকেন। দুষ্টু ছেলেরা বলতো, অনিমাদির ঔষধ খেলে অসুখ মৌরসী পাট্টা নিয়ে থেকে যায়। দীর্ঘাঙ্গিনী অনিমাদির স্বাস্থ্য ভাল হলেও চেহারার দিক থেকে বলা যায় যে, দলের কারুর চিত্ত বিচলিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে পুলিশের পক্ষে সনাক্ত করণের একটা বড় প্রমাণ ছিল তার বামগণ্ডে একটা গভীর ক্ষত চিহ্ন।

এহেন অনিমাদির এত রাতে আসার কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, দাদা পাঠিয়েছেন এই জিনিস দুটো সামাল দিয়ে রাখতে। কুমিল্লা অপারেশন থেকে ফিরে এসেছে।

এখানে বলে রাখা দরকার, দাদা বলতে অনিমাদি ডঃ চারু বন্দোপাধ্যায়কে, আর জিনিস বলতে আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাতে চেয়েছে।

সবইত বুঝলাম এখন তোমার যাবার উপায় কি? এত রাতে গাড়ী, রিকশা কিছুইত পাবে না।

বললেন, ভয় নেই, ঠিক আধঘন্টা পরে একটা ট্যাক্সি এখানে আসবে। আমাদের দলের লোক, ভগত সিংহের আত্মীয়।

এর মধ্যে বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল। অস্ত্রগুলি ঠিক জায়গায় পাচার করা হয়েছে। কিছু অস্ত্র বিভূতি বন্দোপাধ্যায় ও দীনেশ মজুমদারকে দিতে হবে। দীনেশ তখন পলাতক। অস্ত্রশস্ত্র তখন আমার দেশের বাড়ীতে রয়েছে আমার স্ত্রীর হেফাজতে। সেও সদ্য জেল ফেরত। কাজেই পুলিশ অহরহ তার তত্বতল্লাশ নিয়ে যায়। তার পিছনে গ্রামে যে পুলিশ চর লাগিয়ে রাখেনি তা কে বলবে। তবুও দীনেশকে ছদ্মবেশে নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে গেলাম। এবং তাকে একটি পিস্তল দিয়ে রাতের আধারে বশীরহাটে পাঠিয়ে দিলাম। সে তার বোনের বিয়েতে না গেলে নাকি মরে গিয়েও তার আত্মা তৃপ্তি পাবে না। দীনেশের কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। সেকথা এখন নয়।

গ্রামের বাড়ীতে দীনেশকে নিয়ে অনেক কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমার স্ত্রীকে নিয়ে চার মাইল দূরে এক আত্মীয়ের বাড়ী চলে যাই। সেখানে গিয়েও নিস্তার নেই। খুলনা থেকে সংবাদ এলো তালা থানা এলাকা থেকে আমার দাদা কিছু পাটালী গুড় পাঠাচ্ছেন আমার গিন্নির জন্য। যথাসময়ে যেন আমার নিকটবর্তী বেড়াচাপা স্টেশন থেকে জিনিসটা নিয়ে নেই।

বেড়াচাঁপা রেল স্টেশনটি কলকাতা ও বশীরহাটের মধ্যবর্তী মার্টিন কোম্পানীর রেলওয়ের স্টেশন। যথাসময়ের অনেক আগেই স্টেশনে উপস্থিত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। সঙ্গে এক অতি বৃদ্ধ মজুর। ট্রেন অবশ্য যথাসময়ের অনেক পরে এলো। গুড়ের পাটালী বাহক আমার পরিচিত। বৃদ্ধ মজুরকে ট্রেন থেকে পাটালীর হাঁড়ি নামিয়ে সোজা বাড়ী চলে যাওয়ার উপদেশ দিয়ে আমি সাইকেলে স্টেশন থেকে হাওয়া হয়ে গেলাম।

বৃদ্ধ মজুরটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘণ্টা দুই পরে বাড়ীতে এসে পৌছুল। মাথার উপর থেকে হাঁড়িটা নামাতে নামাতে বলল, একটা কথা বলব দাদাবাবু, রাগ করবেন নাত।

এমনিতেই ত ওর ফিরতে দেরী দেখে রাগ উনপঞ্চাশ বায়ুভর করেছিল, তার ওপর এই রকম ভূমিকায় সত্যি সত্যি রাগ চড়ে গেল তবুও কতকটা সংযত কন্ঠে বললাম: কি কথা বলতে চাষ, চটপট বলে ফেল।

দাদাবাবু, ঐ জিনিস একটা দেবেন?"

"কি জিনিস"

"কেন, ঐ যে পিস্তল, হাড়ির ভিতর দেখলাম।"

ওর কথায় আমার পিত্ত জ্বলে উঠলো। ব্যাটা সব দেখে ফেলেছে তাহলে। কিন্তু রাগ করে লাভ নেই: তার চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে ওকে বশ করা দরকার, নাহলে ও বিপদ ঘটাতে পারে তাই খুব নরম সুরে বললাম: হ্যারে, তুই বুঝি হাঁড়ির মুখ খুলে ফেলেছিলি।

"হ্যাঁ দাদাবাবু, নোদে হাঁটতি হাঁটতি জলতেষ্টা নেগেছিল কিনা; তাই এক টুকরো পাটালী মুখে দে জল খাবার জন্যি যেমনি হাঁড়ির মুখ

খুলিছি অমনি দেখি কি ওনারা রয়েছেন। তাড়াতাড়ি হাঁড়ির মুখ বেঁধে ছুটতে নেগেছি। কেউ দেখতি পায়নি দাদাবাবু।"

"আচ্ছা তোরে যদি একটা দেই, তাহলে তুই ওটা দিয়ে কি করবি বলত!"

"কেন, আমি বুঝি স্বদেশী বাবুদের মতন হতি পারিনে? কি করে ছুঁড়তে হয় একটু শিখিয়ে দিয়ে দ্যাকেন না; ওববারে (রোববারে) ধলা সায়েবেরা পাখী মারতে আসে ওই বিলে, ওদের একবারে নিকেশ করে দেবোনা"।

ওকে ধমক দিয়ে বলি, "খবরদার, এসব কথা যেন কাউকে বলিসনে, যে সব সাহেব পাখী মারতে আসে তারাতো সবাই খারাপ লোক নয়; তাদের মারবি কেন?" ওর হাতে পাঁচটি টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, "খবরদার কোন কথা যেন ফাঁস না হয়।"

বৃদ্ধ জিভ কেটে বললো, "পাগল হয়েছেন দাদাবাবু, বুনোরা মুরুখ্যু হতি পারে, কিন্তু নেমকহারাম নয়। স্বদেশী বাবুরা আমাদের মাথার মণি। জান কবুল, তবু তেনাদের কোন ক্ষতি হতি দেবো না।

বৃদ্ধ সত্যি নেমকহারামি করেনি

এর মধ্যে হাশেমী দাদার পত্র নিয়ে একদিন হাজির হলেন কবি বেনজীর আহমদ। বিশেষ অনুরোধ, একটা ভাল রিভলভার এবং ডজন দুই গুলি দিতে হবে। কি এক জরুরী মিশনে তার দরকার।

কবি বেনজীর আহমদ

কবি আমাদের দলভুক্ত নন। কাজেই বিস্তারিত জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভাল অস্ত্র দেয়া সম্ভব নয়। কারণ আমাদের হাতে তখন প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য অস্ত্র ছিল। দলপতির নির্দেশ, প্রত্যেকটী অস্ত্র আপন সন্তানের মত সযত্নে রক্ষা করতে হবে। আগামী আন্তঃপ্রাদেশিক য়্যাকশনে বহু অস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু হাশেমী দাদার নির্দেশ, কিছু করতে হবে। অগত্যা তাঁকে একটী পুরাতন ধরনের পাঁচ চেম্বার রিভলভার দিয়ে বিদায় করতে হল।

কবি বেনজীর আহমদ কবি হলেও বেপরোয়া বিপ্লবী। ঢাকা জেলার ইলসদী গ্রামের বাসিন্দা তিনি। ভারতের স্বাধীনতা তাঁর

কাম্য। কিন্তু সে স্বাধীনতায় মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হবে। তাই মুসলমানদের নিয়ে গণভিত্তিক বিপ্লবী দল গঠন করতে চেয়েছেন তিনি। মনে পড়ে, ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে তিনি খবরের কাগজে মোড়া এক বান্ডিল নোট নিয়ে সাংবাদিক ফজলুল হক সেলবর্ষীসহ আমাদের বাড়ী এলেন এবং টাকাটা বড় চাচা মওলবী মুজীবুর রহমান সাহেবের হেফাজতে রাখতে চাইলেন। মুজীবুর রহমান সাহেবের সন্দেহ হয়। তিনি কিছুতেই টাকা রাখবেন না। বেনজীর সাহেবের অনেক অনুনয় বিনয়ের পর বড় চাচা আমাকে বললেন, তুমি টাকাটা নিয়ে অফিস ঘরে যে লোহার সিন্দুকটা আছে তার ভিতর রেখে দাও। যখন ফেরত চাইবে, দিয়ে দিয়ো।

আমি টাকার বান্ডিল সিন্দুকে উঠাবার আগে জিজ্ঞাসা করলাম, কত টাকা আছে?

বেনজীর সাহেব বললেন, পঁচাত্তর হাজার টাকা।

পরে শুনেছিলাম, নোয়াখালী জেলার হামছাদি ডাকাতির ফলে তাঁরা এই টাকা পেয়েছিলেন। আরো শুনেছি, বেনজীর সাহেব গ্রেফতার হয়েছিলেন, কিন্তু চালান হওয়ার সময় হাতকড়াসহ ষ্টীমার থেকে পদ্মায় ঝাঁপ দিয়ে তিনি হাওয়া হয়ে যান।

কয়েক বছর পরে বেনজীর সাহেব ও সেলবর্ষী সাহেব এলেন টাকাটা ফিরিয়ে নিতে। বড় চাচার নির্দেশ মত আমি সিন্দুক খুলে পোঁটলাটা বের করতে গিয়ে দেখি পোঁটলার উপরের কাগজে জং ধরেছে এবং সিন্দুকের গায়ে কাগজ আঠার মত আটকে রয়েছে। সন্তর্পণে পোঁটলাটা বের করে বেনজীর সাহেবের হাতে দিয়ে বললাম, টাকা গুণে দেখুন।

বেনজীর সাহেব উত্তরে বললেন, টাকা গণে মিলিয়ে নেয়ার মত জায়গায় আমি গচ্ছিত রাখিনি। তিনি পোঁটলাটা নিয়ে চলে গেলেন।

পরে জেনেছিলাম, তিনি সাহিত্য পত্রিকা বের করেছিলেন এই অর্থ দিয়ে। তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা বেশীদিন চলেনি।

সে যাক, এখন আমার কথায় ফিরে আসি। গ্রামে মন টিকছিল না। এই সময় আর এক গুরুভার কাঁধে এল। বাড়ী থেকে খানিক দূরে

হাড়োয়া থানার কাছে, একটি বাড়ীতে নজর-বন্দী করে রাখা হয়েছে বিধু সেনকে। সে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার আসামী ছিল, কিন্তু বয়সে খুব ছোট এবং তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণাদি না পেয়ে তাকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয়। আমি গ্রামের বাড়ীতে এসেছি জানতে পেরে সে খবর পাঠালো যে চাঁটগার এক লোহার দোকানদারের কাছে সুটকেস বোঝাই ডাইরী রাখা আছে। সেগুলি যেন নিয়ে আসা হয়। আর সম্ভব হলে কোলকাতার সেন্টপল কলেজ হোস্টেলে অমৃতাঙ্কুর সেনের কাছে যেন পৌঁছে দেয়া হয়। অমৃতাঙ্কুর বিধু সেনের খুড়তুতো ভাই।

ডাইরীগুলো খুবই জরুরী এবং অস্ত্রাগার লুন্ঠনের ইতিহাস আনুপূর্বিক লিখিত আছে এই ডাইরীতে, কাজেই, এগুলি উদ্ধার করা খুবই প্রয়োজন। তাই কালবিলম্ব না করে চাঁটগায় রওনা হলেম। চাঁটগায় লোহার দোকানদার সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর সুটকেসটি আমার হাতে তুলে দিলো।

কলকাতায় যাওয়ার পথে বিপদ কম নয়। তখনও যাত্রীদের মধ্যে মাঝে মাঝে তল্লাশী চলছে। পুলিশ যদি সন্দেহ বশে আমার জিনিষ তল্লাশী করে আর ডায়রীগুলো ধরা পড়ে, তাহলে নির্ঘাৎ দ্বীপান্তর বাস। একজন বন্ধু বুদ্ধি দিলেন যে, সুটকেশটি ফেলে দিয়ে একটি লুঙ্গির মধ্যে কাগজ জড়িয়ে বেশ খানিকটা শুঁটকী মাছ আর তার মধ্যে ডাইরী বেঁধে নিয়ে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় লুঙ্গি পরে উঠে পড়। আর ট্রেনের কামরায় বাঙ্কের উপরে সটান শুয়ে পড়ে সফর করো, যমেও তোমার কাছে ঘেঁষবে না।

বন্ধুর কথামতো কাজ করলাম। তবে চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত স্টীমারে উদ্বেগের মধ্যে কাল কাটাতে হয়েছে।

সংকট বাধলো কলকাতায় গিয়ে। এই ডাইরী নিয়ে রাখবো কোথায়? কড়েয়া রোডের বাসায় রাখা নিরাপদ নয়। সেখানে পুলিশের শ্যোন দৃষ্টি। শ্যামবাজারের হর্ষ ঘোষের বাসা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে শিয়ালদহ থেকে রওয়ানা হলাম হর্ষ ঘোষের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সিচালক শুঁটকী মাছের গন্ধে যেন পাগল হয়ে

উঠলো। লুঙ্গি পরা দেখে ও প্রথমে নাক সিটকিয়েছিল, তবু শুঁটকীর জন্য আমাকে খুব খাতির করে বললো: মিয়া সাহেব, থোড়া শুঁটকী মাছ যদি দেন খুব সরফরাজ হব। ওকে দিতে সম্মত হওয়ায় সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে আমাকে তোয়াজ করতে শুরু করলো।

হর্ষ ঘোষের বাড়ীর মধ্যে আমার অবাধ আনাগোনা। কিন্তু এবার আমায় দেখে ওর মা যেন আঁতকে উঠলেন। ওমা, কোথাকার অজানা-অচেনা মানুষ হুট করে ঘরে ঢুকলো। বলি তোমার আক্কেলটা কি বাপু!

বুঝতে পারলাম, আমার লুঙ্গি ও লুঙ্গি দিয়ে জড়ানো পুঁটলিটাই যত বিপদের মূল। রাস্তায় যে লুঙ্গি বিপদ কাটালো, বাড়ীতে সেই লুঙ্গি বুঝি বিপদ ঘটালো। কিন্তু এই অবস্থা বেশীক্ষণ থাকলো না। মা কলতলা থেকে ঘরে এসে আমার চেহারা দেখে গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে বললেন, ওমা, একি অবস্থা তোমার। একেবারে গেঁয়ো ভূত হয়ে এসেছো। তা কোথেকে এলে?

আমি বললাম, শুঁটকী মাছগুলো আগে রাখুন ত, তারপর সব বলছি। হর্ষ বাজারে গেছে আগেই খবর পেয়েছিলাম। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণে ক্ষুধায় আমার পেটের মধ্যে যেন ইঁদুরের বক্সিং শুরু হয়েছে। ওর মাকে বললাম, মা আমার জন্য একটু চা-জলখাবার ব্যবস্থা করুন। ততক্ষণে আমি স্নানটা সেরে নিয়ে কাপড় বদলে ফেলি।

গোসল সেরে নিয়ে, কাপড় বদলে চা খেতে বসেছি, এমন সময় হর্ষ হৈ চৈ করতে করতে ঘরে ঢুকলো। "না, আর বাঁচা যাবে না। যে চালের দাম গত সপ্তাহে সাড়ে চার টাকা মন ছিল, আজ একেবারে ছয়টাকা মন হেঁকে বসলো। ব্যাটারা পেয়েছে কি।" বুঝলাম হর্ষ রীতিমত সংসারী, টাকা আনা পাইয়ের হিসাব রাখতে শিখেছে।

আমায় দেখে বকবকানি থামিয়ে বললঃ কিরে, ব্যাপার কি? কোথেকে এলি?

ওকে সব ব্যাপার খুলে বললাম। ডাইরীগুলো নিরাপদে রাখতে বলে তখনকার মত বিদায় নিলাম। বলে এলাম, সন্ধ্যায় অফিসে

দেখা হবে। অফিস মানে "ফরোয়ার্ড" অফিস। হর্ষ আমার সঙ্গে ফরোয়ার্ডে চাকরি করে। আমরা দুজনেই সাব-এডিটর।

কড়েয়া রোডের বাসায় গিয়ে দেখি একখানা জরুরী পত্র এসে পড়ে আছে। লিখেছেন দিদি। দিদি অর্থাৎ কল্যাণী দাস। ইনি গভর্নর জ্যাকসনকে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে গুলি করতে গিয়ে ধরা পড়া বীনা দাসের (পরে বীনা ভৌমিক) বড় বোন। ইনিও হোসনে আরার সঙ্গে রাজ-বন্দিনী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিকেলে একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জে দেখা করতে গেলাম। ওঁর কাছে খবর পেলাম যে মুকুল ভট্টাচার্য নামে আমাদের দলের একটি ছেলে কয়েকটি রিভলভারের সন্ধান এনেছে। যদি কিনতে চাই, তাহলে পরখ করে দেখতে পারি।

অস্ত্রের প্রয়োজন অনেক। টাকাও আছে। কাজেই রাজী হয়ে গেলাম। ঠিক করে এলাম পরের দিন বালীগঞ্জ রেল স্টেশনে মুকুল আমার সঙ্গে দেখা করবে, তারপর পরের প্রোগ্রাম ঠিক হবে।

পরের দিন মুকুলের সঙ্গে যথাস্থানে দেখা হলো। সে আমাকে কলকাতায় প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীর দোতলায় নিয়ে তুললো।

মুকুল বলেছিল, এই বাড়ীর নীচতলার বাসিন্দা হল জ্বালানী কাঠের দোকানদার। আর উপরতলায় থাকে এক মুসলমান ফলওয়ালা। শিয়ালদহের মোড়ে ওর দোকান আছে। এই দোকানী কিছু জিনিস এনেছে উপজাতি এলাকা থেকে। এখন দরে পোষালে আমরা নিতে পারি।

আমরা আলাপ করছি। এমন সময় পাশের ঘর থেকে সেই ফলওয়ালা আমাদের সামনে এসে বেশ খাতির করে বললো, আদাব আরজ, বাবুজী।

লোকটা আধা বয়েসী, দাড়ি আছে। অবশ্য তা মেহেদী দিয়ে লালচে করে রেখেছে। মাথায় লাল রঙের ফেজ (তুর্কী টুপী) আর কাঁধে একটা ছাপা রুমাল জাতীয় কাপড়। মুকুল কথা পাড়লো, জিনিসগুলো আমাদের যদি দিতে চান তাহলে দেখাতে হবে। পরে দাম ঠিক করা যাবে।

লোকটি দেখাতে রাজী হলো। বলল, এখানে একটাই আছে। এখুনি দেখাচ্ছি। এই বলে সে ভিতরে গিয়ে কাগজে মোড়া একটা আনকোরা নতুন রিভলভার এনে আমার হাতে দিল। বলল ঃ বাবুজী আগে এর কিমত বহুত ছিল, লেকিন এখন সরকার কি এক কানুন জারী করেছে, ধরা পড়লেই একেবারে ফাঁসী নয় কালাপানী। বুঝলাম ও নতুন সুপরেসান অফ টেরোরিস্ট আউটরেজেস অরডিনেন্স-এর (সন্ত্রাস-বাদ দমন) কথা বলছে। যাহোক, ঠিক হলো, আটটি রিভলভার ও চারটি আট চেম্বারের পিস্তল এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে একশ করে গুলি দেবে। মোট তিন হাজার টাকায় রফা হলো। দেনা পাওনার তারিখ ঠিক করে এবং নগদ সামান্য কিছু টাকা অগ্রিম বায়না করে ওখান থেকে বিদায় নিলাম।

রাত্রে "ফরোয়ার্ড" অফিসে গিয়েছি। বন্ধু নির্মল সেন (কম্যুনিস্ট নেতা শ্রী নিরঞ্জন সেনের ছোট ভাই) বললো ঃ কয়েকদিন একটু ঘোরা-ফেরা বন্ধ কর। পুলিশ হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মীর কর্মীদের সন্ধানে হন্নে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলার বাইরে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে। ইউপিতে অর্জুন অরোরা, বাজপেয়ী ও লীলা কাম্বলেকে গ্রেফতার করেছে। কি এক ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে ওদের ধরেছে।

কথাটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু যথাসম্ভব চেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুই জানলি কি করে? খবরের কাগজে তো বেরোয়নি।

"আমাদের ইন্টেলিজেন্স-এর ঘোষ একটু আগে বলে গেল। নীহার ঘোষ স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা ছিল। কিন্তু আমাদের এজেন্ট হিসাবে সে কাজ করতো। পুলিশকে সে যে তথ্য সরবরাহ করতো তার চেয়ে অনেক বেশী খবর আমাদের জানাতো। কাজেই তার কথা অবিশ্বাস করার মত নয়।"

নতুন করে দুর্ভাবনায় পড়লাম। ব্যাংক ডাকাতির কথা বলছে। কিন্তু আসলে ওটা ডাকাতি ছিল না। বরং দন্ডবিধিতে ওটাকে প্রতারণা বলা চলে। ব্যাপারটা খুলেই বলি। সারা ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির নেতৃত্বে। কংগ্রেসের

অহিংস অসহযোগে যে কিছু হবে না, তা এই দল উপলব্ধি করেছিল। তবুও কংগ্রেসকে যথাসম্ভব খোলস হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। যাহোক, এত বড় পরিকল্পনার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। সে জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের দায়িত্বশীল কর্মচারীদের ভেতর থেকে কিছু কিছু কর্মী রিক্রুট করা হয়েছিল। একটি বৃটিশ ব্যাংকেও কয়েকজন কর্মী ছিল। ব্যাংকটি ছিল ডালহৌসী স্কোয়ারের পূর্ব দিকে। এই ব্যাংকে এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর হিসাব থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলতে ওদের এক মাড়োয়ারী দারোয়ান আসে। দারোয়ানকে টোকেন দিয়ে তাকে দেড় ঘন্টা পরে আসতো বলা হয়। ইতিমধ্যে চেকটি চলে যায় বাইরে। আপার সার্কুলার রোডে এক কলেজে একজন কেমিস্ট ছিলেন আমাদের লোক। তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় টাকার অংকটা বেমালুম বদলে ৫০ হাজারের বদলে আড়াই লাখ করে দিলেন। এবং দারোয়ান তার টাকা নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল ঘটনাটা প্রায় দুইমাস টাকার মালিকের নজরে পড়েনি যখন সে জানতে পারলো তখন সারা শহরে হুলস্থূল পড়ে গেল। পুলিশ সন্দেহ করলো এটা সন্ত্রাসবাদীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডাকাতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ওটার নাম দিল ব্যাংক প্রতারণা মামলা।

১৯৩৪ সাল। ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি অনেক রাত্রে অফিস থেকে ফিরে নাকে-মুখে গুঁজে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি কিছু হবে, কোন বিপদ আসবে তা মনে হয়নি। তাই নিশ্চিন্তেই ঘুমিয়ে পড়ি। শেষ রাতে ঘন ঘন দরজায় ধাক্কা পড়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। লেপ ছেড়ে বিরক্ত হয়ে রুক্ষ কন্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম: কে? ততোধিক রুক্ষ কন্ঠে জবাব এল: শীগগীর দরজা খুলুন। পুলিশ।

পুলিশ! একটু ঘাবড়ে গেলাম। তাহলে নির্মলের কথাই ঠিক পুলিশ জাল ফেলতে শুরু করেছে। বিলম্ব করে লাভ নেই। গায়ে খদ্দরের মোটা চাদরটা জড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দিলাম। দরজা খুলে দেখলাম এলাহী কান্ড। রাস্তায় পুলিশ গিজগিজ করছে। বাড়ীর চৌহদ্দি তারা ঘিরে ফেলেছে। আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ বিপুল দেহী, প্রখর শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন স্পেশাল ব্রাঞ্চের সহকারী

কমিশনার ইয়াহিয়া মুর্শেদী। মুর্শেদী আমার খুবই পরিচিত। শেরে বাংলার আত্মীয় এবং আমার কয়েকজন বন্ধুর তিনি আপনজন। কিন্তু তাহলে কি হয়। পুলিশের আবার শ্বশুরবাড়ী। এদের কাছে আত্মীয় বন্ধুর কোন দাম নেই।

মুর্শেদী এগিয়ে এসে বলেন: শীগগির আমার দেহ তল্লাশী করে ফেলুন। তারপর আমি ভিতরে ঢুকবো। আপনার বাড়ীখানা তল্লাশী করতে হবে। এই দেখুন ওয়ারেন্ট। তিনি পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে দেখালেন।

আমি মুর্শেদীকে যথারীতি তল্লাশী করলাম। ইদানীং পুলিশ অনেকের ঘরে বোমা-রিভলভার চুরি করে রেখে দিয়ে তারপর পাকড়াও করে। ওদের বিশ্বাস নেই।

পুলিশ দলকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে মুর্শেদী একাই ঘরের মধ্যে এসে বললেন: আপত্তিকর কিছু থাকেত তাড়াতাড়ি আমাকে চুপি চুপি দিয়ে দিন।

ওঁর কথায় মনে হল এ আর এক ফাঁদ হয়ত। বললাম: আপত্তিকর কিছুই নেই। খুঁজে দেখতে পারেন।

মুর্শেদী সাহেব আর কিছু না বলে আমার বিছানা তোশক বালিশ প্রভৃতি উল্টাতে লাগলেন। হঠাৎ তোশকের তলা থেকে দুটো বুলেট বেরিয়ে এল। বুলেট দুটো হাতে নিয়ে মুর্শেদী তাড়াতাড়ি তাঁর প্যান্টের পকেটে পুরে ফেললেন। এবং আমার দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন: কেয়ারলেস ইডিঅট।

আমার বুকের মধ্যে ততক্ষণে তড়পানি শুরু হয়েছে। এবার নির্ঘাত লম্বা মেয়াদের শ্রীঘর বাস।

মুর্শেদী তাঁর পুলিশ বাহিনীকে ভিতরে ডাকলেন। তারা ঘরটা আতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগল। কিন্তু আর কিছু পাওয়া গেল না। তল্লাশীর পর সার্চলিষ্ট তৈরী করতে বসলেন মুর্শেদী সাহেব। আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। হয়ত তালিকায় লেখা হবে গুলি পাওয়া গেছে, লোকটা সাংঘাতিক বিপ্লবী। না জানি আরও কত কি

হয়ত লিখে ফেলবে। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, ওসব কিছুই লেখা হল না। বরং লেখা হল, (নাথিং ইনক্রিমিনেটিং ফাউণ্ড) আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেল না।

দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মনে হল, এবার তাহলে বেঁচে গেলাম। ধরপাকড়ের ঝামেলাটা কেটে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার জল্পনা-কল্পনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে মুর্শেদী সাহেব বললেন, এবার কাপড়-চোপড় বিছানাপত্র যা নেবার নিন, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

প্রশ্ন করলাম, তল্লাশীতে কিছু পাওয়া গেল না লিখলেন, তবুও কেন যেতে হবে?

মুর্শেদী সাহেব হেসে বললেন, তল্লাশীটা একটা মামুলী ব্যাপার। আসল ব্যাপার হল, আন্তঃপ্রাদেশিক একটা মামলায় আপনাকে গ্রেফ-তারের নির্দেশ এসেছে কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্স থেকে।

অগত্যা সামান্য খান দুই কাপড় ও গায়ের চাদর নিয়ে ওদের সঙেগ পুলিশের গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। গাড়ীতে বসে ভাবতে লাগলাম বাড়ীর কথা। দুবছর আগে স্ত্রী জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে: সম্প্রতি একটি পুত্রসন্তানও জন্মেছে। নবজাত শিশুর কোমল মুখখানি বার বার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। ভেসে উঠল স্ত্রীর সহাস্য অথচ শপথ-দৃপ্ত মুখমণ্ডল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? পরক্ষণেই মনে পড়ল কোটি কোটি শৃংখলিত মানুষের কথা। ক্ষুধিত ভারতের কোটি কোটি মানুষের যাতনার কথা। মনের সকল দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেললাম।

গাড়ী ইলিশিয়াম রোডের সেই কুখ্যাত গোয়েন্দা সদর দফতরে ঢুকলো। পুলিশ প্রহরায় দফতরের ভিতরে একটি প্রকাণ্ড হলঘরে ঢুকলাম। সেখানে দেখি নরক গুলজার। আমার সতীর্থ অনেকেই সেখানে বসে আছে। বুঝতে বাকী রইল না যে, এরা সবাই আমার মত রাজ-অতিথি হয়ে এসেছে। দেখলাম, ইউ-পি থেকে এসেছে অর্জুন অরোরা, বাজপেয়ী, কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে কুমারী লীলা কাম্বলে; আসাম থেকে অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, মিস নাগ ও তাঁর ভাই; বরিশাল থেকে মিস শান্তিসুধা ঘোষ, কলকাতা থেকে হিন্দু-

ষ্টান স্ট্যাণ্ডার্ডের সহকারী সম্পাদক সত্যনাথ মজুমদার, মিসেস সুলতা কর ; ফরিদপুর থেকে সুধীর রায় এবং আরো অনেকে।

আমরা মুখ চাওয়া-চাউই করলাম। কিন্তু কেউ কোন কথা বললাম না। এমন ভাব দেখাতে হল যেন, কেউ কাউকে চিনি না। পরিচয়ের সূত্র পেলে কি আর রক্ষা আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে এক এক করে সবাইকে ডেকে নিয়ে গেল অন্য ঘরে কাকে কোথায় নিয়ে গেল, তা জানা গেল না। একটু পরে আমাকে একজন অফিসার ডেকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, এবার নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ চলবে।

আমাকে যে অফিসারটি নিয়ে গেল, জানতে পারলাম, তার নাম বিজয় দাস। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ঝানু ইন্সপেকক্টর। বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারে নাকি ওর জুড়ি নেই। কাজেই ওর পাল্লায় পড়াটা দুর্ভাগ্য মনে হল। কিন্তু মৃত্যুভয় যাদের সংকল্পচ্যুত করতে পারে না তাদের উপর অত্যাচার করে কি ওরা সফল হতে পারবে?

ছোট্ট একটা কামরায় একটা ছোট টেবিল। দুধারে দুখানা কাঠের চেয়ার। একখানিতে আমাকে বসতে বলল বিজয় দাস। এবং নিজে অপর খানিতে বসল। সামনে কিছু সাদা কাগজ ও একটি পেন্সিল। বুঝলাম বিবৃতি লেখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

বিজয় দাস অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সাথে বলল, আপনার লেখা আমি নিয়মিত পড়ি। বেশ ভাল লাগে। আপনি রাজনীতি না করে যদি শুধু সাহিত্য করেন তাহলে পরে একজন ভাল লেখক হতে পারবেন।

বুঝলাম, বরফ গলানোর চেষ্টা। বললাম, রাজনীতি করি একথা আপনাকে কে বলল? বিজয় এ কথার জবাব না দিয়েই বলল, আর রাজনীতিই যদি করতে হয়, তাহলে কংগ্রেসের নীতিইত গ্রহণ করা উচিত। দেখুনত, হিংসা নেই বিদ্বেষ নেই। কত পবিত্র তাদের মত ও পথ।

আমি একটু ঝাঁঝাল কন্ঠে জবাব দেই, তাহলে গান্ধীজীকে কেন

বারবার জেলে পুরছেন আপনার প্রভুরা। আর আপনারাই বা কেন তাদের পিছনে হন্যে কুকুরের মত ছুটে বেড়ান।

সুচতুর বিজয় রাগলো না। হাসতে হাসতে বলল: না ছুটলে যে চাকরি থাকে না। কাজ দেখাতে হবেত। কাজ নেইত চাকরিও নেই।

এমন সময় একজন সেপাই বড় এক প্লেটে করে কিছু লুচি, তরকারী, রসগোল্লা ও সন্দেশ এবং এক গ্লাস পানি সামনে রেখে চলে গেল।

বিজয় দাস অত্যন্ত বিনয়ের সুরে বললো: সকাল থেকে আপনার কিছু খাওয়া হয়নি। নিন, এটা খেয়ে নিন। আমিও দ্বিরুক্তি না করে খাদ্যগুলি গলাধঃকরণ করলাম। খাওয়ার পর বারান্দায় হাত ধুতে গিয়ে দেখি কামরার বাইরে অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী। মনে হল, পাশাপাশি সব কামরার সামনে এমনি পাহারা বসানো হয়েছে। কোন দিকে বেশী না তাকিয়ে আবার নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করলাম।

এবার বিজয় দাস আমাকে একটার পর একটা প্রশ্নবাণে অতীষ্ঠ করে তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন: ১৯৩২ সালে আপনি দিল্লীর কাছে শাহদারা ষ্টেশনে ধরা পড়েছিলেন মনে আছে?

"হ্যাঁ।"

"কেন ধরা পড়েছিলেন?"

"আপনারা ধরেছিলেন বলে ধরা পড়েছিলাম।"

আমার এই জবাব তাকে খুশী করতে পারলো না। তাই আবার জিজ্ঞাসা করল: কেন গিয়েছিলেন দিল্লী—কারো কাছে গিয়েছিলেন?

আমি জবাব দিলাম: দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম; কারুর কাছে যাওয়ার জন্য নয়।

"সীমান্তের কোনও নেতার বাড়ীতে ছিলেন কি?"

"না, একটা হোটেলে ছিলাম। তাও দু'দিনের জন্য। দু'দিন পরে আগ্রার তাজমহল দেখবার জন্য দিল্লী রওয়ানা দেই। কিন্তু শাহদারায় পুলিশ আমায় গ্রেফতার করে।

"কি কারণে গ্রেফতার করেছিল তা কি আপনাকে পুলিশ জানিয়েছিল ?"

"না, প্রথমে জানায়নি। পরে দিল্লী জেলে আমাকে জানানো হয় যে নিবর্তনমূলক আটক আইনে আমায় গ্রেফতার করা হয়েছে।"

"কতদিন জেলে আটক ছিলেন ?"

"সেত আপনাদের ফাইলেই আছে আমায় নতুন করে কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?"

বিজয় দাস বললেন : "আমাদের ফাইলে আছে তিনমাস, কিন্তু দিল্লীর রিপোর্টে রয়েছে চারমাস, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।"

"তিন মাস কয়েকদিন হবে। কিন্তু এর সঙ্গে আজকের ঘটনার সম্পর্ক কি ?" আমি বিরক্ত হয়ে বলি।

"বুঝলেন না, আপনারা সাংবাদিকরা কোন নতুন ঘটনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পূর্ববর্তী ঘটনার উল্লেখ করে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন, আমরাও তেমনি বর্তমান ঘটনার জড় খুঁজি পূর্ববর্তী ঘটনার মধ্যে। যা হোক, আপনি এখানে আসার পর হলঘরে যাদের দেখেছেন, তাদের কাউকে কি চেনেন ?"

বিজয় দাস এইবার আমায় সত্যিই বিপদে ফেলল দেখছি। চিনি ত সবাইকে। কিন্তু চিনি না বললে প্রমাণ পাবে না। তবু সত্যনাথের বেলায় ত সে কথা বলা চলে না। কারণ সাংবাদিক বন্ধু সে। তার উপর প্রায়ই ওর সঙ্গে সিনেমায় প্রেস 'শো' দেখি। অস্বীকার করলে নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাব। কাজেই বললাম : একজনকে চিনি ; তিনি সাংবাদিক সত্যনাথ মজুমদার। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সহকারী সম্পাদক।

এবার বিজয় দাস যেন একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সূত্র আবিষ্কার করে বসলো। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো : ওর সঙ্গে মিশে কতদিন রাজনীতি করছেন ?

"ওর সঙ্গে কেন, কারুর সঙ্গে রাজনীতি করি না। তাছাড়া ও রাজনীতি করে বলে আমার জানা নেই।"

এবার বিজয় দাস যেন একটু হতাশ হয়। আবার জিজ্ঞাসা করে। "আপনার স্ত্রী এখন কোথায়?"

"আমার গ্রামের বাড়ীতে।"

"তিনি অনেকদিন জেলে ছিলেন। কেন তাঁর জেল হয়েছিল?"

আমি জবাব দেই: "গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাই।"

"এখন তিনি কি রাজনীতি করেন?"

"না, শিশু পালন করেন।"

এবার বিজয় দাস তার প্রশ্নের ধারা পাল্টালো। একটু কড়া মেজাজে বললো: মেছুয়াবাজার অস্ত্রপ্রাপ্তির ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?"

"না, অস্ত্রপ্রাপ্তির ঘটনাও আমি শুনিনি।"

"লীলা কাম্বলেকে আপনি যে পত্র লিখেছেন তা ধরা পড়েছে। কি লিখেছেন তাতে?"

এবার আমার মেজাজ গরম হল। বললাম, এমন (আন-ইনটেলিজেন্ট) প্রশ্ন ইনটেলিজেন্স বিভাগের লোক করতে পারে, তা এই প্রথম দেখলাম। আমি যদি পত্র লিখেই থাকি, আর তা যদি আপনাদের হাতে ধরা পড়ে থাকে, কি লিখেছি, তাতেইত দেখতে পাবেন। কিন্তু পত্র লেখাত দূরের কথা, তাকে আমি চিনি না, তার নামও কখনো শুনিনি।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। অফিসের ফাইলপত্র গুটীয়ে অফিসারেরা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল। বিজয় দাসও কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বললো: আজ আর নয়, কাল আবার কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। রাত্রে পার্ক স্ট্রীট থানা হাজতে আপনার থাকবার জায়গা করা হয়েছে।

থানায় হাজতে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে শুনে আমি একেবারে আঁতকে উঠলাম। "বলেন কি? হাজতে চোর-ডাকাতের সঙ্গে থাকতে হবে?"

বিজয় দাস হাসিমুখেই বললেন: "না না, আপনার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না। আপনি একাই থাকবেন।"

সন্ধ্যার দিকে কয়েদী গাড়ীতে করে আমাদের একদলকে বিভিন্ন থানা হাজতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হল। আমাদের সংগে চললেন জাঁদরেল ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল মণ্ডল। দেহের দিক থেকে দূর্বল, কিন্তু ক্রূরতার দিক থেকে হায়েনার সংগে ওর তুলনা করা চলে। বৃটিশ সরকার ওকে যেন তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার আম-মোক্তারনামা দিয়েছে। রাস্তায় যেতে যেতে তিনি আমাদের বুঝাতে লাগলেন ঃ কেন মিছামিছি আপনারা নিজেদের জীবন নষ্ট করছেন। সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন, দেখবেন আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। ভাল চাকুরী, বিদেশ ভ্রমণ, যা আপনারা চান, তাই পাবেন। বোমা পিস্তল দিয়ে কি এতবড় বৃটিশ শক্তিকে কাবু করতে পারবেন? তারপর একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন ঃ পাগল ছেলে সব!

আমাদের সংগে ছিল সুধীর রায়। সে একটু উষ্ণ হয়ে বলল ঃ আপনার উপদেশ খয়রাত বন্ধ করবেন কি? আমরাত রীতিমত বিরক্ত হচ্ছি আপনার বকবকানি শুনে।

প্রফুল্ল বাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন ঃ বেশ আমি আর কথা বলব না। কিন্তু এই ধূর্ত হায়েনা যে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে আমাদের উপরে, তা তার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলাম।

দেখতে দেখতে কয়েদী গাড়ী পাক ষ্ট্রীট থানার সামনে এসে থামলো। প্রফুল্ল বাবু আমাকে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার-এর হাতে সঁপে দিয়ে বললেন, আজ রাতে এঁকে এখানে রাখবেন, ও খাওয়া দাওয়ার একটু ভাল বন্দোবস্ত করবেন।

প্রফুল্ল বাবু চলে যাওয়ার সংগে সংগে অফিসারটি যথেষ্ট সৌজন্য সহকারে আমাকে বসবার জন্য একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। আমার খাওয়ার ব্যাপারে তিনি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর অফিসের সামনে একটা হাজত ঘরে আমায় ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন ঃ একটা লোহার খাট ও দুখানা কম্বল আছে। এই খাটে গতরাতে মিস লীলা কাম্বলেকে রাখা হয়েছিল! আশাকরি আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

'বন্দীর আবার সুবিধা অসুবিধা। যেমন রাখেন তেমনি থাকি।" হাসতে হাসতে জবাব দিলাম।

হাজতটা নিতান্ত নরক নয়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সারা দিনের ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন। বিশ্রাম নেয়ার জন্য খাটের উপর গা এলিয়ে দিলাম। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

রাত প্রায় দশটার সময় সেপাইয়ের ডাকাডকিতে ঘুম ভাঙ্গলো। দেখলাম কাঁসার এক বিরাট থালায় খানিকটা ভাত ও বাটিতে ডাল নিয়ে এক উড়িয়া ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে। ঘট ঘটাং করে হাজতের দরজা খুলে গেল। উড়িয়া ঠাকুর ভাতের থালা মেঝেয় রেখে 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেল। তখনি টিনের মগে করে এক মগ পানি এনে ভাতের থালার পাশে রেখে হাজত থেকে বেরিয়ে গেল।

সেপাই লোহার দরজা সশব্দে বন্ধ করে তালা লাগাতে লাগাতে বলল ঃ খেয়ে নিন বাবু। খাওয়া হয়ে গেলে থালা বাটি একপাশে রেখে দিবেন, কাল সকালে ঠাকুর নিয়ে যাবে।

সারাদিন পেটে ভাত পড়েনি। তাই ঠাকুরের ভাত, ডাল তরকা-রিতে যেন অমৃতের স্বাদ পেলাম।

রাতে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম। আমাদের কাজ এত গোপনে চলছিল, অথচ কি করে সব ফাঁস হয়ে গেল। উপরের স্তরের কয়েকজন ছাড়া আর কেউত জানে না এই সর্ব-ভারতীয় কার্যক্রমের কথা। নেতাদের মধ্যে কেউ কি বৃটিশ সরকারের কুকুরদের লোভের ফাঁদে পা দিয়েছে, না সন্দেহভাজন লোকদের নিতান্তই সন্দেহের বশে ধরেছে? হতে পারে, পুলিশের হাতে কোন তথ্যই নেই। তবে ওরা ভাঁওতা দিয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারে। সুযোগ পেলেই কমরেডদের হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। সবাই যেন মুখে তালা লাগায়

ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো আমার বাড়ীর কথা। আমার স্ত্রী ও আট মাসের প্রথম শিশু সন্তানের কথা। পল্লীর বাড়ীতে ওরা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে। পড়শীরা আমাদের বয়কট করেছে। কারণ সমাজে আমরা পতিত। আমার স্ত্রী বিপ্লবী, সে জেল খাটে।

আমার মনে হল, দেশকে মুক্ত করার জন্য যখন মৃত্যুকে জয় করার শপথ নিয়েছি, তখন এসব বিপদ-আপদের কথা ভেবে লাভ কি? আসুক আঘাত, আসুক বিপদ, বিচলিত হওয়া আমাদের ধর্ম নয়।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল আটটার দিকে "দরোজার" ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো। আজব শব্দ এই "দরোজা"। যে সেপাই হাজত ঘরের পাহারায় থাকে, পুলিশী পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'দরোজা'। যাহোক 'দরোজা' জানালো, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধোয়া ও গোসল করা শেষ করে নিতে হবে। নাশতা সেরেই কোর্টে যেতে হবে। আজ আমাদের আদালতে হাজির করার দিন।

নাশতা হল খান চারেক পুরী ও ছটাক খানেক আলুর তরকারি। একটা টিনের মগে পানি, আর একটি মগে কালো মিশমিশে চা। এই উপাদেয় নাশতা এক রকম জোর করে গলা দিয়ে পেটের মধ্যে নামিয়ে দিলাম। পেটত মুখের রুচির তোয়াক্কা করে না। খালি হলেই সে ককিয়ে জ্বলতে শুরু করে। চা পেটে ঢুকিয়ে সারতে পারিনি, অমনি পুলিশের ভ্যান এল—আমাদের যাবার ডাক পড়ল।

যাবার সময় পার্ক স্ট্রীটের ভারপ্রাপ্ত অফিসার কানের কাছে মুখ এনে বলল: বিশেষ যত্ন করতে পারিনি, ক্ষমা করবেন স্যার।

সহানুভূতিশীল অফিসারটির হাতে ঈষৎচাপ দিয়ে বললাম: 'বেঁচে থাকলে দেখা হবে ভাই।" ওর চোখ দুটো যেন ছলছল করে উঠলো। মনে হল, হয়তবা ও আমাদের সহকর্মী।

পুলিশ ভ্যানের মধ্যে ঢুকেই দেখি বসে আছেন সুলতা দি, শান্তি-সুধা ও সত্যনাথ। সুলতা দি আমার স্ত্রীর সঙ্গে এর আগেও জেলে ছিলেন। নিজে অধ্যাপিকা। স্বামী মিঃ কর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। ভ্যানে ড্রাইভারের পাশে বসেছেন ইনস্পেক্টর প্রফুল্ল মণ্ডল। ভিতরে আমরা চারজন। বন্ধ গাড়ী, কাজেই পুলিশ ও ড্রাইভার কাউকে দেখা যায় না। এই সুযোগে আমরা কিছুটা আলাপ আলোচনা সেরে নিলাম। আলাপে জানা গেল যে, পুলিশ প্রধানত হিন্দুস্তান রিপাব-লিকান আর্মির মূল সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্যাংক

প্রতারণা মামলাকে তত বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে না। এর ফলে হয়ত কল-কাতায় দল গড়ার প্রমাণ না পেলে রেহাই পেয়ে যেতে পারে। তবে আমরা সবাই ঠিক করলাম কোন অবস্থাতেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বেমালুম অস্বীকার করে যাব।

বেলা ১১টার সময় আমাদের আদালতে হাজির করা হল। জাঁদরেল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট লর্ড সিংহের পুত্র সুশীল সিংহ। ইংরেজ-দের খয়ের খাঁ। তাঁর কোর্টেই বিচার হবে। আসামীর কাঠগড়াটা আর এক জেলখানা, ছাদ পর্যন্ত উঁচু মোটা তারের ঘেরা, তার মধ্যে আমাদের প্রায় সত্তরজনকে ঠাসাঠাসি করে ঢুকানো হলো। সরকারী উকিল এক এক করে আমাদের নাম ডেকে হাজিরা দেয়ালো। ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের গ্রেফতারের কারণ কি তা সরকার পক্ষের উকিলকে জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে আদালত ভবন কেঁপে উঠলো। দরজা-জানালা দুমদাম করে বাজতে শুরু করলো। নবাব সিরাজু-দ্দৌলার আমলের বংশাল স্ট্রীটের বিরাটকায় ইমারত ভেঙে পড়ে আর কি! ভয়াবহ ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট এজলাস ছেড়ে ছুটে নীচে নেমে গেলেন এবং আমাদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সবাই বিশৃঙ্খলভাবে নীচে আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হলেম। এই হট্টগোলের মধ্যে সুধীর রায় বলে গেল: চললাম কমরেড, বিদায়।

ভূমিকম্প থামলো। কিন্তু ইনস্পেক্টর প্রফুল্ল মণ্ডলের হিসেব মিলল না। একজন কম আসামী নিয়ে তাকে ফিরতে হলো। আদালতে আমাদের সংগে দেখা করতে এসেছিলেন হাশেমী দাদা ও ক্ষিতীশ মামা অর্থাৎ সুরেন ঠাকুরের জামাই ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। হাশেমী দাদা বলে গেলেন যে, তিনি হয়ত শীগগীর খুলনা তালা এলাকায় যাবেন, কারন স্বরাজ্য পার্টি সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাজেই জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে কিছু কাজ করতে হবে। তবে আমাদের মামলা চালানোর জন্য উকিলদের একটা বড় দলকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ক্ষিতীশ মামা বললেন, হোসনে আরা জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে রজনী মুখার্জীকে পত্র লিখেছে। হয়ত এ সপ্তাহেই আসতে পারে। ওদের দেখা পেয়ে এবং স্ত্রীর সংবাদ পেয়ে একটু আশ্বস্ত হওয়া গেল।

আবার হাজতে ফেরার পালা। প্রফুল্ল মন্ডল কেবলই গজ গজ করে ঃ এবার নির্ঘাত আমার চাকরি যাবে মশাই। আসামী পালানো কি না তা কথা। কৈফিয়ত দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাবে।

সত্যনাথ হাসতে হাসতে বলল ঃ যদি চাকরি যায় তবে আমাদের সঙ্গে ঝুলে পড়বেন।

এই উপহাসটা মণ্ডলের পক্ষে মর্মান্তিক। তেরিয়া হয়ে বললে ঃ আপনারাই সুধীর বাবুকে পাচার করেছেন মশাই; এখন সাধু সেজে আমাকে ঠাট্টা-মস্করা করা হচ্ছে। আপনাদের আন্দামানে না পাঠাই ত আমার নাম প্রফুল্ল নয়।

মণ্ডলের এই নিষ্ফল আক্রোশে আমাদের মধ্যে হাসির রোল উঠলো। কিন্তু বেচারার কি আর করার আছে। নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিতে দিতে সে বললে ঃ ঠিক আছে ; বৃটিশের রাজত্ব ছেড়ে সে কোথায় যাবে দেখবো।

অল্পক্ষণের মধ্যে কয়েদী গাড়ী লালবাজার পুলিশের সদর দফতরে এসে দাঁড়াল। দরজা খোলার আগেই বিরাট এক পুলিশ বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। ওদের মাঝখান দিয়ে আমাদের নামিয়ে থানার দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল। দোতলার বিরাট হাজত ঘরের লৌহ কপাট সশব্দে খুলে গেল। মনে হল এক বিরাট রাক্ষসী মুখ ব্যাদান করে আমাদের গিলে খেতে উদ্যত।

প্রফুল্ল মণ্ডলের সঙ্গে আর একজন শ্বেতকায় অফিসার এসেছিল। সে আমাদের ভেতরে ঢোকার নির্দেশ দিয়ে বলল ঃ Feel yourselves comfortable Friends!

প্রফুল্ল বললে ঃ আপাতত কয়েকদিন এখানেই আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সবাই এখানে থাকবেন। অবশ্য এক একটি কামরায় চারজন থাকবেন। আর মেয়েদের প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হবে। তবে আপনাদের কোন অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন। আচ্ছা চলি, বলে প্রফুল্ল ও তার শেতাঙ্গ সঙ্গী চলে গেল। আমরা হাজতের মধ্যে অসহায় জীবের মত এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে একপাশে জড় হয়ে বসলাম।

ভাগ্য ভাল যে একই কামরায় আমরা যে চারজন থাকার সুযোগ পেলাম তার মধ্যে অন্ততঃ আর একজন বাঙ্গালী সাংবাদিক আমার বন্ধু সত্যনাথ মজুমদার, দু'জন যুক্ত প্রদেশের—একজন অর্জুন অরোরা এবং অপরজন পি, এন, বাজপেয়ী। এদের দু'জনের সঙ্গে দলীয় সম্পর্ক ছাড়া ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য তখনও গড়ে উঠেনি। কিন্তু সে সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেরী হলনা অরোরার সংগে। এমন ফুর্তিবাজ বেপরোয়া তরুণ খুব কম দেখা যায়। মুহূর্তে পরকে আপন করে নেয়ার ক্ষমতা তার অসাধারণ। তার চাঞ্চল্য ও রসিকতা আমাদের বন্দী জীবনের বিষাদময় সময়টুকুতে আনন্দে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। সত্যনাথ ও আমি কৃষ্ণকায়, আর অরোরাও ছিল কৃষ্ণকায়, কিন্তু বলিষ্ঠ গড়ন, মাথায় কোঁকড়া চুল, তাই ওকে আমরা নিগ্রো বলে ডাকতাম।

সন্ধ্যা হয়ে এল। একজায়গায় জড় হয়ে বসে খানিকক্ষণ লোয়ার চীৎপুর রোডের উপর ট্রাম ও বাসের উদ্দাম গতিবেগ দেখতে লাগলাম —দেখতে লাগলাম মানুষের চলমান স্রোত। কিন্তু এ জনস্রোত নিষ্প্রাণ এ মানুষেরা আত্মকেন্দ্রিক। ভারতের বন্ধন মুক্তির ডাক এদের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারেনি হয়ত। ১৯১৭ সালের আগে রাশিয়ার মানুষেরা কি এমনি প্রাণহীন সম্বিৎহীন ছিল? বেশীক্ষণ এমন আবোলতাবোল ভাবতে হল না। ঘ্যাচাং করে হাজত ঘরের দরজা খুলে গেল। আর চারজন কয়েদীর মাথায় এক গাদা কম্বল চাপিয়ে একজন বিহারী সিপাই ঢুকলো।

"বাবুজী, কম্বল আওর থালিয়া, মগ লিজিয়ে। হর আদমীকো চার চার কম্বল আওর এক থালিয়া এক মগ।" ঠিক যেন শেখানো বুলি। কথাগুলি বলে কম্বল ও থালা মগ মেঝেয় ফেলে রেখে আবার ঘট-ঘটাং করে কপাট বন্ধ করে চলে গেল।

আমরা কম্বলগুলি নিয়ে শয্যা পাততে লেগে গেলাম। সত্যনাথ বিছানা পাততে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলি ভাঁজতে লাগলো।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সেকি সহজ গান
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।

ভুলবনা আর সহযেতে
সেইঁ প্রাণমন উঠবে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

চারখানা করে কম্বল মাথাপিছু, জেল জীবনে রাজসিক ব্যাপার বলতে হবে। মেঝের উপর পাতা হলো একখানা, মাথার বালিশ হল একখানা এবং দু'খানা গায়ে দেয়ার জন্যে। বাথরুম আছে, তবে আবরুর পুরো বন্দোবস্ত নেই। তবে ওতে চলে যায়। এই হল আমাদের চারজনের গৃহস্থালী।

সন্ধ্যার পর আমাদের নৈশভোজের ব্যবস্থা করল থানা কর্তৃপক্ষ। এখানে উড়িয়া নয়, মেড়ুয়া অর্থাৎ বিহারী ঠাকুর দু'খানা করে চাপাতি ও খানিকটা নিরামিষ তরকারী দিয়ে গেল। ক্ষুধায় পেট জ্বলছিল, কাজেই অমৃত মনে করে সে অখাদ্য গলাধঃকরণ করলাম। ক্ষুধায় তৃপ্তি হলনা। তবে জ্বালাটা একটু কমলো।

রাত নয়টার দিকে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের টানা-হেঁচড়ার কষ্টে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল, এমন সময় এক বিহারী সিপাই লোহার কপাটে ঘা মেরে ডাকতে লাগলো ঃ বাবু হো, বাবু হো, জলদি উঠিয়ে—ওর চীৎকারে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম। দরজার কাছে আসতে ও হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল যে, তার সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে, ভূমিকম্পে পুরো বিহার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

ভূমিকম্প যে ভয়ানক রকমের হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সারা বিহার ধ্বংস হয়েছে, একথা অবিশ্বাস্য। তবুও তাকে বুঝালাম যে, অনেক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। দু'একদিন পরেই ঠিক খবর পাবে, আগে থেকে ঘাবড়িয়ে লাভ নেই। আমার প্রবোধ বাক্যে একটু শান্ত হয়ে ও চলে গেল।

আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ি। বন্ধুরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে আমি কেবল শুয়ে শুয়ে ভাবছি, ভূমিকম্পে বৃটেন কেন ধ্বংস হয় না। কেন ধ্বংস হয় না দিল্লীর বড়লাট প্রাসাদ। তা যদি হত ·· এমনি কত কি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙে। বন্ধুরা ততক্ষণে মুখহাত ধুয়ে তৈরী। অবশ্য চা তখনও আসেনি। চা-এর আশায় তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

যথাসময়ের অনেক পরে চা এল। দু টুকরো শুকনো পাউরুটি। চা নামক যে পদার্থটি এল তাকে চিরতার নির্যাস বলা চলে, তবুও তা খেতে হল, না খেলেত উপবাস দিতে হবে।

দুপুরের খানিক আগে খবর এল যে, পুলিশ কমিশনার সাহেব আসছেন আমাদের দেখতে। যেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকি। কথা শুনে হাসি পেল। এক কাপড়ে তিনদিন আছি। দাড়ি কামাবার সেফটী রেজারটাও আমাদের হাতে দিতে ওদের এত ভয়। ফলে, দাড়ি গজিয়ে সবাই কলিমদ্দি মিয়া হয়েছি, তবুও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে পুলিশ কমিশনার এলেন। এর নাম এখন মনে নেই, বোধহয় কলসন হবে। সঙ্গে তার অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ। তাদের মধ্যে একমাত্র মুর্শেদী সাহেবকে চিনলাম। ও'রা হাজতের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। প্রত্যেককে একই প্রশ্ন ঃ আপনাদের কেন ধরে এনেছে? আপনারা কেন বেআইনী কাজ করেছিলেন? আমাদের সবারই একই রকমের জওয়াব ঃ কেন ধরেছে জানিনা, আমরা বেআইনী কোন কাজ করিনি।

বাজপেয়ীকে বললেন, আপনি একজন জগৎবিখ্যাত মানুষের আত্মীয় বলে শুনেছি, কেন আপনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিলেন?

বাজপেয়ী একটু গম্ভীর ধরনের ছেলে। ততোধিক গম্ভীর হয়ে বললঃ আমিও জগতবিখ্যাত হতে চাই। কিন্তু তার পথ খুঁজছি। শুনে কমিশনারের মুখটা একটু বিকৃত হল। এবার তার দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। বললেন ঃ আপনিত একজন সাংবাদিক। তার ওপর মুসলমান। আপনিত অনেক গঠনমূলক কাজে সরকারকে সাহায্য করতে পারেন।

আমি বললাম ঃ গঠনমূলক কাজ করবার সুযোগ দিচ্ছেন কোথায়? বারবার জেলে আটকালে কি কাজ করা যায়? আপনার পুলিশকে

আমাদের পেছনে লাগাটা বন্ধ করতে বলুন, দেখবেন কত ভালকাজ আমরা করি।

আবার প্রশ্ন ঃ আপনারা কি মনে করেন যে, ভারত সরকার খুব দুর্বল? আপনারা কয়েকজন তরুণ বোমা রিভলভার দিয়ে ইংরেজদের তাড়াতে পারবেন?

আমি বুঝলাম, ঝানু ইংরেজ চালাকী করে আমাদের মনোভাব ও মতবাদ জেনে নিতে চায়, তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জবাব দেই ঃ

ওসব প্রশ্ন রাজনীতিকদের জন্য। আমরা কাউকে তাড়াতে চাইনে আর আমাদেরকেও যেন কেউ তাড়া করে না বেড়ায়।

কমিশনার সাহেব চলে যাওয়ার সময় বলে গেল, আপনাদের জেল হাজতে পাঠাবার হুকুম দিয়ে গেলাম; এখানে খুব কষ্টে আছেন বুঝতে পারছি। জেলে আপনারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আজই আপনাদের কাপড়-চোপড় দেয়া হবে এবং জেলে আপনারা মেট (খিদমতগার) পাবেন। ধোপা-নাপিতেরও ব্যবস্থা হবে।

আমি কমিশনার সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। হাসিমুখে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।

কমিশনার চলে যেতেই অর্জুন অরোরা ও সত্যনাথ ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলল ঃ ধন্যবাদ জানালি, কিন্তু ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে তা বুঝতে পারছিস? ওরা আমাদের আর ছাড়ছে না; বিচারে শাস্তি না হলেও বিনা বিচারে আটকে রাখবে।

ওদের অনুমান সত্য বলেই মনে হল। কাজে কাজেই হতাশায় আমরা সব মাথায় হাত দিয়ে বসলাম।

সন্ধ্যার পর এক আইরিশ সার্জেন্ট এল আমাদের খোঁজ-খবর নিতে। সে আমাদের হাজত ঘরের বাইরে একটা টুল নিয়ে জাঁকিয়ে বসলো। গল্প করতে করতে সে বলল, আপনাদের স্বাধীন হতে আর বেশী দেরী নেই। আমাদের নেতা ডি ভ্যালেরা বলেছেন, বিনা রক্তপাতে কোন দেশ স্বাধীন হয় না। আপনাদের নেতা সুভাষচন্দ্রও ঠিক এই কথা বলেন। কথায় কথায় সে জানালো যে, আমাদের প্রতি তার অনেক শ্রদ্ধা রয়েছে।

আমরা তার আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সাবধানের মার নেই, এই নীতি অনুসারে আমরা কোনরকম মন্তব্য করিনি।

পরদিন ভোরে পুলিশের হাঁকডাকে আমাদের ঘুম ভাঙলো। ওরা জানিয়ে গেল যে, একটু পরে আমাদের জেলখানায় পাঠানো হবে, কাজেই তাড়াতাড়ি যেন তৈরী হয়ে নেই।

আধ ঘন্টার মধ্যে চা এল। এক মগ কালো চা এবং দু'টুকরো শুকনো পাউরুটি। তেতো চা এবং হাড়ের মত শক্ত রুটি, তবুও সামান্য কিছু মুখে দিয়ে তৈরী হয়ে গেলাম। পুলিশ কম্বলগুলো সঙ্গে নিতে দিল না। ওরা বলল, জেলে আপনাদের ভাল কম্বল দিবে, হাজতের কম্বল হাজতেই থাক।

ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বৃহত্তর গণ্ডি এই প্রেসিডেন্সী জেল। সব বন্দী কয়েদীর আস্তানা এটা। অনেক রাজবন্দী ও দন্ডিত রাজনৈতিক বন্দী এই জেলখানা মশগুল করে রেখেছেন। জেলগেটে আমাদের নাম হাজিরা খাতায় তালিকাভূক্তির পর জেল সুপার কয়েকজন ওয়ার্ডার সঙ্গে করে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। যে সেলটা আমাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা নিতান্ত ছোট নয়; বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও ছিল। দেখলাম, আমাদের গৃহস্থালী আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কম্বল, থালা, মগ, গোসলখানার জন্য পানির একটি পাত্র এবং বালতি। আতিথেয়তায় মুগ্ধ হবার মত আর কি!

সুপার সাহেব ছিলেন যশোরের এক ভদ্রলোক। মুসলমান। তিনি যেন আমার প্রতি অতিমাত্রায় অনুগ্রহ দেখাতে উৎসুক। জানালেন যে, তাঁর পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব তা করেছেন। তবুও যদি কোন অসুবিধা হয় সম্ভব হলে প্রতিকার করবেন।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। কিন্তু তার প্রতি আমার সন্দেহ ঘনীভূত হল। আমাকে কেন এত খাতির! মুসলমান বলেইকি? কিন্তু পুলিশ জাতীয় জীবগুলিরত এই দুর্বলতা নেই। তারা সুযোগ পেলে, আর স্বার্থের খাতিরে নিজের ভাই ও ছেলেকেও ধরিয়ে দেয়। এরকম কাণ্ড-কারখানার অনেক ইতিহাস জানা আছে।

সত্যনাথ এক সময় ইঙ্গিত করলো, সুপারকে সাবধান। ওবেটা নিশ্চয়ই কোন মতলবে আছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু একদিনের এতটুক ব্যবহারে কিছু বলা যায় না। দেখা যাক না, বেটা আবার দেখা করতে আসে কিনা।

জেলখানায় পানির অভাব ছিল না। সবাই গোসল সেরে নিলাম। দুপুরের খানা এল। এ খানা হাজতের সেই বিশেষ খানা নয়। দস্তুরমত রাজভোগ বলা যায়। ভাত, ভাজি, মাছের ঝোল, ডাল ও একটু টক। শুনলাম, এটা রাজবন্দীদের জন্য বরাদ্দ খানা, রাজবন্দীদের নিজেদের ব্যবস্থাপনায় এই খাবার রান্না করা হয়। জেল কর্তৃপক্ষ টাকা দিয়েই খালাস, রান্না বান্নার ব্যাপারে রাজবন্দীরা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছেন। আমরা চারজন আজ থেকে তাদের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হলাম। খাওয়া দাওয়ার দিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

।। আট ।।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ি। বিকেলের দিকে দরজায় খটখট আওয়াজে আমাদের ঘুম ভাঙলো। দেখি একজন ওয়ার্ডার আমাদের সেলের দরজা খুলে দিল। সে জানালো, সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা সামনের আঙ্গিনায় বেড়াতে পারি। তবে সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাবার দেওয়া হবে। তারপর সেলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বেলা তখন তিনটা। দুজন মেট চা দিয়ে গেল। চা পান করে সেলের বাইরে গেলাম এবং পাশের সেলগুলির সামনে পায়চারি করতে লাগলাম। আমাদের ঠিক পাশের সেলের দরজা খোলা হয়নি। দেখলাম সেলের মধ্যে এক যুবক বিছানায় বসে বই পড়ছে আর মাঝে মাঝে চায়ের মগে চুমুক দিচ্ছে। একান্ত নির্লিপ্ত ভাব। একজন মেটকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই সেলটা খোলা হয়নি কেন!

মেট যেন ভয়ে ভয়ে বলল ঃ হুকুম নেই বাবু। ইনি ফাঁসির আসামী।

দীনেশ দাসের নাম শুনেছেন? কোন এক সায়েবকে গুলি করে মেরেছিল। বিচারে ওর ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

শুনে মনটা বেদনায় ভারাক্রান্ত হলো। এই সেই দীনেশ, যার বীরত্ব-কাহিনী বিপ্লবীদের মরণ জয়ী হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। সত্যনাথ ও অরোরাকে ডেকে বললাম, দীনেশ দাসকে দেখবে এসো।

ওরা ছুটে এল। দীনেশের সেলের সামনে আমাদের দাঁড়াতে দেখে একজন ওয়ার্ডার ছুটে এল। বললঃ আপনারা এখানে দাঁড়াবেন না। বড় সাহেবরা দেখলে আপনাদের বাইরে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

জেলের আইনকানুন জানতাম, তাই আর দ্বিরুক্তি না করে সেখান থেকে সরে এলাম, কিন্তু আমাদের মন পড়ে রইল দীনেশের কাছে। কখন তার সঙ্গে একটু আলাপ করব, কখন তাকে আমাদের প্রাণ নিংড়ানো শ্রদ্ধা জানাতে পারবো, সেই চিন্তায় আমরা বিহ্বল হয়ে থাকলেম।

সন্ধ্যার আগেই আবার সেলের মধ্যে বন্দী হলাম। রাত্রের আহার শেষ হয়েছে। রাত্রে মাছের বদলে দিয়েছে খাসীর মাংস। অরোরা ও বাজপেয়ী জানিয়ে ছিল ওরা রাত্রে রুটি খাবে তাই ওদের রুটি সরবরাহ করা হল। আহারের পর আর কোন কাজ নেই। রাত দশটার আগে কেউই ঘুমাই না, কাজেই চলতে লাগলো আমাদের স্মৃতিচারণ।

বাজপেয়ী প্রথম কথক। সে বলল, পরিবারের কড়া পাহারা এড়িয়ে সে দলে যোগ দিয়েছে। ধরা পড়ার ফলে বাড়ী ফেরা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি এ যাত্রা ছাড়া পাই তা হলে আর দিল্লীতে ফিরে যাওয়া হবে না। বাংলাদেশে থাকলেও সে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কাজেই বিহার অথবা কানপুরে তাকে থাকতে হবে। অবিশ্যি কান-পুরে দলের শক্ত ঘাঁটি আছে। লুকিয়ে থাকবার আস্তানাও একটা পাওয়া যাবে। তবে সে দলপতির নির্দেশ মেনে চলবে। শুধু মানবে না দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ। কারণ কাকা ব্রিটিশ সরকারের গোলামি করেন। বিরাট চাকুরী করছেন, তার উপর বিশ্বস্ত গোলামের যা প্রাপ্য—সেই স্যার খেতাব পেয়েছেন। তাঁর মত পাকা বুরোক্রাট ভাইপোকে কি সহ্য করতে পারবেন? এ জন্যই তার বাড়ী ফেরা হবে না।

সত্যনাথ যা, বললো, তাতে জানা গেল, সে কলকাতার মল্লিক পরিবারের নাতি, মাতামহের জমিদারী তাদের বিত্তশালী হওয়ার সহায়তা করেছে। বাবা নেই, মা ও ছোট ভাইবোন অনেকগুলি। যশোরে পৈত্রিক সম্পত্তি যা আছে তাতে খাওয়া পরার ভাবতে হয় না। কাজেই সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে নিয়ে সে রাজনীতিতে নেমেছে। জেল ফাঁসি কিছুতেই তার ভয় নেই। আর ওসব থেকে রেহাই পেয়ে সাংবাদিক জীবনই সে বেছে নেবে।

অর্জুন অরোরা সোজাসুজি বলল, অতীত সে ঘাটতে চায় না। মা বাবার পরিচয় তার কাছে বড় নয়। সে বিপ্লবী; এটাই বড় কথা। ভারতের স্বাধীনতা তার কামা। সমাজতান্ত্রিক কাঠামো ছাড়া অন্য কোনরকম রাষ্ট্র ব্যবস্থাই সে মেনে নেবে না।

আমার যখন পরিচিতির পালা এল তখন একটু বেকায়দায় পড়তে হল। পিতামহের আমলের অগৌরবের কাহিনী বিবৃত না করাই ভাল, কারণ আমি বুঝতে শিখেছিলাম যে, সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জন্য আমার পূর্বপুরুষেরা ধিক্কৃত, আজকের এই বিত্তহীন আমি, এটাই আমার বড় পরিচয়। আর এক দরিদ্র অথচ রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধা মেয়ে আমার জীবনসঙ্গিনী, এ পরিচয় ওদের কাছে নতুন নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদানের কথাও তাদের অজানা নেই। কিন্তু আমার এক সন্তান অতিসম্প্রতি জন্মগ্রহণ করেছে জেনে ওরা যেন হতাশ হয়ে পড়ল। ওরা প্রশ্ন করল, শিশু সন্তানের মায়া তোকে ঘরের পানে টানবে না? সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে তুই কি আর আগের মত বেপরোয়া হতে পারবি? বিপদের ঝুঁকি নিতে পারবি? এমনি আরো কত কি প্রশ্ন! আমি শুধু এ কথাটাই বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে, ভারতের কোটি কোটি মানুষ যেমন করে দুঃখকষ্ট ভোগ করে, প্রয়োজন হলে ওরাও তেমনি করে সব সহ্য করবে। পিছিয়ে পড়ার অর্থ হলো মৃত্যু। সে মৃত্যু আমার কাম্য নয়। তবে জনগণকে সঙ্গে না নিয়ে আমরা যে পথে চলেছি, সেপথ ঠিক নয়। এ পথ স্বরাজ আনতে পারে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনবে না।

অনেক রাত্রে আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। ঘুম না আসা পর্যন্ত বার বার মনে পড়ে স্ত্রীর সংগ্রামী জীবনের কথা। শিশু পুত্রের মায়াময় মুখ।

পরদিন সকালে চা পান করে, গোসল সেরে, "স্টেটসম্যান" সংবাদপত্রখানা নিয়ে পড়তে বসেছি। এমন সময় স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন যে, আপনাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে, ডি আই জি সাহেবের হুকুম।

আমাকে একা কেন তলব করল ডি, আই, জি, সাহেব? নতুন কোন তথ্য পেয়েছে কি আমার সম্বন্ধে? তাই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় অথবা একাই আমাকে আদালতে হাজির করতে চায়? কিছুই মাথায় আসে না। কেন একা আমায় ডাকলো!

একজন অফিসার ও দু'জন সশস্ত্র পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে বেলা ১০ টা নাগাদ ইলিশিয়াম রোডে হাজির হলেম। বলা বাহুল্য, ওরা দয়া করে একটি ট্যাক্সি করে নিয়ে গিয়েছিল। শহরের খোলামেলা রূপ যেন অনেক দিন পর চোখে পড়ল। ইচ্ছে হচ্ছিল, যাওয়ার পথে যদি কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো বেশ ভাল হয়। কিন্তু হা হতোস্মি! একটা আধা চেনা লোক ও চোখে পড়ল না।

ইলিশিয়াম রোডের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সদর দফতরে নিয়ে আমাকে একটা ছোট সুসজ্জিত কামরায় বসানো হল, দরজায় দু'জন সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় থাকলো। একটু পরে ইনস্পেক্টর বিজয় দাস ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বলল: সম্পাদক সাহেব, আপনার জন্য একটা সুখবর আছে। মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু।

সুখবর? আমি অবাক হয়ে গেলাম। বন্দীর কাছে সুখবর কারামুক্তি। কিন্তু বিচারের আগে মুক্তি দিলে তো সবাইকে মুক্তি দিতে হবে। ব্যাপার কি ভেবে পাইনে! তবু ওর কথার জবাবে বললাম, যদি সত্যিই সুখবর হয়, তাহলে নিশ্চয়ই মিষ্টি খাওয়াবো। কিন্তু জেলখানায় তো অর্থাগম হয় না, সেটা নিশ্চয়ই জানেন।

দাস হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল: আচ্ছা মিষ্টিটা না হয় আমিই খাওয়াবো। তারপর একজন সেপাইকে বলল: ভিজিটারদের কামরা থেকে ওদের নিয়ে এসো।

"ওদের নিয়ে এসো" বলতেই বুকটা ধক করে উঠলো। আবার কাদের ধরে আনলো ওরা। হয়ত আমার কোনো বন্ধুকে ধরে এনেছে। কিন্তু একটু পরেই আমাকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ঢুকলো শিশুপুত্র কোলে আমার সহধর্মিনী। আনন্দে আমি যেন আত্মহারা। দেখলাম ওর মুখে বিষাদের কোনো ছাপ নেই। নেই কোনো শঙ্কা। তার আনন্দময় সৌম্যমূর্তি দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলেম। বিজয়

দাস আমার স্ত্রীকে যথারীতি অভ্যর্থনা করে বসতে দিয়ে বাইরে চলে গেল। একটু পরেই দুইটি প্লেটে সন্দেশ, রসগোল্লা, সিংগাড়া ও কমলা-লেবু নিজেই বয়ে নিয়ে ঢুকলো। বলল ঃ একটু মিষ্টিমুখ করুন।

আট মাসের শিশুপুত্র—আমার প্রথম পুত্র—তাকে কাছে পেয়ে আমার যা আনন্দ হল। কিন্তু অনেক খোসামোদ করে ও তাকে কোলে নিতে পারলাম না।

প্রায় দু'ঘন্টা ওরা আমার কাছে ছিল। আর সেই সংগে শিকারী কুকুরের মত কান পেতে বসেছিল বিজয় দাস। বিনয়ের সংগে সে বলে ঃ উপায় নেই দাদা, ইন্টারভিউর সময় আমাদের উপস্থিত থাকতেই হবে। ওপরওয়ালার হুকুম।

বিজয় দাসের চোখ ও কানকে ফাঁকি দিয়ে কলাবাগানের খবর, পাটালিগুড়ের খবর ইত্যাদি অনেক সাংকেতিক কথার মাধ্যমে আমাদের গচ্ছিত অস্ত্রশস্ত্রের নিরাপত্তার সংবাদ পাওয়া গেল। জানা গেল, পুলিশ আমার গ্রামের বাড়ীতে হানা দিয়েছিল, কিছুই পায়নি। আপত্তিজনক বইপত্র আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

আমার স্ত্রীর সংগে এসেছিলেন হাশেমী দাদা। কিন্তু তাকে আমার সংগে দেখা করতে দেয়া হয়নি। বিজয় দাসকে অনুরোধ করলাম, হাশেমী সাহেবত কংগ্রেসী, তাকে দেখা করতে দেয়ায় আপত্তি কেন?

বিজয় দাস অত্যন্ত বিনয়ের সংগে বলল, আপনার স্ত্রীর সংগে দেখা করতে দেয়ার নির্দেশ আছে, কাজেই অন্য কাউকে দেখা করতে দিতে পারিনে। অগত্যা স্ত্রীর সংগে মামুলী কথাবার্তার পর আমাদের ইন্টারভিউএর পালা শেষ হল। এবার একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, '৩২ সালে আমার আত্মীয়-স্বজন আমাদের উপর যে রকম অত্যাচার করেছিল, এবার সে রকম কিছু করেনি। বরং অনেক সহানুভূতির সংগে আমার স্ত্রীকে সাহায্য করেছিল গ্রামবাসীরা।

কয়েকদিন জেলখানায় একঘেয়ে জীবন কাটাই, এর মধ্যে খবর পাওয়া গেল যে, ব্যাংক প্রতারণা মামলায় আমাদের গ্রেফতার করা হয়েছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ সরকার যোগাড় করতে পারেনি। কাজেই এই মামলা

ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে কমলী সহজে ছাড়ছে না। আর একটা গুরুতর ধরনের মামলা খাড়া করা হয়েছে, তাতে আমাদের সবাইকে জড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। প্রভাত চক্রবর্তীকে মূল আসামী করে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হচ্ছে এবং পুলিশ মনে করছে সব খুচরো মামলা এক সাথে জড়িয়ে একটা পাইকারী মামলা খাড়া করতে পারলে সব বিপ্লবীকেই ঠান্ডা করা যাবে লম্বা মেয়াদের জন্য জেলে পাঠিয়ে, আর সংগে সংগে ওদেরও পদোন্নতি। খবরটা সব বিচারাধীন আসামীর জন্য একটু চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু পানিতে যাদের বাস তাদের কুমিরে কি ভয়। যা হবার হবে মনে করে জেলখানায় ফুর্তি করে দিন কাটাতে থাকি।

একদিন রাত দুপুরের দিকে কানে এসে বাজে কবি রবীন্দ্রনাথের "দান" কবিতার গুরুগম্ভীর আবৃত্তি, আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠি।

শুনলাম আবেগকম্পিত স্বরে আবৃত্তিঃ

"ভেবেছিলাম চেয়ে নেবো
চাইনি সাহস করে
সকালবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে পরে
আমি চাইনি সাহস করে।
ভেবেছিলাম সকাল হলে
যখন পারে যাব চলে
ছিন্নমালা শয্যা তলে
রইবে বুঝি পড়ে
তাই আমি কাঙালের মত
এসেছিলাম ভোরে
তবু চাইনি সাহস করে।"

উৎকর্ণ হয়ে আমরা চারজন শুনতে থাকি আর হৃদয়মথিত করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মুখে কোন কথা নেই। চোখভরা শুধু পানি, টপটপ করে ঝরে কোলের কাপড় ভিজিয়ে দেয়। সেদিকে খেয়াল নেই অধিকতর মনোযোগ দিয়ে শুনিঃ

"আজকে হতে জগৎ মাঝে
ছাড়ব আমি ভয়
আজ হ'তে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরানময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।"

আবৃত্তিকারের কন্ঠ ক্রমেই ধীরে মন্থর হয়ে এল। শান্ত সমাহিত কন্ঠে ভেসে এল পরম প্রশান্তি মাখানো ছত্র ঃ

"ধূলায় বসে তোমার তরে
কাঁদব না আর একলা ঘরে
তোমার লাগি ঘরে পরে
মানব না আর সাজ
তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিল আজ
আমি করব না আর সাজ।"

বুঝতে পারলেম, এ কন্ঠ দীনেশের। সারারাত জেগে সে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আর হেমচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করে। কিন্তু এমন হৃদয়দাবী আবৃত্তি আর কোনদিন শুনিনি। আমরা সবাই নীরব নিস্তব্ধ। হঠাৎ সত্যনাথ বলল ঃ জানিস, আজ ভোরেই দীনেশের ফাঁসি হওয়ার কথা। সেই জন্যই বোধহয় শেষবারের মত সে সকল মনঃ প্রাণ দিয়ে আবৃত্তি করে নিলো।

মুখে কারুর কথা নেই। এমন তাজা তরুণ প্রাণ নির্ভয়ে নিঃশেষে দান করল, অতুলনীয় এ দান। সে চলে গেল, কিন্তু পিছনে রেখে গেল

কিছু বিপ্লবের অগ্নিগিরি। বিশ্ব-বিধ্বংসী অগ্নুদগীরণের আর হয়ত বিলম্ব নেই।

মনকে যতই প্রবোধ দেই, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় মুষড়ে পড়ে, প্রিয়জন হারানোর বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়।

সে রাতে আর ঘুম হলো না। চারজনই জেগে বসে থাকি। কারুর মুখে কথা নেই। ভোর হওয়ার আগেই দেখা গেল একদল সিপাই কয়েকজন অফিসারসহ দীনেশের সেলের দিকে গেল, সেলের দরজা সশব্দে খুলে গেল, সে শব্দ আমাদের বুকে বজ্রের মত যেন বাজলো। এ সেই নির্ভীক দীনেশের দৃপ্ত কন্ঠস্বর। আবার আমাদের সেলের সম্মুখ দিয়ে একে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় ওর বিদায় বাণী কানে এসে বাজলোঃ "বিদায়, কমরেড, বিদায়।"

আমরা আর স্থির থাকতে পারলাম না। সবাই চীৎকার করে উঠি।

এরপর আমরা সবাই যেন ভেঙ্গে পড়লাম। আমরা ডুকরে কেঁদে উঠি। কতক্ষণ পর বাজপেয়ী একটু সামলে নিয়ে আমাদের সান্ত্বনা দেয়ঃ বীরের এই মৃত্যু আমাদের আদর্শ হোক। কান্না আমাদের শোভা পায় না। তবুও তার চোখ দিয়ে তখনও অশ্রু ঝরছিল।

বিহারের ভূমিকম্প যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করেছে, তার বিস্তারিত বিরবণ জানা গেল ইংরেজী দৈনিক "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায়। জেলখানায় বাংলা পত্রিকার মধ্যে সাপ্তাহিক "সঞ্জীবনী" ও ইংরেজী দৈনিক 'স্টেটসম্যান'-এর প্রবেশাধিকার ছিল। ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী বেলা ২টা ৪৩ মিঃ সময়ে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়ে গেল, তাতে প্রথম দিনেই কয়েক হাজার লোকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তারপর সপ্তাহ-খানেক ধরে উদ্ধার কাজ চলে এবং গড়ে প্রতিদিন দুইশত থেকে তিনশত গলিত মৃতদেহ ধ্বংসস্তুপ থেকে টেনে বের করা হয়। দুর্গন্ধে সারা বিহার প্রদেশ এক ভয়াবহ নরকে পরিণত হয়েছিল।

জেল থেকে আরো খবর পেলাম যে, মুসলিম ছাত্র সমিতির তরফ থেকে একটা দল বিহারে গিয়েছে সেবা কাজের জন্য। এই দলের নেতা হিসেবে আছেন ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক নোমান, ছাত্র সমিতির আবদুল ওয়াসেক, আনোয়ার হোসেন, রোকেয়া বেগম এবং

আরো অনেক পরিচিত বন্ধু। এই অতিপ্রয়োজনীয় সময়ে আমি সেবাকর্মী হিসেবে কোন কাজে লাগলাম না, সাংবাদিক হিসেবেও আমার দায়িত্ব পালন করতে পারলাম না,—এই কথা মনে করে দারুণ মর্ম-পীড়া অনুভব করতে লাগলাম। আমার পত্রিকা 'ফরোয়াড'' প্রয়োজনীয়সংখ্যক সাংবাদিক রাখতে পারে নি অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য। সংবাদ শাখার প্রধান ছিলেন তখন আমারই অগ্রজতুল্য শ্রীভবেশচন্দ্র নাগ— সিলেটের লোক। কিন্তু তিনি নিজে বাইরে গিয়ে যে কাজ করবেন সে বয়েস নেই। আর যারা আছে বেশীর ভাগই ছাত্র এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকেও অপরিপক্ক। কেবলই মনে হতে লাগল যে, এ সময় যদি বাইরে থাকতেম, তাহলে অনেক কাজে লাগতে পারতেম। বন্ধু সত্যনাথের কোন আফসোস নেই, কারণ তার পত্রিকার অবস্থা খুব সচ্ছল বলে বেশ কিছু অভিজ্ঞ সাংবাদিক ওদের স্টাফে আছে। সাংবাদিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার যে ক্ষোভ তা যারা সত্যিকার সাংবাদিক তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেকের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ওয়াসেক ছিল একটি বহুল পরিচিত নাম। তাকে মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের জনক বললে অত্যুক্তি হয় না। পরবর্তী যুগে মুসলমানদের সকল জাতীয় আন্দোলনে ওয়াসেককে পুরো ভাগে দেখেছি। কি পাকিস্তান আন্দোলন কি হলওয়েল মনুমেন্ট উচ্ছেদ আন্দোলন সব কিছুতে ওয়াসেকের দান অনন্য সাধারণ। শেরে-বাংলার অকৃত্রিম অনুরাগী হয়েও ওয়াসেক শেরে বাংলার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হয়ে। তিনি শেরে বাংলার প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনকে মুসলমান জাতির পৃষ্ঠদেশে ছুরিকা-ঘাতের শামিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন, ঢাকায় স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জেলা বোর্ডের সদস্যও হয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় এই নিরলস দেশভক্তকে কপর্দকহীন অবস্থায় হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করতে হয়। এ সব অনেক পরের কথা।

যাহোক, বিহারে ওয়াসেকের রিলিফ মিশনে যাওয়ার সংবাদে আমার মনে কিছুটা স্বস্তির সঞ্চার হল।

জেলে একঘেয়ে জীবন ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠলো। কিছু বইপত্তর পেলে তবুও সময় কাটানো যায়। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে বই চেয়ে আবেদন করলাম। কর্তৃপক্ষও এই আবেদনে সাড়া দিলেন, কিন্তু যেসব বই দিলেন তা একেবারেই অপাঠ্য। পেলাম কম্যুনিস্ট-বিরোধী কয়েকটি বই আর খ্রীস্টধর্ম প্রচার পুস্তিকা। আমরা দু'চার পাতা উল্টিয়ে ফেলে রেখে দিলাম; পরে যথাস্থানে ফেরত পাঠানো হল।

সন্ধ্যার পর আমাদের গালগল্প চললো বেশ কয়েকদিন ধরে। কিন্তু কত আর আজেবাজে গল্প করা যায়। সত্যনাথ তাই এক সন্ধ্যায় গুরুগম্ভীর আলোচনার সূত্রপাত করে সোজাসুজি বলে বসলো যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেসের বিরোধিতার ফলে বিপ্লব আন্দোলন বারবার ব্যাহত হচ্ছে। সত্যনাথের এই মন্তব্যে অর্জুন অরোরা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তার মতে মাহাত্মা গান্ধীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এরকম অসাধারণ ব্যক্তিত্ব শুধু ভারতে কেন, দুনিয়ায় আর নেই তবে সমাজতন্ত্রকে কংগ্রেসের আদর্শ হিসেবে নেয়া উচিত।

সত্যনাথ স্বীকার করলো যে, মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বও তার মানবিকতা সম্পর্কে প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব তিনি ঠিকমত দিতে পারছেন না, একথা স্বীকার করতেই হবে একমাত্র অহিংসার পথে দেশের মুক্তি আসবে, হিংস্রতাকে অহিংসা দিয়ে প্রতিহত করা যাবে, এমন অদ্ভুত যুক্তি বিংশ শতাব্দীর হিংস্রতার যুগে একেবারেই অচল তার জন্যই বিক্ষুব্ধ ভারতকে বারবার থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে।

অর্জুন অরোরা এতক্ষণ ধরে মনে মনে ফুঁসছিল। মনে হল খালি ব্লাডারে রাগের হাওয়া পাম্প করে ফুলিয়ে দেয়া হচ্ছিল। সে এবার মুখ খুললো। একনাগাড়ে কংগ্রেস ও মহাত্মাগান্ধীর গুণকীর্তন করে বলল যে একটা ঘুমন্ত পরাধীন জাতিকে এই কংগ্রেসই জাগিয়ে ছিল। কংগ্রেসের মাধ্যমেই ভারতীয় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আর মহাত্মাজী তাঁর অহিংসামন্ত্রের মাধ্যমেই মরণকে জয় করতে শিখেছিলেন। এটা কিরকম কথা।

বাজপেয়ী অরোরার কথায় সায় দেয়। বলে ঃ হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধের ক্ষমতা আমাদের কোথায়? এবার আমি মুখ খুললাম। বল্লাম, প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। এবং এই দেশের যুবকরা সে ক্ষমতা অর্জনের জন্য যেটুকু চেষ্টা করেছে তাও কংগ্রেস ও মহাত্মাজীর দ্বারা ধিকৃত হয়েছে কাজেই শক্তি অর্জনের মুলেই যদি আঘাত করা হয়, তাহলে শক্তি অর্জিত হবে না, বেড়ে যাবে নৈরাশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ না, গোপীনাথ দে টেগার্টকে মারতে গিয়েছিল ১৯২৪ সালে, অবশ্যি ভুল করে মারলো আর্নেষ্ট ডেকে। সেজন্য বেচারার ফাঁসি হলো। সিরাজগঞ্জের কংগ্রেস সম্মেলনে মাওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে গোপীনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজানিয়ে প্রস্তাব পাশ হলো। কিন্তু কংগ্রেসের পরবর্তী ফরিদপুর সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় সে প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হল। এটা কি বিপ্লবকে পিছিয়ে দেয়ার শামিল নয়?

সত্যনাথ এবার আরো তীব্রভাবে গান্ধীজীর নীতি সমালোচনা করতে শুরু করলো। সে বললো, একবার পিছন ফিরে ১৯২২ সালের দিকে তাকাও। দেখবে, বার্দেীলির সত্যাগ্রহ ও করবন্ধ আন্দোলনকে পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিশোধ গ্রহনের ফলে, চৌরিচৌরায় মহাত্মাজী এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যার ফলে গোটা আন্দোলনটাই নস্যাৎ হয়ে গেল। এর ফলে, মহাত্মাজীর উপর ছাত্র যুবকদের আস্থা অনেকটা কমে গেল। সার্বিক সংগ্রামের পথে এটা একটা বড় বাধা নয়কি?

অরোরা যুক্তি দেখালো যে, নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের ধারা থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। গান্ধীজীত সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেননি, কাজেই তাঁর নীতি অনুসারেই তিনি আন্দোলন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবিশ্যি ভিন্ন মতাবলম্বীদের মহাত্মাজীর সঙ্গে একমত হওয়ার কারণ নেই।

জেলে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রায়ই আমাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরূপ কটাক্ষ শুনতে হত। মুসলমানরা নাকি স্বাধীনতা চায় না তাই তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের ব্যাপক-

ভাবে জড়াচ্ছে না, বরং তারা বিরোধিতা করছে সর্বত্র। তাদের এই অভিযোগের জওয়াব দেয়ার একটা মওকা পাওয়া গেল। আমি বললাম, আন্দোলন বন্ধ করার আগে গান্ধীজী কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। তার মতানুসারেই এই আন্দোলন বন্ধ করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধীজী যখন স্কুল-কলেজ বর্জন ডাক দিলেন তখন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলমান ছাত্ররা বেরিয়ে আসে, কিন্তু কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা বেরিয়ে আসে নি। মালব্যজী ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। আরো একটা ব্যাপার ভেবে দেখা উচিত, এই সময় যে মুসলিম লীগকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা হত, সেই মুসলিম লীগ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে, মওলানা হসরত মোহানী এই প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনে মওলানা যখন আবার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখন গান্ধীজীর বিরোধিতার ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে মুসলমানদের ধারণা হয় যে, হিন্দু নেতাদের কাজে ও কথায় সামঞ্জস্য নেই। তার ফলেই মুসলিম জনসাধারণ কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

মুসলমানরা জাতি হিসেবে স্বাধীনতাপ্রিয়, পরাধীনতাকে তারা পাপ বলে মনে করে। মওলবী মুজীবর রহমান 'দি মুসলমান' পত্রিকায় বার-বার লিখেছেন তিনি সবার আগে মুসলমান তার পরে অন্য কিছু। আমিও তাই মনে করি। বিপ্লবী হলেও আমি মুসলমান।

সত্যনাথ আমার কথার জের টেনে বল্লো, শুধু মুসলমানরা কেন, হিন্দু যুবসমাজও কংগ্রেসের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। দাস সাহেব (চিত্তরঞ্জন) ও সুভাষচন্দ্রও মাঝে মাঝে গান্ধী নেতৃত্বের উপর বিরদ্ধ হয়ে উঠেন।

বাজপেয়ী বলল, কিন্তু তোর চাচা (মওলবী মুজীবুর রহমান) ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাত্মাজীর গোড়া সমর্থক।

"তাত হবেনই। ওরা, পুরো অহিংসপন্থী।" আমি হাসতে হাসতে জবাব দেই।

আমাদের বিতর্ক আর বেশীদূর গড়ালো না। বাতি নিভিয়ে যে যার জায়গায় শুয়ে পড়লাম।

মার্চ (১৯৩৪) মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোরবেলায় একজন অফিসার খবর দিয়ে গেল যে, ঠিক দশটার সময় আমাদের আদালতে হাজির হতে হবে। তার আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হবে। কাজেই আমাদের সাজো সাজো রব পড়ে গেল। তার মানে প্রাতঃকৃত্য শেষ করা, গোসল করা এবং ময়লা জামা-কাপড় বদলিয়ে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কাপড় পরে নেয়া।

প্রহরী বেষ্টিত হয়ে জেল ফটকে আসতে দেখা হল অচিন্ত্য ভট্টাচার্য ও সুধীর নাগের সংগে। তারা আগেই জেল ফটকে উপস্থিত হয়েছে। জেল সুপার আমাদের দেখে বলল, 'উইস ইউ গুড লাক জেন্টেল মেন' তার কথায় মনে হল, সে যেন আমাদের বিদায় দিতে পারলে বাঁচে।

জেলের গেটের বিরাটকায় লৌহকপাট খুলে গেল। সংগে সংগে একটা মাঝারি আকারের পিকআপভ্যান ভিতরে ঢুকলো। ড্রাইভারের পাশে বসেছিল ইনস্পেক্টর বিজয় দাস। সে লাফ দিয়ে নেমে এসে বললঃ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন সব। বড্ড দেরী হয়ে গেল।

কড়া প্রহরায় আদালতের কাঠগড়া নামক পিঞ্জরার মধ্যে আমাদের ঢোকানো হল। বিচারক তখনও আসে নি। কাজেই আমাদের মধ্যে আলাপ চলতে লাগল। আজ সবাই উপস্থিত—একজন ছাড়া। সুধীর আগেই পালিয়েছে। লীলা কাম্বলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কোথায় রেখেছিল? কোন কষ্ট হয়নি ত?

লীলা বলল ঃ প্রেসিডেন্সীতেই রেখেছিল। তবে আমাদের কামরায় দুটি খুনী মেয়ে রেখেছিল, তাই বড্ড খারাপ লাগছিল। তবে অন্য কোন অসুবিধা হয় নি। আমার পছন্দ মত খাবার দিত। জলের বন্দোবস্তও ভাল ছিল। শান্তিদি ও সুলতাদি' বেশ আরামেই ঘুমোতেন।

বেলা প্রায় বারোটার সময় ম্যাজিস্ট্রেট সুশীল সিংহ এজলাসে এলেন। আদালত কক্ষ নীরব, নিষ্পন্দ। কোর্ট ইনস্পেক্টর তার রিপোর্ট পেশ করলে ম্যাজিস্ট্রেট কিছুক্ষণ নিজের মনে তা দেখতে লাগলেন

এবং তার মুখমণ্ডলে কখনো হাসি, কখনো ক্রোধ যুগপৎ ঢেউ খেলতে লাগল। পরে ম্যাজিস্ট্রেট কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে ঘোষণা করলেন, পুলিশ আসামীদের বিরুদ্ধে মামলায় প্রমাণ দাখিল করতে পারছে না। সুতরাং আসামীদের আমি মুক্তি দিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেটের রায় শুনে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে উঠলাম 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

আমাদের চীৎকার শুনে মিঃ সুশীল সিংহ লাফিয়ে উঠলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে বললেন ঃ "সাইলেন্স, সাইলেন্স"। তারপর হুকুম জারী করলেন ঃ "আসামীরা আদালতের মধ্যে চীৎকার করে শান্তিভঙ্গ করেছে, তাই তাদের আদালত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখার হুকুম দেওয়া হল।"

হুকুম দিয়েই ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট মুলতবী রাখার নির্দেশ দিয়ে এজলাস ত্যাগ করলেন। আমরাও কাঠগড়ার মধ্যে মেঝেতে বসে পড়লাম।

তারপর ছুটাছুটি শুরু হল কোর্ট ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টর বিজয় দাসের। আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসামীদের আটক রাখার নির্দেশ দেয়া হল। অথচ আদালতের কাজ শেষ করে ম্যাজি-স্ট্রেট চলে গেলেন, কাজেই আসামীরা কি চলে যাবে না বেলা ৫টা পর্যন্ত আটক থাকবে তা পুলিশ বুঝতে না পেরে ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় ঢুকলো ও খোলাসা বয়ান চাইল। ম্যাজিস্ট্রেট ওদের ধমক দিয়ে বললেন যে ছেড়ে দেয়ার জন্যই ত কোর্ট শেষ করে দিলাম। শীগগীর ওদের বিদেয় কর।

পুলিশ আমাদের কাঠগড়ার তালা খুলে দিয়ে পাহারা দিয়ে নীচের তলায় বারান্দায় আনলো। তারপর এক এক করে সবাইকে ছেড়ে দিয়ে সাতজনের নামে গ্রেফতারী পারোয়ানা দিয়ে আবার পাকড়াও করলো। এদের মধ্যে অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, মিঃ নাগ ও আর ৫ জন বাঙ্গালী। এদের Suppression of Terrorist outrages Act. এ ধরা হল। বুঝতে পারলাম এদের আর রেহাই নেই। বিনা বিচারে কতদিন যে বন্দী রাখবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কি আর করা যায়। সত্যনাথ

ও আমি অন্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটি ট্যাক্সি করে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেম।

বাসায় এসে দেখি, একটি চাকর ছাড়া আর কেউ নেই সবাই লা-পাত্তা হাসেমী দাদা আগেই তার গ্রাম তালায় (খুলনা) চলে গেছেন নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। ছোটভাই শরফুদ্দীন হাশেমী দাদার হয়ে কাজ করার জন্য কর্পোরেশন থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছেন। সুতরাং আমিও এই সুযোগে একবার গ্রাম ঘুরে আসার লোভ সামলাতে পারি না। ফিরে অফিসে যোগ দেয়া যাবে।

।। নয় ।।

সাতদিন পর কলকাতায় এসে 'ফরোয়ার্ড' অফিসে যেতেই সবাই ধরে। সবার মুখে একই প্রশ্ন ঃ কখন ছাড়লো ? জেলে কিরকম ব্যবহার করলো ? অভিযোগ কি ছিল ? এরকম হাজারো প্রশ্ন একসঙ্গে। বন্ধুদের বললাম ঃ একটু স্থিরো ভব ; ধীরে ধীরে জওয়াব দিতে দাও। তোমাদের প্রথম প্রশ্নের জওয়াব হচ্ছে, সাতদিন আগে ছাড়া পেয়েছি। গিন্নীর দরবারে হাজির হওয়ার তাগিদে গ্রামে গিয়েছিলাম। তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে দেরী হল। দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব ঃ জেলে জামাই আদরে রেখেছিল। শয্যা, দুখানা কম্বল, খাদ্য লবশী ও কালো চা, শুকনো রুটি।

বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠলো। এমন সময় ভবেশদা'র কামরা থেকে তলব এলো। তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই একগাল হেসে বললেন ঃ কেমন ছিলে। অসুখ-টসুখ হয়নিত ? অফিসে সন্ধ্যার শিফটে তোমাকে দেয়া হয়েছে। কারণ স্বরাজ্য পার্টি নির্বাচনে নামছে। মুসলিম ফ্রন্টটা তোমাকে সামলাতে হবে। হিন্দু সাব এডিটররা জটিল সমস্যাগুলি বুঝতে পারবে না। হয়তো উল্টোপাল্টা রিপোর্ট করবে, মধ্যে থেকে আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে।

ভবেশদা'র নির্দেশ অমান্য করার সাহস আমার ছিল না। কারণ তিনিই তখন আমার সত্যিকার অভিভাবক।

ফরোয়ার্ড চলছিল, কিন্তু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সামনে নির্বাচন, স্বরাজ্য পার্টি জিতলে অবস্থা ভাল হতে পারে এই আশায় সবাই প্রায় বিনা বেতনে চাকুরী করছে। বেতন বলে যা দেয় তাতে পরিবার পরিজন নিয়ে

দুইবেলা দুমুঠো পেট ভরে খাওয়ার জো নেই। এই অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। আর আমার কাজত আরো দুরূহ। মুসলিম ফ্রন্টের খবর আমার পুরোপুরি সংগ্রহ করতে হয়। ঢাকার নবাব পরিবারের মধ্যে দুরকম রাজনীতির কোন্দল। এ, কে ফজলুল হক ও স্যার আবদুর রহীমের এক ধরনের রাজনীতি, আর মাওলানা আকরম খাঁ, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন প্রমুখের এক ধরনের রাজনীতি। এঁদের কার সঙ্গে কংগ্রেস তথা স্বরাজ্য পার্টির গাঁটছড়া বাঁধা হবে, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা যখন দানা বাঁধতে শুরু করলো, তখন আমার কাজের চাপও বাড়তে লাগল!

একদিন বিকেলে ভবেশদা তার কামরায় আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম কয়েকজন তরুণ ও প্রৌঢ় ধরনের লোক বসে আছেন। ভবেশ দা' তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন! এদের সবার নাম আমার মনে নেই। যাঁদের নাম মনে আছে তারা হলেন জগদীন্দ্র সেন, নীরেন রায়, অমলেন্দু ঘোষ, মুকুল, কমলা দাস গুপ্তা ও শান্তিময় গাঙ্গুলী।

মুসলিম ফ্রন্টের ভিতরের অনেক খবর ফরোয়ার্ডে ছাপা হতে লাগলো। জালালউদ্দিন হাশেমী, কুষ্টিয়ার শামসুদ্দিন আহমদ কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্দ্য ছিল খুবই অন্তরঙ্গ। কাজেই তাদের মাধ্যমে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল, আর সে সব সংবাদ প্রকাশের ফলে মুসলমানদের এক বিরাট অংশের কাছে ফরোয়ার্ড খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

সুভাষচন্দ্রের দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু একদিন ফরোয়ার্ড অফিসে এসে সব কর্মীদের সংগে আলাপ করলেন। আমার সংগে আলাপ প্রসংগে তিনি বললেন, তোমার কথা অনেক শুনেছি হাশেমীর মুখে। তাছাড়া, ভবেশও তোমার কথা অনেক বলেছে। তোমার সংবাদ সংগ্রহ ভাল হচেছ। তোমাকে কত বেতন দিচেছ?

"দেড়শত টাকা।"

"এতে তোমার চলে?"

"চালাতে হয় স্যার, উপায় কি? আমি জবাব দেই।

শরৎবাবু ভবেশদাকে ও ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, এ মাস থেকে একে যেন আড়াইশ করে বেতন দেয়া হয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এখন যেতে পারো। আমি একটা লম্বা সালাম ঠুকে বেরিয়ে এলাম।

শরৎবাবুর এই সহৃদয়তা যে আমার কাল হবে, তা কি জানতে পেরেছিলাম; দু'মাস কেটে গেল, বর্ধিত বেতনও পাচিছ কিন্ত তার সংগে সংগে শুনতে পাচিছ নানাবিধ গুঞ্জনধ্বনি। ফরোয়ার্ড অফিসের অধস্তন কর্তৃত্ব ছিল সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকদের হাতে। তারা প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করে কানাঘুষা করে আমার বিরুদ্ধে। এ ধরনের কথাও তাদের মুখে শোনা গেছে যে, "মোছলাটায় কপাল খুলেছে।" কেউ বলতো, "ও ব্যাটাকে তাড়ানো দরকার।"

ওদের এই ধরনের ঘৃণ্য কথা-বার্তায় আমি ভীষণ রকম মুষড়ে পড়ি। ভবেশদা অভয় দেন, চেঁচাক না ওরা। ওদের কথায় তোমার কান দেয়ার দরকার নেই। কিন্ত অবস্থা খারাপের দিকে যাচেছ দেখে ভবেশদার হাতে আমার পদত্যাগপত্র পেশ করলাম এবং ধীরে ধীরে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ভবেশদা শুধু বললেনঃ "তোমাকে আর বাধা দেবো না। তবে আমারও আর ইচেছ নেই এখানে কাজ করার। তুমি বরং "মোহাম্মদী" অফিসে যাও। সেখানে ভাল বার্তা সম্পাদকের অভাব।"

তার কথামত কাজ করতে সম্মত হয়ে ফরোয়ার্ড অফিস থেকে বিদায় হলেম। এখান থেকে সত্যকার উপলব্ধি ঘটলো যে, হিন্দু-মানসিকতা মুসলমানকে অতীতে সহ্য করেনি ভবিষ্যতেও করবে না।

গ্রামের বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে "মোহাম্মদী" অফিসে ধর্ণা দিতে শুরু করি। সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী" তখন বাংলার মুসলমানদের একমাত্র বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন চট্টগ্রামের মওলবী নজীর আহমদ চৌধুরী। ভদ্রলোক ভীষণ রকম রক্ষণশীল। বেটে খাটো লোকটি, কাঁচাপাকা দাড়ি। ভদ্রলোক খুব বেশী পান খান। আর ঘন ঘন দাতে খেলাল করেন।

এবং পানের কুচি যত্রতত্র ছিটিয়ে ছড়িয়ে ফেলেন। আমি আগে কখনো ভদ্রলোককে দেখিনি। এই প্রথম সাক্ষাতে আমার ধারণা জন্মাল যে, এরকম লোক আমায় চাকরী দিতে পারবেন না। তাছাড়া কয়েক বছর পূর্বে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে আমি এদের বিরোধিতা করে যে বিবৃতি দিয়েছিলাম, ইনি তাতে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে আমার বড় চাচা মুজিবুর রহমানের কাছে আমাকে শায়েস্তা করার দাবী জানিয়েছিলেন। কাজেই সেই নজীর আহমদ সাহেব আমাকে যে বরদাশত করবেন, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তবু একটু ক্ষীণ আশা ছিল যে, আমার পিছনে হিম্মত জোগাচ্ছিলেন "মোহাম্মদী" পত্রিকার প্রাণস্বরূপ জনাব আবদুল হাকিম খাঁ ও নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপধ্যায়। ওরা বললেন, একবার নজীর আহমদের সঙ্গে দেখা করে এসো, তারপর যা হয় আমরা করবো। নৃপেনবাবু তখন মোহাম্মদীর সহকারী সম্পাদক। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে তার সহকারী হিসেবে আমি শিশু বিভাগ পরিচালনা করতাম।

১৯৩৭ সাল। সাধারণ নির্বাচনের ডামাডোল শুরু হল। একদিকে কংগ্রেস, অপরদিকে ইউনাইটেড মুসলিম এবং প্রজাপার্টি। এর মধ্যে মুসলিম জমিদার শ্রেণীও একটা দল ছিল। তারা সুযোগের সন্ধানে থাকতো। প্রজাপার্টির নেতা হিসেবে জনাব এ, কে, ফজলুল হক তখন মুসলমান বামপন্থীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। মোহাম্মদী এই দলে ভিড়ে গেল এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, ফজলুল হক সাহেবের দলে ভিড়ে গেলেন। কংগ্রেস হক সাহেবকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল।

॥ দশ ॥

নির্বাচনের সময় প্রচারকার্যের ধারা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার জন্য আমি নেতাদের সংগে সফরে যেতে লাগলাম। বরিশালের পটুয়াখালীর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন প্রজাপার্টি থেকে ফজলুল হক সাহেব ও ইউনাইটেড পার্টি থেকে স্যার নাজিমুদ্দীন। পটুয়াখালীতে স্যার নাজিমের জমিদারী, কাজেই তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর প্রজাবৃন্দ তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভোট দিতে পারে না। কিন্তু হক সাহেবের প্রচার কৌশলের কাছে তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। হক সাহেবের প্রচারণার ধারা সম্পর্কে এখানে কিছু নমুনা দিচ্ছি।

পটুয়াখালীর কাছে একটা দ্বীপের মত ছোট এক গ্রামে হক সাহেবের লঞ্চ ভীড়লো। খবর এসেছিল যে, এই গ্রামের মাতব্বর নাজিমুদ্দীনের গোঁড়া সমর্থক। তারা হক সাহেবকে এই গ্রামের মাটিতে নামতে দেবে না। হক সাহেবও নাছোড়বান্দা। তিনি বললেনঃ দেখো, এই গ্রামের সব ভোট আমি পাবো। তিনি এজেন্ট মারফত মাতব্বরের নাম ও তার মৃত বাপের নাম জেনে নিলেন। তারপর গ্রামের ঘাটে লঞ্চ ভিড়িয়ে একটা লুঙ্গি ও ছেঁড়া পিরহান পরে এবং গলায় জুজদানের মধ্যে একটি ডায়রী নিয়ে তীরে নামলেন। ডায়রীটা ঠিক কোরআন শরীফের মত দেখাচ্ছিল। তিনি ধীর পদক্ষেপে মাতব্বরের বাড়ীর সামনে এসে মাতব্বরের বাপের নাম ধরে ডাকতে লাগলেনঃ ফজলু মিয়া বাড়ী আছে? ও ফজলু মিয়া!

বাড়ীর ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে বললেনঃ উনিত নেই। দু'বছর হল ইন্তেকাল করেছেন।

হক সাহেব যেন শোকে মুষড়ে পড়লেন। তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে

লাগলেন। রুমালে চোখ মুছে বললেনঃ উনি ইন্তেকাল করেছেন জানাননি কেন? ফজলু মিয়া আমার কত জানের দোস্ত ছিলেন, তা আপনারা জানবেন কি করে? তা ওনার ছেলে বজলু কোথায়?

বৃদ্ধা বললেন, সে বাজারে গেছে; এখনই আসবে। তা বাবা, আপনাকেত চিনতে পারলাম না।

"তা চিনবেন কি করে? যে চিনতো সে নেই। বজলুও আমাকে চিনবে না। তা বজলু ফিরে এলে বলবেন যে, কলকাতা থেকে ফজলুল হক এসেছিল। যাক, ফজলু ভাই-এর কবরটা কোথায় একটু দেখিয়ে দিন।

একটা ছোট ছেলে কবরটা দেখিয়ে দিতে হক সাহেব কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করতে শুরু করলেন। তাঁর সংগে শত শত লোক মোনাজাতে শামিল হল।

মোনাজাত শেষ করে হক সাহেব লঞ্চে ফিরে চললেন। এই সময় বজলু ছুটতে ছুটতে এসে হক সাহেবের কদমবুছি করে বলল: আমি ফজলু মিয়ার ছেলে বজলু। মায়ের মুখে আপনার আসার কথা শুনে ছুটে এলাম। আপনি হুজুর আমার বাড়ীতে কিছু মুখে না দিয়ে ফিরতে পারবেন না।

হক সাহেব অনেক ওজরআপত্তি করলেন, কিন্তু বজলুও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত রফা হল যে, বজলু কিছু মুড়ি, গুড় ও নারকেল লঞ্চে নিয়ে আসবে। হক সাহেব মুড়ি চিবাতে চিবাতে বললেন, তোমার বাপ বেঁচে থাকলে আমার কি আর এই বুড়ো বয়সে এখানে আসতে হত। কিন্তু সে নেই। আমারও সাহায্য করার কেউ নেই।

বজলু বলল, আপনার জন্য জান দিতে রাজী। বলুন কি করতে হবে।

হক সাহেব বুঝলেন বরফ গলেছে। তিনি পাকা খেলোয়াড়। বললেন, আচ্ছা ভোট হয়ে যাক, তারপর বলব, তোমরা নাজিমুদ্দীনের জমিদারীর প্রজা, কাজেই এখন আমার পক্ষে কাজ করলে তোমরা বিপদে পড়বে। আমার দোস্তের ছেলে বিপদে পড়ুক, এ আমি চাই না।

বজলু তখন বেপরোয়া। সে বললো, হুজুর, আপনার মত গরীবের মা বাপকে আমরা যদি ভোট না দেই তাহলে আমাদের দুঃখে-কষ্টে আর কে দেখবে? আমার চোখ খুলেছে হুজুর। এ অঞ্চলে একটা ভোটও নাজিমুদ্দীন সাহেব পাবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

হক সাহেব বজলুর কথায় যেন গলে গেলেন। তিনি তাকে অনেক দোয়া করে বললেন, বেঁচে থাকো বাবা। খোদা তোমাদের তরক্কি করুন। তোমার বাপের রুহ যেন শান্তিতে থাকে।

লঞ্চ ছাড়লো। হক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, কান্ডটা কিরকম হলো?

উনি হো হো করে হেসে বললেন: রাজনীতিতে সততার স্থান নেই, আর সততা দেখাতে গেলে লোটা কম্বল নিয়ে বনে চলে যেতে হবে।

আর এক মজার কান্ড ঘটেছিল পটুয়াখালীর এক জনসভায়। দেশময় বৃটিশ শাসকরা পোষ্টকার্ডের দাম দু'পয়সা ও টেলিগ্রামের হার ন'আনা ধার্য করেছিল। হক সাহেব জনসভায় দাঁড়িয়ে একটা পোষ্টকার্ড হাতে নিয়ে বক্তৃতার এক পর্যায়ে বললেন: ভাইসব, আগে এই পোষ্টকার্ডের দাম কত ছিল?

জনতার মধ্য থেকে জবাব এল: এক পয়সা।

"এখন কত দাম হয়েছে?"

"দু' পয়সা"

হক সাহেব বললেন: তাহলে দেখছেন ভাইসব, গরীবেরা পোষ্ট-কার্ড লেখে, তাই দাম দ্বিগুণ করে দেয়া হল। আর বড়লোকেরা টেলিগ্রাম করে, তাই তার দাম বারো আনা থেকে কমিয়ে ন' আনা করা হলো। আচ্ছা ভাইসব, তামাক খায় কারা:

জনতা থেকে জওয়াব এল: গরীবেরা।

"আর সিগারেট খায় কারা?"

"বড়লোকেরা।"

"তাহলে দেখুন ভাইয়েরা, যত সুবিধা সব বড় লোকেরাই পাচ্ছে। আর গরীব লোকদের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হচ্ছে। এসবের জন্য দায়ী কে?"

জনতার মধ্য থেকে জওয়াব এল, "স্যার নাজিমুদ্দীন।"

তাহলে বুঝুন ভাইয়েরা, নাজিমুদ্দীনকে ভোট দিয়ে যদি মন্ত্রী করা হয়, তাহলে সে গরীবের গলা কাটবে।

অমনি জনতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল, আমরা নাজিমুদ্দীনকে চাই না —নাজিমুদ্দীন মুর্দাবাদ।

বলা বাহুল্য, এই জনসভায় হক সাহেবের অনেক এজেন্টকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

যাহোক, এরকম দু'চারটি সভার পর হক সাহেব প্রকৃতপক্ষে পটুয়াখালী জয় করলেন অবশ্য হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেব পরে স্যার নাজিমকে উপনির্বাচনে পার করিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু নাজিমুদ্দীন শেষ পর্যন্ত হক সাহেবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

নির্বাচনের পর কোয়ালিশন সরকার গঠিত হল, লীগ-প্রজাপার্টি কোয়ালিশন। ফজলুল হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী হলেন। এই মন্ত্রীসভাকে ট্যালেন্ট মন্ত্রিসভা বলা হত কারণ বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিরা এই মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছিলেন এঁদের মধ্যে স্যার নাজিমুদ্দীন, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শ্রী নলিনী রঞ্জন সরকার, শ্রী তুলসী গোস্বামী, স্যার বিজয় কুমার সিংহ রায় এবং আরো হিন্দু মুসলমান মিলে কয়েকজন দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতা।

লীগ-প্রজাপার্টি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতালাভের পর কয়েকটি গণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। তার মধ্যে মহাজনী বিলোপ আইন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ঋণসালিশী আইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেহেতু বঙ্গদেশে মুসলমান সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং জমিদার মহাজন শ্রেণীর বেশীর ভাগ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই হেতু মুসলমানরা অধিক সংখ্যায় লাভবান হয়। নিম্নবিত্ত হিন্দুরাও যে লাভবান হয়নি তা নয়। তবে তাদের কণ্ঠস্বর সরকারের সমর্থনে সোচ্চার হয়নি।

পলাশীর পরাজয়ের পর মুসলমানদের মধ্যে যে হীনমন্যতা জেগেছিল, বাংলায় লীগ—প্রজা গবর্ণমেণ্ট তা কেটে যেতে শুরু করে। মুসলমানরা তাদের হারানো দিন ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। এই সময় থেকে উপমহাদেশে মুসলিম সংহতির বাণী নিয়ে মুসলিম লীগ একটু জোরেশোরে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। গণমুখী বাস্তব কর্মপন্থা তারা উপস্থিত করেনি, কারণ নেতৃত্ব ছিল কায়েমী স্বার্থের হাতে। যেমন কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রকাশ্যে অসাম্প্রদায়িক ও গণমুখী বলে প্রচার করলেও তা প্রকৃতপক্ষে ভারতের পুঁজিপতিদের করায়ত্ত ছিল। ডালমিয়া ও বিড়লা—প্রভৃতিরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রাতা ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

সে যাক, মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মিঃ জিন্নাহর আগমনে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারতোনা, যদি না এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আকরম খাঁ, মওলবী তমিজুদ্দীন খান ও মওলবী আবুল হাশেমের মত প্রভাবশালী বাঙ্গালী নেতারা মুসলিম লীগে যোগদান করতেন। বিশেষ করে ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ লাহোরের মুসলিম লীগ সম্মেলনে এ, কে, ফজলুল হক 'পাকিস্তান' প্রস্তাব উত্থাপন করায় তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী আসন করে নিলেন।

এরপর ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বাংলার মন্ত্রিসভায় রদ-বদল হয়েছে কয়েকবার। ফজলুল হক সাহেব এর মধ্যে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে প্রোগ্রেসিভ মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। সে মন্ত্রি-সভাও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন শুরু করলো। এই আন্দোলন আর অহিংস থাকেনি। কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবী শক্তির অনুপ্রবেশের ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ, রাম মনোহর লোহিয়া এবং অন্যান্য বিপ্লবী ও কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মহাযুদ্ধের অবসানের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে। কিভাবে সেটা হবে তা বিভিন্ন মিশন ভারতীয় নেতাদের সংগে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, এই আশায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজ নিজ আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে কর্মতৎপরতা শুরু করে। তবে এই দুই প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। গণমানুষের আশা আকাংখার সংগে তাদের নীতির কতটুকু সামঞ্জস্য ছিল তা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। তাই উপমহাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির জন্মবৃত্তান্ত ও রূপরেখা নিম্নে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বৃটিশ ভারতে এদেশীয়দের অভাব অভিযোগ ও দাবীদাওয়া পূরণের জন্য সরকারের নিকট আর্জি পেশের এক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে ১৮৫১ সালে কলকাতায় ' বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন -এর প্রতিষ্ঠা হয়। একই সময় পশ্চিম এলাকায় ''বোম্বাই এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের (১৮৫৭-৮৫৮) পর ইংরেজরা নির্ভরযোগ্য এক প্রতিষ্ঠান গঠনে এশীয় জমিদার ও মহাজন শ্রেণীকে উৎসাহ দান করেন। আর এরই ফলে ১৮-৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পয়দায়েশ হয়।

কংগ্রেস

১৮৯৯ সালের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মিঃ রমেশ দত্ত প্রথম বৃটিশ শাসনে ভারতের দুর্দশার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শোষণের দ্বারা ভারতীয়দের দারিদ্র্যের চরম সীমায় এনে ফেলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কোয়ার্টারে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল—অতীত ও বর্তমানের ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ভারতের এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যু বরণ করেছে। বৃটিশ শাসকরা ভারতের কৃষিপণ্য বিনষ্ট করেছে, শিল্প ধ্বংস করেছে। তা করেছে বৃটিশ শিল্পের বাজার প্রস্তুত করার জন্য বিশেষ করে ভারতের সূতিবস্ত্রের সংগে প্রতিযোগিতা করতে না পেরে তারা এদেশের তাঁতীদের উপর অমানুষিক জুলুম চালিয়ে এদেশের তাঁত-শিল্প ধ্বংস করেছে।

ভারত থেকে যে পরিমাণ অর্থ ইংলন্ডে চালান হত তার পরিমাণ দেখিয়ে মিঃ রমেশ দত্ত বলেন যে, ৯৭৮৩ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত

বৃটিশ শাসকরা ভারত থেকে গড়ে বছরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড চালান করেছে।

ভারতকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণের চিত্র এঁকে ছিলেন মার্কিন ঐতিহাসিক শেলাণ্ড জেঙ্কস। তিনি লিখেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যয় ভারতীয় সৈন্যদের ছয়মাসের জন্য বৃটেনে শিক্ষার ব্যয়, চীন আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের ব্যয়, ভারতের প্রয়োজনে নয়, এমন সব জাহাজ চলাচল ও ইণ্ডিয়া হাউজের কর্মচারী থেকে মেথর, ঝাড়ুদার পর্যন্ত সকলের ব্যয়ভার ভারতীয়দের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হত।

১৮৭১ সালে দাদাভাই নওরোজী লণ্ডনে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন বৃটেন ভারত থেকে সিপাহী বিপ্লবের পর পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড পাচার করেছে এবং ভবিষ্যতে এই পাচারের অংক আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মিঃ য়্যালান অকটোভিয়াস হিউম নামক জনৈক ইংরেজ সিভিলিয়ান ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, আমরা আর এক ভয়াবহ বিপ্লবের মুখোমুখী হচ্ছি। ভারতের কোটি কোটি মানুষ নিরন্ন। তাদের মধ্যে এই সংকল্প জেগেছে যে, একটা কিছু করতে হবে বাঁচার প্রয়োজনে। তাই তিনি লর্ড নর্থব্রুককে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন: আমাদের শাসনের ভিত নড়ে উঠছে এ সম্পর্কে আপনি অবহিত নন। যে কোন সময় যে কোন অজুহাতে ঝড় উঠবে এবং প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা ও হত্যাযজ্ঞ শুরু হতে পারে।

অনেকেই হিউমকে ভারতীয় কংগ্রেসের জনক মনে করেন। কিন্তু হিউম ও অন্য বাহাত্তর জন প্রতিনিধি, যাঁরা বোম্বাইয়ে ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই প্রকৃত কংগ্রেসের স্রষ্টা নন। তাঁদের নীতি ছিল দেন দরবারের মাধ্যমে ভারতের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করা। বৃটিশ শাসন খতম করার ইচ্ছা তাঁদের আদৌ ছিল না।

১৮৮৭ সালে মওলবী ফরিদউদ্দিন ও রামবখশ যে গোপন ইশতেহার

প্রকাশ করেন, তাতে সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ইঙ্গিত ছিল। বৃটিশ শাসকরা ত বটেই এতে ভারতের জমিদার ও মহাজন শ্রেণীরাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ভিঙ্গার রাজাতো ইংরেজদের কাছে ধর্ণা দিয়ে জানালো যে ইশতেহারের প্রকাশকদের আদর্শ শাস্তি দেয়া হোক।

প্রাচীন কংগ্রেস নেতৃত্ব আশা করতো যে, পশ্চিমী ধরনে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ভারতের প্রগতি সম্ভবপর।

লন্ডনে এক চরমপন্থী বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে দাদাভাই নওরোজীর মোলাকাত হয়। যুবকটি বলে যে, আবেদন-নিবেদনে কোন লাভ হবে না। বরঞ্চ আধ ইঞ্চি একটি সীসার গুলি অভাবনীয় সুফল লাভ করতে পারে। দাদাভাই বলেছিলেনঃ যুবকের এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার ছিল না, কিন্তু আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও নীতির পরিপন্থী ছিল তার এই মন্তব্য।

যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে বলা হত প্রগতিপন্থী, তিনিও ১৯১২ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে বলেছিলেন যে, এ্যানার্কিজম রাশিয়ার স্বাধীনতার সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছিল, তাছাড়া সন্ত্রাসবাদ প্রাচ্যের ধাতে সইবে না।

কংগ্রেসের নরমপন্থীরা ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বায়ত্বশাসনের পথে এগিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাস করতো, যা বৃটিশ রাষ্ট্রনেতারাও ভালো-চোখে দেখতো না। ১৯০৬ সালের দিকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান বলেছিলেন, ভারতীয়রা স্বায়ত্বশাসনের উপযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। বৃটেনকে মনে রাখা দরকার যে সুশাসন অপেক্ষা স্বায়ত্বশাসন অনেক ভাল। রাশিয়ান কৃষক শ্রেণীর চেয়ে ভারতের জনগণ স্বায়ত্বশাসনের জন্য অধিকতর প্রস্তুত। ভারত ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সার্বিকভাবে যোগদান করবে, তারপর তাদের স্বায়ত্বশাসন দেয়া হবে, এটা উদ্ভট পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। এটা কংগ্রেসের তোষণ নীতির প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা শ্রী অরবিন্দ

সন্ত্রাসবাদ

ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবী ভাবধারায় পুষ্ট এবং ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে "যুগান্তর" দলের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন তরুণ রাজনীতিক ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে সুপন্ডিত মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই সময় শ্রী অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় কয়েকদিন যাবৎ আলাপ আলোচনা করেন। কারণ তার প্রথমে বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজদের অনুগ্রহে স্বাধীনতা আসবে না, স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এবং বিচিছন্ন সন্ত্রাসবাদ তার প্রথম পদক্ষেপ। কংগ্রেসী মতবাদ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্খার পরিপূরক নয়। তিনি ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করে বলেন, বিনা রক্তপাতে ভারত স্বাধীন হওয়া সম্ভবপর নয়।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে জওহরলাল ও সুভাষ বোস পুনরায় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মহাত্মাগান্ধী ভারতের ডোমিনিয়ান ষ্টেটটাস দানের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। জওহরলাল ও সুভাষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধীজীর মূল প্রস্তাবের উপর সংশোধনী আকারে পেশ করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহাত্মাগান্ধী তখন পর্যন্ত ও পূর্ণ স্বাধীনতা চাননি, কিন্তু ১৯২৯ সালে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৩০ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গান্ধীজীকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার নির্দেশ দেয়া হয়। গান্ধীজী ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ তারিখে তাঁর ৭৮ জন অনুগামী নিয়ে ডান্ডী যাত্রা করেন এবং পথে পথে অগনিত জনতা তাঁর অনুগমন করে। ৫ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজী ডান্ডী উপনীত হন। গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রম থেকে এই স্থান প্রায় ২০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দু'শত মাইল তিনি পদব্রজেই অতিক্রম করেন। সমুদ্র উপকূলে এই অঞ্চল লবন প্রস্তুতের জন্য উপযোগী ; কাজেই সেখানে সরকারী লবন আইন অমান্য করেই তিনি লবন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। ইংরেজ সরকার ১৯৩০ সালের ৪ঠা মে আইন অমান্যের অভিযোগে মহাত্মা গান্ধীর অনুচরদের হত্যা করে।

এই সময় এ, কে, ফজলুল হক শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি তখন কোন রাজনৈতিক দলের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এই সময়

তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ নির্মাণের প্রস্তুতি পর্ব শুরু করেন এবং এজন্য তিনি মিঃ ডানকে শিক্ষা বিভাগের পরিচালক পদে নিয়োগ করেন। ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি বা "বেংগল প্যাক্ট" রচিত হয়। দেশবন্ধু দাসের এটা একটা অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই প্যাক্টের সমর্থনে ছিলেন স্যার আবদুর রহীম, মওলবী আবদুল করীম, মওলবী মুজিবুর রহমান, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী. মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু. মিঃ জে, এম, দাসগুপ্ত, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। স্বরাজ্য ও বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে এই চুক্তি অনুমোদিত হয়। এই চুক্তিতে ব্যবস্থা ছিল ঃ

সরকারী চাকুরীতে মুসলমানেরা জনসংখ্যাণুপাতে চাকরী পাবে। যতদিন এই সংখ্যাণুপাত পূরণ না হবে ততদিন নুতন নিয়োগের শতকরা ৮০টি পদ মুসলমানদের দেয়া হবে। সরকারী চাকরী ছাড়াও স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থাসমূহে যথা কলকাতা কর্পোরেশনে, সব মিউনিসিপ্যাল, জেলা ও লোকাল বোর্ড সমূহে মুসলমানেরা উপরোক্ত হারে চাকরী পাবে।

মুসলমানদের ন্যায্য সুযোগ দানের প্রস্তাবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মহাসভার এক জনসভায় তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধি-বেশন হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এই অধিবেশনে বেংগল প্যাক্ট পাস করিয়ে নেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু দাস পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সাধের বেংগল প্যাক্ট হিন্দু নেতারা বাতিল করে দেন।

স্যার সৈয়দ আহমদের ইন্তেকালের পর নওয়াব মোহসেন-উল-মূলক, সৈয়দ মেহদী আলী, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার প্রয়াস পান। ১৮৯৮ সালের ২৮ শে মার্চ স্যার

মুসলীম লীগ

সৈয়দ আহমদের ইন্তেকালের পর পরই মোহসিন-উল-মূলক কংগ্রেসের মুসলমান নেতাদের মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুসলমানরা অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসের দিকেই ঝুঁকে

পড়ে। মুসলমানদের দাবী-দাওয়া উপেক্ষিত হতে থাকায় মোহসিন-উল-মুলক বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট পেশ করার জন্য নওয়াব ইমদাদুল মুলক ও ভিকারুল-মুলক, নওয়াব মোস্তাক হোসেনের দ্বারা এক স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন এবং মহামান্য আগা খাঁনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল লন্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন, নওয়াব মোহসিন-উল-মুলক, হাকিম আজমল খাঁ, স্যার আলী ইমাম, স্যার মোজাম্মেল উল্লাহ খাঁ, স্যার রফিউদ্দিন, স্যার মোহাম্মদ শফী, স্যার আব্দুর রহিম, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, বিচারপতি শাহে দীন, এবং আরো কয়েক জন। এই প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের ফলে ভারতে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। আর এর ফলেই আইন সভায় মুসলমানদের আনুপাতিক আসন পাওয়ার পথ সুগম হয়।

১০৯৫ সালে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বড়লাট লর্ড কার্জন বাঙলা আসামকে বিভক্ত করেন। কিন্তু হিন্দুরা বিভক্তকরনের দায়িত্ব মুসলমানদের কাঁধে চাপিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ জাগিয়ে তোলে। অবশ্য বাঙলার মুসলমানরা চিরদিন হিন্দু জমিদার ও বড় বড় হিন্দু সরকারী কর্মচারীর শোষণ ও পীড়নে হয়রান হয়ে এসেছে ; কাজেই এই বিভক্তিকে মুসলমানেরা তাদের জন্য খোদার রহমত মনে করলো।

এরপর মুসলমানদের সংগবদ্ধ হওয়ার পালা। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর ১৯০৬ সালে ঢাকার মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স আহবান করলেন। এই কনফারেন্সের শেষে নেতৃবৃন্দের বৈঠকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়। ১৯০৭ সালে করাচীতে মুসলিম লীগের পরবর্ত্তী অধিবেশন বসে। এই বৎসর নওয়াব মোহসীন-উল-মুলক ইন্তেকাল করেন। সুতরাং সব দায়িত্ব এসে পড়ে ভিকার-উল-মুলক-এর উপর। তিনি মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। করাচী অধিবেশনে পীর ভাইয়ের সভাপতিত্বে গৃহীত এক প্রস্তাবে মহামান্য আগা খানকে মুসলিম লীগের স্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয় ; তবে এটাও স্থির হয় যে. বার্ষিক অধিবেশনসমূহে অপর কোন নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তি সভাপতিত্ব করবেন। অবশ্য মওলানা মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগকে গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিল কার্যকরী হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্তে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইংলণ্ডের আইন ব্যবসা ত্যাগ করে ভারতে ফিরে আসেন এবং মুসলিম রাজনৈতিক তরনীর হাল স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মিঃ জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও ভারতে জাতীয়তাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করার সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ভারতের ক্রান্তিলগ্নে মুসলমানদের সঠিক নেতৃত্ব দানের জন্য নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খাঁ-তাকে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য রাজী করেন।

জিন্নাহ

মিঃ জিন্নাহ সুচতুর রাজনীতিক। মুসলমানেরা যখন নানা ভাবে পর্যুদস্ত ও দিশাহারা, তখন জিন্নাহ সাহেব তাদের এক মহা মন্ত্র শোনালেন। সে মন্ত্র ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মন্ত্র। তাঁর নেতৃত্বের যাদুস্পর্শে মুসলমানদের অসাড় দেহে গতির সঞ্চার হল। বাংলার সকল স্তরের নেতা ও উপনেতারা ইউনাইটেড মুসলিম পার্টীর পতাকার তলে সমাবেত হওয়ার ওয়াদা জানালো। এই ইউনাইটেড মুসলিম পার্টীই পরে মুসলিম লীগে রূপান্তরিত হয়।

মুসলিমলীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কার্য্যক্রম সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে ১৯৪০ সালে, এ, কে ফজলুল হকের পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই পাকিস্তান নামটীর একটা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে। সে কথাটাই এখন বলছি।

চৌধুরী রহমত আলী নামে এক যুবক ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারী পড়ছিলেন। ভারতে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙগা-হাঙগামা হয় দেখে তিনি বিচলিত হলেন আর এই দাঙগা হাঙগামার অবসানের পথ কি তা নিয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনা করলেন। এ সম্পর্কে তিনি এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে আগত নেতাদের মধ্যে বিতরন করেন। এর আগে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল তাঁর অভিভাষণে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তাদের বসবাসের জন্য পৃথক এলাকার দাবী

উত্থাপন করেন। তাঁর এই মতামত জেনে চৌধুরী রহমত আলী তাঁর নির্দিষ্ট প্রস্তাবটি প্রচার করে জানান যে, মুসলমানদের আবাসভূমির নাম হবে 'পাকিস্তান'।

পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও পাখতুনিস্থান নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। এই প্রস্তাবে বাঙলা ও আসামের কোন উল্লেখ ছিল না। তবে স্যার ইকবাল বাঙলা ও আসাম নিয়ে মুসলমানদের জন্য অপর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের কথা বলেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গাসাম'। অবশ্য ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দুই প্রান্তে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের উল্লেখ ছিল, কিন্তু পশ্চিমা মুসলিম নেতাদের চক্রান্তে দুটি রাজ্যের বদলে একটি রাজ্যের কথাই প্রচার লাভ করে। জনাব এ. কে. ফজলুল হক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তাতে দুইটী রাষ্ট্রের উল্লেখ ছিল।

মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে থাকলো এবং মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের মুসলমানদের এক বিরাট অংশ পাকিস্তান দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। কংগ্রেস ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে যে রকম তাদের শক্তির প্রদর্শনী করেছিল "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের মাধ্যমে, তেমনি মুসলিম লীগও ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে। এই দিনটি মুসলিম লীগ নেতাদের মতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ছিল। কিন্তু হিন্দুরা এটা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে ধরে নেয় এবং কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। হিন্দুরা এই দাঙ্গা বাধাবার জন্য বিহার ও যুক্ত প্রদেশ থেকে শত শত ভাড়াটিয়া গুণ্ডা আমদানী করে। কোলকাতায় প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার হিন্দু স্বেচ্ছাসেবককে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। সরকারী বিবৃতি অনুসারে কলকাতার দাঙ্গায় কুড়ি হাজার হিন্দু-মুসলমান প্রাণ হারায়।

কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া নোয়াখালিতে দেখা দেয়। সেখানে এক স্বল্পকালীন দাঙ্গা বাধে। তবে জীবন হানি একশত ও হয়নি। এই দাঙ্গাকে অনেক হিন্দু নেতারাও অর্থনৈতিক দাঙ্গা বলে আখ্যায়িত

করেন। কিন্তু বিহারের দাঙ্গা সকল নিষ্ঠুরতাকে ছাড়িয়ে যায়। এই প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা ছিল শতকরা ১৪ জন। দীর্ঘ তিন মাস প্রস্তুতির পর হিন্দুরা মুসলমান বাশিন্দাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই দাঙ্গায় কংগ্রেসের নামকরা নেতারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিহারে ৩০ হাজার মুসলমান (শিশু ও নারী সহ) নিহত হয়।

এই সব হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটা গণচেতনার সৃষ্টি হয়। যারা কংগ্রেসের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল, সেই সব মুসলমানও বুঝতে পারলো, মুসলমান হিসাবে বাঁচতে হলে পৃথক আবাসভূমির একান্ত প্রয়োজন।

॥ এগার ॥

ওয়াভেল ও মন্ত্রি মিশন

লর্ড ওয়াভেল ভারতের ভাইসরয় ও গবর্ণর জেনারেল ছিলেন ১৯৪৩ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। এই সময়ে ভারতের ভাগ্য আংশিকভাবে নির্ধারিত হয়। ভারত, পাকিস্তান ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের এটা ক্রান্তিকাল।

ওয়াভেল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্ত কাজটা খুবই দুরূহ ছিল। তার উপর বৃটেনের রক্ষণশীল মন্ত্রীসভায় ছিলেন একগুঁয়ে চার্চ্চিল। তার পরে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন ক্ষুদ্রমনা ও ভদ্রতাবিবর্জিত শ্রমিক দলীয় এটলী। কংগ্রেস মনে করতো বৃটিশ সরকার তাদের পকেটে ঢুকেছে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ হয়েছিল বেপরোয়া, কারণ তারা মনে করতো বৃটিশ সরকার তাদের বিকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

লর্ড ওয়াভেল এই সময়কার এক ডাইরী লিখেছেন। এই ডাইরীতে তিনি পর্দার আড়ালে যে ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ডাইরীতে তিনি চার্চিলকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তাঁর পরবর্তী সমালোচনার পাত্র মিঃ গান্ধী।

চার্চিল সম্পর্কে ওয়াভেল বলেছেন, চার্চিল ভারতকে ঘৃণা করতেন এবং ভারত সম্পর্কে সব কিছুই তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। ভারত সচিব এমেরীও ওয়াভেলের সংগে একমত ছিলেন। এমেরী বলেছেন: রাজা তৃতীয় জর্জ আমেরিকান কলোনী সম্পর্কে যতটুকু জানতেন চার্চিল ভারত সম্পর্কে ততটুকুই জানতেন। ১৯৪৩ সালে ভারত সম্পর্কে

মন্ত্রীসভার অধিবেশনের ব্যাপারে ওয়াভেল লিখেছেন ঃ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারত সম্পর্কে আলোচনার সময় প্রত্যেক বক্তাকে বিষয়বস্তু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং গান্ধী যে এক ভয়ানক ব্যক্তি, সেই কথাই তাদের বোঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

চার্চিল ওয়াভেলের উপর চরম বিরক্তি প্রকাশ করতেন। কারণ, তিনি ভারতকে শান্ত করার জন্য ওয়াভেলকে বড়লাট করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াভেল নিজেই ভারতের পক্ষে কথা বলায় চার্চিল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। ওয়াভেলের ভাষায় ঃ "আমার ভারত সম্পর্কে উদার মনো-

ভাবের জন্য এবং যা ন্যায্য তা নিদ্বির্ধায় প্রকাশ করি, সে কারণে চার্চিল ক্ষেপে আগুন হতেন। "বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের সময় আমি চার্চিল গবর্নমেন্টকে পর পর কয়েকটি তারবার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ করি যে অনতিবিলম্বে কয়েক জাহাজ খাদ্যশস্য বঙ্গদেশকে বাঁচানোর জন্য পাঠানো হোক। সে সম্পর্কে উচ্চবাচ্য না করে তিনি নির্দেশ পাঠালেন যে, সিংহলে প্রতিমাসে ২৫ হাজার টন চাউল পাঠাও। অজ্ঞতার একটা সীমা থাকা দরকার, চার্চিলের তাও ছিল না।"

৪৩ সালে মিঃ গান্ধীকে দারুণ অসুস্থতার জন্য জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি দেওয়ার পর গান্ধীজী ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকেন। এই সংবাদ পেয়ে চার্চিল একজন নীচ ব্যক্তির ন্যায় টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কৈফিয়ত চাইলেন যে, গান্ধী কেন এখনও-বেঁচে আছে।

লর্ড ওয়াভেল ভারতকে বুঝবার চেষ্টা করতেন এবং অভিযোগ করতেন যে, তাঁর গবর্নমেন্ট ভারতের সমস্যার গভীরে না গিয়ে উপেক্ষা করেছেন এবং এক এক সময় অবমাননাকর পন্থায় দমননীতি চালিয়েছেন। তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন যে বৃটিশ সরকারের ভারত সম্পর্কে অনুসৃত পন্থা আগাগোড়াই ভুল ছিল। তাই তিনি ১৯৪৪ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে চার্চিলকে তারযোগে জানান যে আমাদের এমন

পন্থা গ্রহণ করা উচিত, যা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের মন জয় করতে সক্ষম হয়। শক্তির দ্বারা ভারত শাসন করতে যদি না চান, এবং তা আর সম্ভব নয়, তাহলে মস্তিষ্কের পরিবর্তে অন্তকরণ

দিয়ে শাসন করতে হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, সেজন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

১৯৪৪ সালের ৯ই আগস্ট লর্ড ওয়াভেল তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন:
আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে, আমরা ভারতীয়দের মনোভাবের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে শিখিনি এবং তাদের ভদ্রতার প্রতি কোনরূপ বিচার-বিবেচনার পরিচয় দেই নি।

কংগ্রেসের প্রতি ওয়াভেলের যে আস্থা প্রথম দিকে ছিল, তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৪৩ সালের ৭ই অক্টোবর তিনি চার্চিলকে নিন্দা করেছেন, কারণ চার্চিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করতেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ২রা নবেম্বর তিনি আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং মনে করতেন কংগ্রেসের প্রতি বৃটিশ সরকারের অতি নমনীয় মনোভাবের জন্য মুসলিম লীগের প্রতি অবিচার করেছেন। তাঁর মতে, "কংগ্রেস বৃটিশ শাসনের অধিনে

শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অনিচ্ছুক, পরিবর্তে তারা ক্ষমতা হস্তগত করতে উদগ্রীব। ক্রিপস মিশন এই দুর্বলতা ফাঁস করে দেয় এবং আমরা যে, ধাপ্পাবাজীর আশ্রয় নিয়ে কাজ করছি, তা ধরা পড়ে যায়। তাঁর মতে গান্ধীজী সাময়ীকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু সুযোগ বুঝে তিনি পিছু হটতে ওস্তাদ। ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার জন্য গান্ধীজীই দায়ী। তাঁর চল্লিশ বৎসরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বৃটিশ শাসন ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত করে ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত করা। সেদিক থেকে তিনি যে কোন পন্থা গ্রহণ করতে পারতেন, তাঁর তথাকথিত সত্যসাধনা থেকে বিচ্যুত হতে তিনি দ্বিধা করতেন না। তাঁর বক্তৃতা ও বিবৃতি এমন দ্ব্যর্থবোধক যে, তিনি কি যে করতে চান; তা নিশ্চিত করে বলা যেত না। তিনি রাজনীতির সঙ্গে প্রার্থনা জড়িয়ে প্রার্থনাকেই রাজনীতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন।"

"মিঃ জিন্নাহ্ সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি সোজা কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু তাঁর ব্যবহার অনেক

সময় ভদ্রতার সীমা লংঘন করতো। তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং দাম্ভিক প্রকৃতির। সিমলা কনফারেন্সে তিনি আইনগত যুক্তিত তর্কের দ্বারা আমাকে প্রায় কোনঠাঁসা করেছিলেন। তাছাড়া কোন কথার জবাব তিনি সরাসরি দেন নি। নেহরু সম্পর্কে ওয়াভেল লিখেছেন ঃ নেহরুকে ব্যবহারিক রাজনীতিতে টেনে আনা কষ্টকর ব্যাপার। তাঁর ব্যবহার নম্র ও বন্ধুত্বপুর্ণ, সেজন্য আমি তাঁকে পছন্দ করতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি উগ্রপন্থী হয়ে উঠছেন। আমার মনে হয়, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছেন। তবে তাঁর বিশ্বাস যে, তিনি দেশকে সংহত করে বৃটিশ সরকারের পক্ষে বিপদ সৃষ্টি করতে পারবেন।

১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে ভারতে ক্যাবিনেট মিশন আসে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সংগে আলাপ-আলোচনাই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য। এই মিশনে ছিলেন স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস, স্যার এ. ভি, আলেকজাণ্ডার (ফাষ্ট লর্ড অব এডমিরালটী) ও লর্ড পেথিক লরেন্স (সেক্রেটারী অব ষ্টেট)। ওয়াভেল এই মিশনকে "তিন অথর্ব" বলে উল্লেখ করেছেন এঁদের ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি যে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে বলা হয় ঃ

"সেক্রেটারী অব ষ্টেট একজন ভাবপ্রবণ, দাম্ভিক এবং আত্মপ্রসাদ অনুভবকারী কিন্তু গান্ধীজী অপেক্ষা অহিংসবাদী। হিন্দু রাজনীতিকদের যুক্তির বিরুদ্ধে তিনি এত বেশী কথা বলেছেন, যার ফলে তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে গিয়েছেন। ফলে তাঁর বক্তব্য বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়েছে।

ক্রিপস ছিলেন মিশনের যোগ্যতম ব্যক্তি। আইনগত দিক থেকে তাঁর বক্তব্য ছিল তীক্ষ্ণ এবং নিরপেক্ষ। সমঝোতায় আসার মত করে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। খালি হাতে তিনি ফিরে যাবেন না, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ জন্য আন্তরিকতার পরিচয় তিনি দিতে পেরেছিলেন, শঠতার আশ্রয় নেন নি।

আলেকজাণ্ডার ছিলেন সৎ ও বুদ্ধিমান। আলোচনার প্রথম দিকে তিনি কোন কথা বলেননি, কারণ ভারত সম্পর্কে তিনি কিছুই আগে জানতেন না। কিন্তু শেষ দিকে তিনি অন্য দু'জনের চেয়ে বেশী কাজের কথা বলেছেন।

মিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াভেল লিখেছেন, 'সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক পন্থা বেছে নেয়ার পরিবর্তে মিশন নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহন করে এবং আলোচনার নাম করে ভারতীয় নেতাদের নিয়ে খেলা করতে শুরু করে। প্রথম থেকে আমি বুঝতে পারি যে, ক্রীপস কংগ্রেসের দিকে ঝুকে পড়েছেন। কারণ মিশন ভারতে আসার আগে থেকেই ক্রীপস ও নেহরুর মধ্যে গোপনে পত্রবিনিময় হয় এবং এই পত্রে মিশনের লক্ষ্য সম্পর্কে নেহরুকে অবহিত করানো হয়। এটা নীতির দিক থেকে অত্যন্ত আপত্তি কর।

বাছাই করা কয়েক জন নেতার সংগে আলোচনার দ্বারা সময় নষ্ট করা হয়েছে। কারণ কোন হিন্দুই স্বীকার করবেনা যে, মুসলমানদের কোন অভিযোগ থাকতে পারে এবং কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকতে পারে। আর কোন মুসলমানই বিশ্বাস করবে না যে, হিন্দুদের কাছে মুসলমানরা কোন সুবিচার ও সদ্ব্যবহার পাবে। আমার মনে হয় মিশন সম্পূর্ণ অবাস্তব পন্থায় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

সিমলা বৈঠক সম্পর্কে ওয়াভেল বলেন ঃ যে পন্থায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সিমলায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তা অবিবেচনাপ্রসূত। মিশনের পক্ষে এটা হয়ত তাদের বিজয় মনে হতে পারে কিন্তু একজন সৈনিক হিসাবে আমার অভিমত এই যে, আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে যে টুকু সাফল্য দেখা যাচ্ছিল, তা নষ্ট করে ফেলেছি।

আলোচনা অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। জিন্না ও নেহরু যখন ঐক্যমতে পেঁাছিতে পারলেন না বলে ঘোষণার পরই আলোচনা ভেঙ্গে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে আমরা পিছনে

হাঁটতে শুরু করি এবং উভয় পক্ষের মতামত লিখিতভাবে পেশ করার অনুরোধ জানিয়ে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়া হয়েছিল। গান্ধীজীর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়ায় ওয়াভেল বিরক্তিবোধ করেছিলেন।

গান্ধী যখন একগ্লাস পানি পানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন ক্রিপস তাঁর সেক্রেটারীকে পানি আনতে হুকুম করলেন। বিলম্ব হচ্ছে দেখে তিনি নিজেই পানি আনতে ছুটলেন। গান্ধীজী অহিংসার দেবতা হতে পারেন, কিন্তু আলোচনায় তাঁর নম্রতার কোন পরিচয় মেলেনি। আমি মনে করি মুসলমানদের উপর অবিচার করা হয়েছে। সাহস, নৈতিকতা ও ভদ্রতার দিক থেকে তারা অনেক উন্নত কিন্তু অর্থ ও শিক্ষার দিক থেকে তারা মার খাচ্ছে। জিন্নাহ তাঁর নীতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনমনীয় মনোভাব ব্যর্থতার জন্য খানিকটা দায়ী।

মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী খাঁ ওয়াভেলকে বলেছিলেন, "বৃটিশ শাসকরা যদি কংগ্রেসকে ভয় করে এবং মিশনের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় তাদের দুর্বলতার কারণে, তাহলে ভারতের দশ কোটি মুসলমানকে নেকড়ের সামনে ফেলে দেয়া হবে। সে অবস্থায় মুসলমানদের নিজেদের পথ নিজেদেরই বেছে নিতে হবে। কংগ্রেসের কাছে সুবিচারের আশা বৃথা।"

লর্ড ওয়াভেলের ব্যর্থতা, একজন সৈনিকের ব্যর্থতা। রাজনীতিকদের শঠতা ও দুমুখো নীতিকে তিনি বরদাশত করতে পারেননি, সেজন্য অত্যন্ত অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাঁর চাকুরী খতম করা হয়। দু'মাসের নোটিসে তাঁর অবসর গ্রহণ করার নিয়ম, সে জায়গায় মাত্র এক মাসের নোটিসে তাঁকে অপসারিত করা হয়।

ক্রিপস ওয়াভেল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে ওয়াভেল সম্পর্কে শুধু একটি কথাই বলা যায় যে, তিনি রাজনীতিক ছিলেন। ওয়াভেল এই মন্তব্যকে তাঁর প্রতি প্রশংসাবাণী মনে করেছিলেন। ০

---

০ ওয়াভেল—দি ভাইসরয়জ জার্নাল—সম্পাদক : পেনডেরেল মুন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

বৃটিশ সরকার ভারতীয় নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ত্যাগ করবে এই তাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু ক্ষমতা কাদের কাছে হস্তান্তর করবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় তা করা হবে এ নিয়ে নেতাদের সংগে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো. বড়লাট ওয়াভেল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সংগে দিনরাত আলোচনা চালাতে লাগলেন; কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছুতে পারলেন না। একান্ত অপারগ হয়ে লর্ড ওয়াভেল পরম বিতৃষ্ণায় ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর সমস্যা নিয়ে যে ফাইল তৈরী করলেন, তার নাম দিলেন অপারেশন ম্যাড হাউস'।

দিল্লীতে
প্রাসাদ
ষড়যন্ত্র

বৃটিশ মন্ত্রীসভা লণ্ডনে বসে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। তারা মনে করেছিলেন লর্ড ওয়াভেলের অযোগ্যতা সমস্যা সমাধানের একমাত্র পরিবন্ধক। কাজেই তারা কুটনীতিক শালীনতার মাথায় পদাঘাত করে রাজ বংশের লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় করে পাঠালেন এবং লর্ড ওয়াভেলের নিকট থেকে কাজের ভার বুঝে নেবার নির্দেশ দিলেন। এটা ১৯৪৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের ঘটনা।

বড়লাট ভবনে সে সময় কি ঘটেছিলো তার বিবরণ একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী সাংবাদিক যথাক্রমে ল্যারি কলিন্স ও ডমিনিক লাপিয়েঁরে সে সময় ইউরোপের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তার কিছু অংশ পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

নয়াদিল্লীর বড়লাট ভবন লর্ড ওয়াভেল, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে কাজের ভার বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত। তিনি প্রসংগক্রমে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আপনাকে আমার জায়গায় পাঠানো হয়েছে। মাউন্ট ব্যাটেন উত্তরে বললেন, আপনি কি মনে করেন আমি এই কাজের উপযুক্ত নই?

ওয়াভেল ঃ না, আমি সেভাবে কথাটা বলিনি। আপনাকে এমন একটা কাজের ভার দেয়া হয়েছে যা সম্পাদন করা অসম্ভব। আমি সব রকমের চেষ্টা করেছি কিন্তু সমাধানে ব্যর্থ হয়েছি। হোয়াইট হল থেকেও কোন সুপরামর্শ আসছেনা। কাজেই এখানে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আলমারী থেকে একটা ফাইল

বের করে মাউন্টব্যাটেনের হাতে দিয়ে বললেন, এই নিন। এই ফাইলটার আমি নাম দিয়েছি, 'অপারেশন ম্যাড হাউস'। সত্যি এটা পাগলা গারদের সমস্যার মতই একটা কঠিন ব্যাপার। আমি যে কাজে ব্যর্থ হয়েছি; আপনি সেটায় সাফল্য অর্জন করতে পারলে আমি খুশী হবো। পিছনের ঘরে লেডি মাউন্টব্যাটেন। তিনি খানসামাকে বললেন, তার কুকুর ছানার জন্য কিছু খাবার এনে দিতে। খানসামা একটা প্লেটে দুটি আস্ত মুর্গীর রোষ্ট নিয়ে এলো। লেডী মাউন্টব্যাটেন চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, লন্ডনে যখন আমরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কঠোর কৃচ্ছ সাধন করছি, তখন কুকুরের জন্য দু'দুটো রোষ্ট? তিনি আর কোন কথা না বলে সোজাসুজি গোসলখানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং দুটো রোষ্টই শেষ করে বেরিয়ে এলেন।

মাউন্টব্যাটেন বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করলেন এবং ওয়াভেল দেশ ত্যাগ করলেন। সুচতুর মাউন্ট ব্যাটেন এরপর শুরু করলেন নেতাদের সংগে পৃথক পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা। এ জন্য তিনি পর পর চার জন নেতাকে আমন্ত্রণলিপি পাঠালেন। সর্ব প্রথমে তার ছাত্র জীবনের বন্ধু জহুয়াহেরলাল নেহেরু, তারপর গান্ধী, মিঃ জিন্নাহ ও বল্লভ ভাই প্যাটেল। নেহেরুজী মাউন্টব্যাটেনের সংগে আলোচনার শুরুতেই গান্ধিজীর প্রতি তাঁর বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ অনুসন্ধান ও তার নিরসনের জন্য চেষ্টা না করে কেবল মাত্র দাংগা উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে দাংগা প্রশমিত করবার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি নোয়াখালীতে পায়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করে এখন ক্লান্ত পায়ে মলম মালিশ করছেন। এটা ঠিক যেন রোগ বিদূরণের পরিবর্তে রোগ উপশমের চেষ্টা।

নেহেরুজীর এই কথায় মাউন্টব্যাটেনের মনে একটু সাহস দেখা দিলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভারতীয় নেতাদের মধ্যে মত-বিরোধ বিদ্যমান। বিশেষ করে গান্ধিজী ও নেহেরুর মধ্যে যদি মতের গরমিল

থাকে তবে তাঁর কাজের অনেকখানি সুবিধা হবে। অন্ততঃ এদের দুর্বলতা তাঁর চোখে ধরা পড়বে।

গান্ধিজী মাউন্টব্যাটেনের সংগে আলোচনায় বসলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, আপনি দয়া করে ভারত ভাগ করবেন না। যদি তা করেন তাহলে ভারতের উপর দিয়ে রক্তের নদী বয়ে যাবে।

মাউন্টব্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন শেষ সমাধান হচ্ছে ভারত ভাগ করা। কিন্তু ভাগ না করে সমস্যা সমাধানের উপায় কি বলতে পারেন?

গান্ধিজী জবাবে বললেন, শিশুকে দ্বিখণ্ডিত না করে মুসলমানদের হাতে তুলে দিন। ত্রিশ কোটি হিন্দুকে মুসলিম শাসনের অধীনে ছেড়ে দিন। এবং মিঃ জিন্নাকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করুন। মাউন্টব্যাটেন বললেন, আমি ভারত ভাগ করতে চাইনা। কিন্তু আপনি যে জিন্নার হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চাচ্ছেন, তাতে কি কংগ্রেস রাজী হবে?

গান্ধিজী বললেন, কংগ্রেস ভারতকে অখণ্ড রাখতে চায়। মাউন্টব্যাটেন বললেনঃ মিঃ জিন্নার প্রতিক্রিয়া কি হবে বলতে পারেন? এই প্রশ্নে গান্ধি নীরব থাকলেন। মাউন্টব্যাটেন আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যদি কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন আদায় করে আনতে পারেন, তাহলে ভারত বিভক্তির প্রস্তাব আমি বাতিল করতে পারি। গান্ধিজী এই সময় উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমি যা বলি তা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথেই বলি। কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন আনার প্রয়োজন নেই। আমি নিজে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সফর করে গণ সমর্থন আনবো।

গান্ধিজীর পর মিঃ বল্লভ ভাই প্যাটেল বড়লাটের সংগে দেখ করলেন। নেহেরুজী ও প্যাটেল জিন্নাকে ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন। এতে মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন যে কংগ্রেস নেতারা মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বের প্রভাব থেকে বেরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছেন।

চতুর্থ নেতা, যিনি বড়লাটের সংগে সাক্ষাৎ করলেন তিনি ভারতের দশকোটি মুসলমানের একচ্ছত্র নেতা এবং যার নেতৃত্ব সম্পর্কে মুসলমান জননেতাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। মিঃ জিন্না দীর্ঘ সময়ব্যাপী বড়লাটের সংগে আলোচনা করলেন এবং জোরের সঙ্গেই বললেন, ভারতকে অখণ্ড রাখার সব রকম চেষ্টাই আমি করেছি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। কাজেই ভারত ভাগ করা ছাড়া অন্য কোন পথ আমার জানা নেই। আর দশকোটী মুসলমানকে চির দিনের জন্য হিন্দুর দাসত্ব নিগড়ে বেঁধে রাখা সমীচীন হবে না। জিন্না বড়লাট ভবন ত্যাগ করলেন। মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রেস এ্যাটাচি কাম্বেল জনগনকে বললেন, এ একটা শক্ত মানুষ দেখলাম। যাকে সারাক্ষণ ধরে কথা বলেও একটু নরম করতে পারলাম না। মাউন্টব্যাটেনের এই মন্তব্য খুবই সত্য। জিন্নাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। কারণ, তাঁর জীবন ছিল নিয়মানুবর্তিতার একটা আদর্শ বিশেষ। নেহেরুজীকে জিন্নাহ্ বলতেন, "পিটারপ্যান।" বলতেন, নেহরু উঁচু দরের পন্ডিত মানুষ। তার ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল। রাজনীতিক হিসেবে তিনি ব্যর্থ। নেহেরু গোঁড়া হিন্দু হয়েও পাশ্চাত্য শিক্ষার ভদ্র আবরণে তাঁর গোঁড়ামি ঢেকে রেখেছেন। আর গান্ধীজী সম্পর্কে জিন্নাহ্ বলতেন, তিনি ধূর্ত্ত শৃগাল। এবং পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দু। এক সময় গান্ধিজী জিন্নার বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। তাঁর সারা পেটে কাদা মাখানো। মিঃ জিন্না গান্ধীজীকে এই অবস্থায় দেখে একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, মিঃ গান্ধি, এ রকম কাদা মেখে ঘরে শুয়ে থাকতে হয়। বাইরে বেরুতে নেই।

প্রকৃতপক্ষে মিঃ জিন্নার কোন বন্ধু ছিল না, কোন চাটুকর জিন্নার পাশে দেখতে পাওয়া যেতো না। তবে ছিল তাঁর অগণিত অনুসারী। জীবনে সঙ্গী কেউ ছিল না, ছিল ভগ্নিদের একজন দাঁতের ডাক্তার ফাতেমা। তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র একটি স্বপ্ন নিয়ে—সে স্বপ্ন ছিল পাকিস্তান।

কংগ্রেস মিঃ নেহরুকে তাদেয় মুখপাত্র করে পাঠালন মাউন্টব্যাটেন সমীপে। তাদের একমাত্র দাবী ভারত ভাগ হোক, কিন্ত যে যুক্তিতে ভারত ভাগ হবে সেই যুক্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করতে হবে। কারণ

পাঞ্জাব ও বাংলার অগনিত অমুসলমান মুসলমান শাসনে থাকতে চাইবে না।

নেহরুজী যখন মাউন্টব্যাটেনের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করলেন, তখন মাউন্টব্যাটেন নেহেরুকে বলেছিলেন, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা আজ এমন স্তরে পেঁাছে গেছে যে, আপনারা ভারতকে ছোট ছোট অনেকগুলি টুকরো করে ছাড়বেন, যে গান্ধীজী আপনাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এতখানি এগিয়ে এনেছেন, তাকে আজ আপনারা প্রত্যাখান করছেন, তার উপদেশ পাগলের প্রলাপ মনে করছেন। কিন্তু জানবেন, এজন্য একদিন আপনাদের অনুশোচনা করতে হবে। দেশকে খন্ডবিখন্ড করার দায়িত্ব কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের সব নেতাদের কাঁধে পড়বে এবং এর বিষ্ময় প্রতিক্রিয়ার সকল দায়িত্ব ভারতের নেতাদের অনেককাল ধরে বহন করতে হবে।

'৪৭ সালের ২রা জুন তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মিঃ জিন্নার সঙ্গে পৃথক আলাপে বসলেন। তাঁকে জানানো হল যে, ভারত বিভক্তির পরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহন করেছে, সুতরাং তাঁর আর বলার কিছুই নেই। তিনি সকল দলের নেতাদের সম্মেলন ডাকবেন এবং সেই সম্মেলনে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করবেন। কোন নেতাই বক্তৃতা করবেন না, শুধু মাথা নেড়ে তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে।

পরদিন, ৩রা জুন মহাত্মা গান্ধি, জওয়াহেরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও মিঃ জিন্নাহকে বড়লাট ভবনে ডেকে পাঠানো হল। অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র রেকর্ডিং ইউনিট পূর্বে হতে সেখানে হাজির ছিল। বেতারে মাউন্টব্যাটেন প্রথমে তাঁর ভারত ভাগ করার খসড়া প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। নেহরুজী অতঃপর বললেন ঃ যদিও এই প্রস্তাব আমি আপনাদের গ্রহণ করতে বলছি, কিন্তু আমার হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হচ্ছে।

মিঃ জিন্না ইংরেজী ভাষায় বললেন, "ভারতের মুসলমানগণ একটি ইসলামী রাষ্ট্র পাচ্ছে।" তাঁর বক্তৃতা একজন বেতার ভাষ্যকার উর্দু তর্জ্জমা করে শোনালেন। গান্ধিজী ও প্যাটেলকে কিছু বলতে দেওয়া হলো না।

৪ ঠা জুন তারিখে বড়লাট ভবনে দেখা গেল এককালের অর্ধ-উলঙ্গ বিদ্রোহী ফকীর কম্পিত পায়ে মনু ও আভার কাঁধে ভর দিয়ে সিঁড়ি

বেয়ে উঠে ভিতরে গেলেন। মাউন্টব্যাটেনের প্রেস এটাচী তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। তাঁকে ডানাভাঙ্গা পাখীর মত বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধিজীকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিলেন। গান্ধিজী বসতে বসতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন ঃ অত্যন্ত দুঃখজনক, অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। এজন্য আমরা সংগ্রাম করিনি, হিন্দু মুসলমান চিরদিনের মত পর হয়ে গেল, চিরদিনের মত পরস্পরের দুশমন হয়ে গেল।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধিজীকে বুঝাতে থাকেন যে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা যে রকম বেড়ে চলেছে তাতে একটা পরিকল্পনা না দিয়ে উপায় ছিল না। আমি নিজে ভারত বিভাগের পক্ষে ছিলাম না, কিন্তু আপনার অনুসারী কংগ্রেস নেতারাই ভারত বিভাগের জন্য পাগল হয়ে গিয়াছে। তবে শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি একটা নির্দ্দেশ দিয়েছি। সমস্ত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকা হবে। এই অধিবেশনে যদি আমার পরিকল্পনা গ্রহন না করা হয় তাহলে ভারত অখণ্ডই থেকে যাবে। তখন কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় আসা হয়ত সম্ভব হবে।

১৯৪৭ সালের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে বাংলা এক দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করে। যদিও বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু তবুও প্রাদেশিক পরিষদের মুসলমান আসনের সংখ্যা ২৫০ এর মধ্যে ১১৯টি দেয়া হয়। এটা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফল। সাধারণ আসনের সংখ্যা ৮০, এ্যাংলোইণ্ডি-য়ানদর জন্য ৪, ভারতীয় খৃষ্টিয়ানদের জন্য ২, ইউরোপীয়ানদের জন্য ১১, জমিদার ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য ৩৪ টি আসন সংরক্ষিত ছিল। শেষোক্ত শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল হিন্দু, সুতরাং ক্ষমতার ভারসাম্য এই সংখ্যালঘু শ্রেণীর হাতেই ছিল। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে মুসলিম লীগ ১১৩টি এবং কংগ্রেস ৮৭টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ দলের নেতা মিঃ এইচ, এস সোহরাওয়ার্দী কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের বিরোধিতায় তা' ব্যর্থ হয়। ভারত বিভাগ হওয়া পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি যে ধরণের তাতে বাংলাকে বিভক্তিকরণের চেষ্টা করা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে অখণ্ড রাখাই যুক্তি সংগত বলে, মিঃ সোহরাওয়ার্দী, মিঃ শরৎ চন্দ বসু, মিঃ কিরণ শঙ্কর রায় প্রভৃতি নেতাগণ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সময় অন্যান্য প্রদেশে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে, কোনরূপ আলাপ-আলোচনা বা বিচার বিবেচনা অসম্ভব হয়ে পড়লো। এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে কোনরূপ মীমাংসার পথ খুঁজে না পেয়ে বৃটিশ সরকার কংগ্রেস-এর নিকট কেন্দ্রের ক্ষমতা হস্তান্তরের উদযোগ নিচেছন দেখে মিঃ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালে ঘোষণা করেন, যদি কংগ্রেসের হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় তাহলে তিনি বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন এবং একটা স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবেন। কেন্দ্রকে দেয় সকল প্রকার ট্যাক্স খাজনা বন্ধ করে দেয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী মুসলমানরা মুক্ত বাংলা এই আশায় চেয়েছিল যে, বাংলায় মুসলিম আধিপত্য থাকবে।

পক্ষান্তরে, হিন্দু কংগ্রেস মুক্তবাংলা স্বীকার করে নিতে পারতো যদি বাংলায় হিন্দু আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হতো। কিন্তু প্রদেশ-ব্যাপী মুসলিম আধিপত্যের মোকাবেলায় হিন্দুরা যে সারা প্রদেশে এবং বিশেষ করে কলকাতায় মুসলিম আধিপত্যের শিকার হবে তা' তারা বুঝতে পেরেছিল।

মিঃ সোহরাওয়ার্দী ভাইসরয়ের নিকট কিছু সময় চাইলেন যাতে তিনি পাকিস্তানের অন্তভুক্ত না হয়েও বাংলার অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারেন তার চেষ্টা চালাবার জন্য। মিঃ জিন্নাহও জানিয়ে দিলেন যে, কলকাতা ছাড়া বাংলা অর্থহীন। কংগ্রেস নেতা মিঃ কিরণ শঙ্কর রায় জানালেন যে যুক্ত নির্বাচন যদি মুসলমানরা মেনে নেয় তাহলে তিনি মিঃ সোহরাওয়ার্দীর সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ণ মিঃ সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন, এবং কলকাতাকে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত পরিচালনায় রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভাইসরয়ের নিস্পত্তিমূলক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ওয়াদা প্রত্যাহার করে নেন।

মিঃ সোহরাওয়ার্দী'র মূল প্রস্তাব ছিল যে, বাংলাকে একটি স্বাধীন ইউনিট হিসেবে ধরে নিয়ে তার হাতে রাজের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। জওয়াহেরলাল নেহেরু এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেন। লর্ড মাউন্টব্যাটন শিমলা থেকে দিল্লী ফিরে এসে মিঃ সোহরাওয়ার্দী ও মিঃ ফজলুর রহমানের সংগে দেখা করেন এবং মাউন্টব্যাটনের পরিবর্তিত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দেন যে, প্রদেশগুলি স্বাধীন সত্বা হিসেবে থাকতে পারবে না। তাদের হয় হিন্দুস্তানে না হয় পাকিস্তানে যোগ দিতে হবে।

বড়লাট অবশ্য বলেছিলেন যে, বঙ্গীয় আইন সভায় যদি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং গভর্নর যদি সুপারিশ করেন তাহলে মিঃ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। মিঃ সোহরাওয়ার্দী জানেন যে মিঃ কিরণ শঙ্কর রায় ও মিঃ শরৎ চন্দ্র বসুর সংগে তার আলাপ হয়েছে এবং তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

এমনকি, বাংলাকে "সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিক" ঘোষণার কথা তাঁরা চিন্তা করছেন। মাউন্টব্যাটন জানালেন যে, "সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিক" করলে কমনওয়েলথের সদস্য পদ দানের অসুবিধা সৃষ্টি হবে। একথাও জানালেন যে, দেশ বিভাগের পর স্বাধীন বাংলা যদি ভারতের সংগে যোগ না দেয় তাহলে স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রস্তাব তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ নিশ্চিতভাবে পাকিস্তানের সংগে যোগদান করবে। এতদসত্বেও লর্ড মাউন্টব্যাটেন আশ্বাস দেন যে হিন্দু ও মুসলিম কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে যদি বাংলা একমত হয় তাহলে তিনি মিঃ গান্ধীসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে রাজী করবার চেষ্টা করবেন যাতে স্বাধীনতার ঘোষণা ক্ষেত্রে বাংলাকে বিভক্ত করার প্রস্তাব না থাকে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ইতিমধ্যেই লণ্ডন থেকে ঘুরে এলেন এবং মিঃ সোহরাওয়ার্দির কাছে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হলেন। মিঃ সোহরাওয়ার্দী জানালেন যে, স্বাধীন বাংলা গঠনের ব্যাপারে মিঃ কিরণ শঙ্কর রায় কংগ্রেস নেতাদের রাজী করাতে পারেন নি। তবে মিঃ সোহরাওয়ার্দী জানালেন দেশ বিভাগের সময় কলকাতায়

ছয় মাসের জন্য উন্মুক্ত শহর রাখা হোক, অন্যথায় ভয়ানক রকমের দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং শহরের বিপুল ক্ষতি হতে পারে। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন মিঃ ভি পি মেনন-কে সর্দার প্যাটেলের নিকট পাঠালেন এবং শহরকে ছয় মাসের জন্য মুক্ত রাখার ব্যাপারে তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন। সর্দার প্যাটেল এক কথায় জানিয়ে দিলেন যে, ৬ মাসের জন্য কেন ৬ দিনের জন্যও নয়। এরপর ২০ শে জুন তারিখে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেমবিলিতে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যদি বাংলা অখণ্ড থাকে, তা হলে সে পাকিস্তানে যোগদান করবে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে বাংলাকে-বিভক্ত করা হোক। সুতরাং কংগ্রেস ও হিন্দুরাই বাংলাকে বিভক্ত করলো। অথচ ১৯০৬ সালে এই হিন্দুরাই বাংলাকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল এবং বঙ্গ বিভাগ রদ করিয়েছিল।

জওয়াহরলাল নেহেরুর দূর্ভাবনার অন্ত নেই। মুসলিম লীগের দেশ-বিভাগের দাবী যদি ইংরেজরা মেনে নেয়, তা হলে অখণ্ড ভারত গঠনের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। বঙ্গদেশ সম্পর্কে তাঁর হতাশা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু ভারতের পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান কখনও কংগ্রেসের বাইরে যেতে দেয়া যায় না। নেহেরুর বিশ্বাস, সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি আছে, তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন খান আবদুল গফফার খান। গফফার খান "খোদাই খিদমতগার" আন্দোলনের নেতা এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ কর্মধারায় বিশ্বাসী। তিনি দীর্ঘদেহী মানুষ, লম্বায় ছয় ফিট সাত ইঞ্চি। মুসলিম লীগ নেতা সরদার আব্দুল কাইয়ুম খাঁ বলতেন, "এ ম্যান সিক্স ফিট সেভেন ইঞ্চেস হাই উইদাউট আপার চেম্বার" অর্থাৎ লম্বা মানুষ, কিন্তু মাথায় বুদ্ধি নেই। তবুও সীমান্তের পাঠানদের এক অংশকে তিনি তার দলে টানতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁদের বোঝানো হয়েছিল যে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য মহাত্মা গান্ধী সংগ্রম চালাচ্ছেন। পাঠানরা ভয়ংকর রকম ইংরেজ বিদ্বেষী, সুতরাং ইংরেজ বিতাড়নে যে কোন সংগ্রামে তারা শরীক হতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে, সীমান্তের বিরাট সংখ্যক জনতার কাছে মুসলিম লীগ প্রচার চালা-

সীমান্ত সফরে নেহরু

ছিল যে কংগ্রেস যদি কামিয়াব হয়, তাহলে ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে সীমান্তের অধিকাংশ জনতা কংগ্রেসের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময় জওয়াহরলাল নেহেরু ঠিক করলেন যে তিনি সীমান্ত সফরে যাবেন ও সীমান্তবাসীদের কংগ্রেসের সপক্ষে আনবেন। নেহেরুর এই বিশ্বাসের কারণ ১৯৪৫ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে সীমান্ত প্রদেশে ৫০টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসন কংগ্রেস লাভ করে। নির্বাচনের এই ফলাফল দেখেই মিঃ নেহেরু সাহস করলেন যে সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে; কিন্তু তিনি জানতেন না যে, সীমান্তের মুসলমানেরা একমাত্র সীমান্তবাসীর নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চায়, হিন্দু প্রাধান্য তারা কখনই মেনে নিতে পারে না। ১৯৪৭ সাল থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে, কংগ্রেস কর্তৃক হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার আশংকায় মুসলমানরা ধীরে ধীরে কংগ্রেস-এর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে শুরু করেছিল। এই প্রত্যাহার আরো ত্বরান্বিত হতো যদি প্রাদেশিক নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে বসাতে পারতো।

খান আবদুল গফফার খান ও তাঁর ভাই ডাঃ খান সাহেব সম্পর্কে মওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছিলেন ঃ

> খান ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব পাঠানদের উপর যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু অনেকখানি অতিরঞ্জিত চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে খান ভ্রাতৃদ্বয় ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যারা আছে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী। নেহেরু ১৯৪৬ সালে অক্টোবর মাসে ব্যক্তিগত-ভাবে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে সীমান্ত সফর করতে চাইলেন। তাঁর ধারণা উপজাতীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তিনিই গড়ে তুলেছেন এবং কংগ্রেস-বিরোধী কার্যকলাপ বৃটিশ আমলাতন্ত্রের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়। মওলানা আজাদ তাঁকে জানালেন যে তাঁর এই সফর সময় উপযোগী হবে না, বরং এতে তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

মহাত্মা গান্ধীও মওলানা আজাদের বক্তব্য সমর্থন করলেন। সীমান্তের গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারো পেশোয়ার থেকে দিল্লী এসে নেহেরুকে এই অনুরোধ জানালেন যে তিনি যদি এখন সীমান্ত সফরে যান তাহলে

সীমান্তের কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে দুর্বল করা হবে এবং মুসলিম লীগের অবস্থা আরো শক্তিশালি হবে। শুধু তাই নয়, হিন্দু-বিরোধী মনোভাব উগ্রতর হবে। নেহেরু যদি অখণ্ড ভারত চান তাহলে সীমান্তের মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য তাঁকে ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

নেহেরু কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না। তাঁর স্বভাবজাত এক-গুয়েমিবশত তিনি খান আবদুল গফফার খানকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত সফরে বেরুলেন। মুসলিম লীগ এই সুযোগ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করলো। তারা নেহেরুর সফরের পূর্বমুহূর্তে উপজাতীয় নেতা মানকী শরীফের পীর সাহেবকে উপজাতীয় অঞ্চল সফরের জন্য পাঠালো। তিনি প্রচার করতে লাগলেন যে বাদশা খানের (খান আবদুল গফফার খান) সঙ্গে হিন্দুনেতা নেহেরু সীমান্ত সফরে আসছেন।

তারা সীমান্ত প্রদেশকে হিন্দু ভারতের গোলাম বানাবে। এই ঘটনার সঙ্গে ১৮৮৬ সালের একটি ঘটনার তুলনা করা যেতে পারে। সম্রাট আকবর তাঁর অনুগত হিন্দু রাজা বীরবলকে একবার সসৈন্যে সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চলে সফরে পাঠিয়েছিলেন। বীরবলকে পাঠানরা দারুণ ঘৃণা করতো। তারা বীরবলকে তার ৮০০০ মোগল সৈন্যসহ হত্যা করে।

নেহেরু যখন পেশোয়ার বিমান বন্দরে উপস্থিত হন তখন মুসলীম লীগের এক বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁর প্রতি মারমুখো হয়ে ওঠে। নেহেরু কোন রকমে পিছন দিক থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। পর দিন ওয়াজিরীস্থানে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। প্রদেশের উত্তর অঞ্চলে অবস্থা আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে। আফ্রিদী নেতারা নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাতে অসম্মতি জানালো। লান্ডিকোটালে নেহেরুর দলের উপর আফ্রিদিয়া ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। অবস্থা সঙ্গিন বুঝতে পেরে পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেবজাদা খুরশীদ নিজে জনতার মধ্যে ঢোকেন এবং খাইবার রাইফেলকে গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়ে অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনেন। মরদান ও নওশেরায় বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। ডেপুটি কমিশনার মিঃ কার্টিস দেখতে পেলেন যে নেহেরু

ওখান ভ্রাতৃদ্বয় নিক্ষিপ্ত ইষ্টকে সামান্য আহত হয়েছেন। এ জন্য তাদের অন্য পথ দিয়ে গফফার খার বাড়ী চরসাদ্দায় নিয়ে আসা হয়। এখানেই নেহেরুর সীমান্ত সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নিজে পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল পদ গ্রহণ করবেন ভেবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মিঃ জিন্নাকে বুঝালেন যে কমনওয়েলথে গবর্ণর জেনারেলের পদটি আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীত কিছু নয়. আসল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ একথায় কর্ণপাত করলেন না। ফলে মাউন্টব্যাটেন মিঃ জিন্নার উপর রুষ্ট হলেন এবং পাকিস্তানের ব্যাপারে তাঁর অনীহা প্রকাশ পেতে লাগল।

জুলাই মাসে দিল্লীতে যখন কুটনৈতিক তৎপরতা চলছে তখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক তিক্ততা তীব্রতর হতে থাকে। যে কোন সময় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বেধে ওঠার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীকে কলকাতা যাওয়ার অনুরোধ জানালেন ; কারণ যদি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধে তাহলে যেন তিনি যে কোন উপায়ে হোক শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। গান্ধীজী মাউন্টব্যাটেনের অনুরোধ রক্ষা করলেন। তিনি কলকাতায় এসে শহীদ সোহরওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। শহীদ সাহেবকে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আদর্শ ব্যক্তি মনে করলেন এবং জানালেন যে, নোয়াখালী বা অন্য কোন পল্লী অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব শহীদ সাহেব নিবেন আর কলকাতার শান্তি রক্ষার জন্য গান্ধীজী এখানেই থাকবেন।

ভারতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের কিছুদিন পূর্বে যদিও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল এবং বিশেষ করে কলকাতায় হিন্দু দাঙ্গাকারীরা ষ্টেনগান ব্যবহার করেছিল, তবুও পাঞ্জাবে যে দাঙ্গা শুরু হয় তার ভয়াবহতা সীমাহীন। দিল্লীর নিকটে বারগাও অঞ্চলে হিন্দুরা মেও নামক মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর পাশবিক হিংস্রতায় ঝাপিয়ে পড়ে। তারা নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ শিশু নির্বিশেষে এক তরফা ভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। প্রায় ৫০ মাইল এলাকা জুড়ে এই হত্যাকাণ্ড চলে এবং গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দেয়া হয়। এই নৃশংসতা রোধের জন্য এক ব্যাটেলিয়ান

সৈন্যকে এক ব্রিগেডে উন্নীত করা হলো। ইতিমধ্যে লাহোর ও অমৃত-স্বরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গা গণহত্যার পরিবর্তে গুপ্তহত্যা ও অগ্নিকাণ্ডে রূপান্তরিত হলো। এই ধরণের দাঙ্গা প্রতিরোধের ক্ষমতা সাধারণত পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর থাকেনা। ১৯৪৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে মিঃ জিন্নাহ বড়লাটকে জানালেন যে, যে কোন উপায়ে হোক এই দাঙ্গা বন্ধ করুন। মুসলমানকে যদি গুলি করে হত্যা করা হয় তার জন্যে আমি পরোয়া করি না; যে কোন উপায়ে হোক এই দাঙ্গা বন্ধ করুন। উপমহাদেশের শান্তি ফিরিয়ে আনুন।

পরদিন জওয়াহেরলাল নেহরু বড় লাটের সঙ্গে দেখা করে বল্লেন, যে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে শহর দুটিকে সামরিক বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। পাঞ্জাবের গবর্ণর স্যার ইভান জেংকিন্স নেহেরুর এই অনুরোধ প্রত্যাখান করলেন। তিনি জানালেন যে, সামরিক বাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্যই এগিয়ে আসে, কিন্তু বেসা-মরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে সকল ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন তারা প্রায় সবাই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। অথচ সামরিক বাহিনী থেকে কোন ম্যাজি-ষ্ট্রেট দেয়া যাবে না। তাছাড়া, যেখানে গুপ্তহত্যা এবং গোপনে আগুন লাগানো হচেছ সেখানে সামরিক বাহিনী কিছুই করতে পারবে না; সুতরাং সামরিক আইন জারি করে এই আইনের ব্যর্থতা প্রমাণ করার ফলে অবস্থা আরো শোচনীয় হবে।

ঘটনাটি নিয়ে ভারতের অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় আলোচনার সময় সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে বৃটিশদের বেগ পেতে হয়নি অথচ এই দাঙ্গা দমনে তাদের এতো অনীহার কারণ কি?

এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৃটেন ভারতের এই দাঙ্গা জিইয়ে রাখতে চায়। প্যাটেলের এই উক্তিতে বড়লাট মাউন্টব্যাটেন ঘোরতর আপত্তি উথাপন করলেন এবং প্যাটেল শেষ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রধানত শিখদের দায়ী করেন; কারণ দেশরক্ষা সচিব ৮ই জুলাই তারিখে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত বিভাগ যদি শিখ স্বার্থের প্রতিকূল হয়, তাহলে শিখেরা জীবন দিয়েও তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন

সঙ্গে সঙ্গে সর্দার বলদেব শিং-এর নিকট কৈফিয়ত তলব করলেন, কিন্তু বলদেব শিং নির্দ্বিধায় জানালেন যে এমন কথা তিনি কস্মিনকালেও বলেননি। কিন্তু এর পর পরই, ১০ই জুলাই তারিখে অন্যতম শিখ নেতা জ্ঞানী কর্তার শিং প্রকাশ্য ভাবে গবর্ণর স্যার জেংকিন্সকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সীমানা কমিশনের রায় যদি শিখদের অনুকূলে না যায় তাহলে শিখরা পাঞ্জাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করবে। তারা রেলওয়ে লাইন ও সেচ খাল ধ্বংস করে দেবে। ২৭শে জুলাই তারিখে জ্ঞানী কর্তার শিং যখন এক শিখ মন্দিরের সম্মুখে জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন তাকে গ্রেফতার করা হয়।

৫ই আগস্ট তারিখ সি আই ডি অফিসার মিঃ স্যাভেজ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক গভীর ষড়যন্ত্রের কথা জানালেন। বড়লাট মিঃ জিন্নাহ, মিঃ লিয়াকত আলী খাঁ এবং সর্দার বল্লভ ভাইকে নিজের কক্ষে ডাকলেন এবং মিঃ স্যাভেজকে ষড়যন্ত্রের কাহিনী বিবৃত করার আদেশ দিলেন। মিঃ স্যাভেজ জানালেন যে, শিখেরা মাস্টার তারাশিং-এর নেতৃত্বে বোমা ও বন্দুকের সাহায্যে মুসলমানদের উপর আক্রমনের পরিকল্পনা করেছে। তারা মিঃ জিন্নাকে হত্যা করবে এবং পাকিস্তানগামী ট্রেনে হামলা চালিয়ে সমস্ত পাকিস্তানী কর্মচারীদের হত্যা করবে। মিঃ জিন্নাহ ১৪ই আগস্ট তারিখে রাজকীয় সকটে যখন গণপরিষদ ভবনে যাবেন তখন বোমা মেরে তাঁকে হত্যা করা হবে। এই রিপোর্ট শোনার পর মিঃ জিন্নাহ ও মিঃ লিয়াকত আলী খাঁ অবিলম্বে শিখ নেতাদের গ্রেফতারের দাবী করেন, কিন্তু সর্দার প্যাটেল গ্রেফতারের বিরোধিতা করেন, কারণ তার মতে এই গ্রেফতার অবস্থাকে আরো জটিল করে তুলবে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন চরমপন্থী শিখ নেতাদের গ্রেফতারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু স্থানীয় গবর্নর এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ অবস্থার আরো অবনতি ঘটার সম্ভাবনার অজুহাতে গ্রেফতারের নির্দেশ দানে বিরত থাকেন। এদিকে পাঞ্জাবের মুসলমানরা, বিশেষ করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ, মাউন্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে একদেশদর্শিতার অভিযোগ আনেন।

তারা বলেন যে, পাতিয়ালায় মহারাজের ইঙ্গিতে এবং সক্রিয় সহ-যোগিতায় মাস্টার তারা শিং-এর নেতৃত্বে শিখেরা হিংসাত্মক কার্য-কলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে গভর্নর স্যার ইভেন জেংকিন্স বড়লাটের নিকট এক গোপন পত্র পাঠিয়ে জানান যে, পাঞ্জাবের গোলযোগের প্রকৃত নায়ক কেন্দ্রীয় সরকারের চারজন নেতা, যথাক্রমে সর্দার বলদেব শিং, সর্দার প্যাটেল, মিঃ লিয়াকত আলী খাঁ ও মিঃ গজনফর আলী খাঁ। এ'রা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আকালীদল, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে পরামর্শ ও অর্থসাহায্য দিয়ে যাচেছ। ২০ শে মার্চ তারিখ থেকে দাঙগা বন্ধ হয়। গবর্নর এই দাঙগার ক্ষয়ক্ষতির যে বিবরণ দেন তাতে বলা হয় যে, কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়েছে এবং তিন হাজার লোক জখম হয়েছে।

'৪৭ সালের ১৩ ই আগস্ট—স্বাধীনতা ঘোষণার আর মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা বাকী। গান্ধিজী সোদপুর আশ্রম ত্যাগ করে কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে এলেন। ১৫, বেলেঘাটা মেইন রোডস্থ "হায়দারী হাউস" নামক একটা পুরাতন বাড়ীতে তাঁর আশ্রম খুললেন। এমন এক শহরের শান্তিরক্ষার জন্য তিনি এলেন, যেখানে অন্যান্যের মধ্যে ছিল চার লক্ষ ভিখারী ও চল্লিশ হাজার কুষ্ঠরোগী। বিশেষ করে বেলেঘাটা গুণ্ডা শ্রেণীর লীলাভূমি। '৪৬ সালের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" থেকে আজ পর্যন্ত এমন দিন যায় না, যেদিন লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড না হয়।

বেলেঘাটায় মহাত্মা গান্ধীকে দেখেই গুণ্ডা শ্রেণীর হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা তাঁর প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে শুরু করল। তারা চীৎকার শুরু করলো, এখানে কেন নোয়াখালী যাও। নোয়াখালীর হিন্দুদের বাঁচাও।

গান্ধীজী শান্তভাবে তাদের অত্যাচার সহ্য করলেন এবং মিষ্টি কথায় তাদের শান্ত করে বললেন, ভাইসব আপনারা উত্তেজিত হবেন না। পূর্ব-বঙ্গের সব অঞ্চলের হিন্দুদের মুসলমানরা রক্ষা করবে। কলকাতার মুসলমানদের রক্ষার ভার হিন্দুদের নিতে হবে। তা যদি না হয় তাহলে আমি আমরণ অনশন ধর্মঘট করবো।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব গান্ধীজীর আশ্রমে এলেন। এতে হিন্দু গুণ্ডাদের মধ্যে আবার উত্তেজনা দেখা গেল। ইট পাটকেল ছোড়াও

শুরু হল। ভারতের স্বাধীনতার স্থপতি গান্ধীজীকে কলকাতায় প্রকাশ্যে আক্রমণ ও অপমান করলো হিন্দু জনতা। গান্ধীজী বোধহয় এই প্রথম অপমানিত হলেন আর এর কলঙ্ক কলকাতার ভাগ্যে পড়লো।

১৪ই আগস্টে মিঃ জিন্নাহর স্বপ্ন সফল হবে, মাউন্ট ব্যাটেন করাচীতে তাঁর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবেন। সে জন্য তিনি ভারত ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন। রয়েল এয়ার ফোর্সের একখানি বিমানে আরোহণ করে তিনি বোম্বাইয়ে এলেন। এবং এক কবরস্থানে গিয়ে তাঁর প্রাণপ্রতিম পত্নী রতন বাঈ জিন্নাহর কবরে পুষ্পস্তবক স্থাপন করে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর সহকারী দেখল যে; যে মানুষ কখনও কোনো কিছুতেই বিচলিত হন না, তাঁর চক্ষু দিয়ে দর দর করে অশ্রু ঝরে পড়ছে। মিঃ জিন্নাহ ৪১ বছর বয়সে অনিন্দ্য সুন্দরী রতন বাঈকে বিয়ে করেন। তখন রতনের বয়স মাত্র সতের বছর। দার্জিলিং এ মাউন্ট এ্যাভারেস্ট হোটেলে রতন বাঈর সঙ্গে জিন্নার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। রতনের বাবা স্যার দিনশাপ্যাটিট বোম্বাইয়ে অনেক গুলি মিলের মালিক। তিনি চান না যে, জিন্না ও রতন বাঈ বেশী মেলামেশা করুক এবং তাদের মেলামেশা বন্ধ করার জন্যে আইনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করে রতন বাঈ তাঁর অষ্টাদশ জন্মদিনে জিন্নার বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন এবং পিতার ঐশ্বর্যের দিকে না তাকিয়ে জিন্নাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁদের বিবাহিত জীবন মাত্র দশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। রতন বাঈ সাতাশ বছর বয়সে এক কন্যা রেখে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর এক বৎসর আগে থেকে রতন বাঈ জিন্নার নিকট থেকে পৃথক হয়ে বোম্বাইয়ে বসবাস করতে থাকেন। এটা কিন্তু মিঃ জিন্নার প্রথম বিয়ে নয়। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় এক অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার সঙ্গে। এ বিয়েটাও অদ্ভুত রকমে সংঘঠিত হয়। নাবালিকা বিধায় কন্যার অভিভাবকের সম্মতিতে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের পরে মিঃ জিন্না ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্য ইংলণ্ডে চলে যান। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই জিন্নার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়।

'৪৭ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে করাচীর বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ থেকে খবর এল যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সংঘ মিঃ জিন্নাকে হত্যার

জিন্নাকে হত্যার ষড়যন্ত্র

ষড়যন্ত্র করছে। মিঃ জিন্না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য শকটে যখন রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাবেন, তখন তাঁকে গুলি করা হবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন সংবাদটা পেয়ে একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি জানিয়ে দিলেন যে, মিঃ জিন্নার সকটে তাঁর পাশে তিনি নিজে বসবেন।

করাচীতে স্বাধীনতার সনদ পাঠের পর লর্ড মাউন্টব্যাটেন বললেন ঃ পাকিস্তানের জন্ম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাস সময় সময় বরফের স্তূপের মত অস্বাভাবিক ধীরগতিতে চলে. আবার কোন কোন সময় বন্যার প্রবল স্রোতের বেগে চলে। এখনই দুনিয়ার এই অঞ্চলে আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় বরফের স্তূপ গলেছে এবং স্রোতের গতিপথের বাধা-বিপত্তি বন্যার প্রবল স্রোতের বেগে অপ্রসারিত হয়েছে। আমরা বন্যার মধ্যে অবগাহন করছি। এখন আর পিছনে তাকানোর সময় নেই, দৃষ্টি সম্মুখ পানে প্রসারিত করতে হবে।

মিঃ জিন্নাহ উত্তরে বললেন ঃ আমি আন্তরিকতার সংগে বিশ্বাস করি এবং আশা করি যে, আমরা চিরদিন বন্ধুত্ব সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারবো। ইসলামের পরম-সহিষ্ণুতার নীতির উপর আস্থা রেখে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সমান অধিকার রক্ষিত হবে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখাই হবে পাকিস্তানের মৌলনীতি।

আগেই সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে, মিঃ জিন্নাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কিন্তু পরে গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছিল যে হত্যা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আর এই ব্যর্থতার কারণ ষড়যন্ত্রকারীদের সাহসের অভাব। একজন শিখ সাইকেল মিস্ত্রীর নিকট থেকে একথা জানা যায়। এই শিখটি কয়েকদিন পূর্বে অমৃতসর থেকে পাকিস্তান-গামী একটি ট্রেন লাইনচ্যুত করার নায়ক। এই ট্রেনে বোঝাই মুসলমান রিফিউজী ছিল তারা ভারত থেকে পাকিস্তানে হিজরত করছিল।

কলকাতা, ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭। পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবে পঞ্চান্ন হাজার শিক্ষিত সৈনিক যখন শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন কলকাতায় এক ক্ষীণদেহী বৃদ্ধ দাঙ্গাবাজদের শহর কলকাতার শান্তি অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। বেলেঘাটায় গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় প্রতিদিন লক্ষাধিক অহিংসার সৈনিক যোগদান করে শান্তি বজায় রাখার মন্ত্র-পাঠ করতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টান প্রভৃতি সব ধর্মের মানুষ এই সভায় সমবেত হয়। দেখলে মনে হত, এ যেন মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র।

পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। পুলিশের মনোবল ভেঙে গেছে। দাংগাকারীদের সংগে তাদের বেশীর ভাগ মিশে গিয়েছে। সেনাবাহিনী তখনও ঠিক থাকলেও তারা উন্মত্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। ঘাতকদের সংগে সৈনিকদের কিছু অংশের যোগসাজশের সংবাদও পাওয়া যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই ধ্বংসের মুখোমুখী পেঁাছে গেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে ৪৭ সালের আগস্ট মাসের শেষ ভাগে নেহরু ও লিয়াকত আলী একত্রে উভয় পাঞ্জাব সফর শুরু করেন। তাঁরা দেখেন, মুসলমান, শিখ, হিন্দু অত্যন্ত দুরাবস্থার মধ্যে অর্ধমৃত অবস্থায় হাজারে হাজারে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ও পশ্চিম থেকে পূর্বে বন্যার স্রোতের মত চলেছে। এ চলার যেন অন্ত নেই। অনেকে পথে পড়ে মরেছে। অনেক অক্ষম ও অথর্ব আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে মৃত্যুর প্রতিক্ষা করছে।

মানুষের এই দুরাবস্থা লক্ষ্য করে নেহরু লিয়াকত আলীকে বললেন, দেশ বিভাগ মানুষের জীবনে কি ভীষণ অভিশাপ বয়ে এনেছে তা দেখে এখন বলতে ইচ্ছে হচ্ছে যে, এই রকম স্বাধীনতা না পাওয়াই ভালো ছিল। আমরা যখন দেশ বিভাগে রাজী হই, তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি যে, এই রকম শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে। আমরাতো হিন্দু মুসলমান, শিখ সবাই ভাই ভাই ছিলাম। তবে এ রকম ঘটনা ঘটলো কেন? উত্তরে লিয়াকত আলী বলেছিলেন, আমাদের জনসাধারণ পাগল হয়ে গিয়েছে। মনুষ্যত্ব তাদের কাছ থেকে, মনে হয় বিদায় নিয়েছে।

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর নেহরুজী কয়েক রাত্রি ঘুমোতে পারেননি। অথচ তাঁর বন্ধু এবং রাজনৈতিক শত্রু বল্লভ ভাই প্যাটেলকে এই শোচনীয় পরিস্থিতি বিচলিত করতে পারেনি। তাকে অনেকবার বলতে শোনা গেছে যে, এই রকম ঘটনা যে ঘটবে, তা আমি জানতাম। এবং এটা ঘটাই স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা লাভের পক্ষকাল পরে যে কলকাতা এতোদিন শান্ত ছিল, হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত কারণে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল। মহাত্মা গান্ধীর কলকাতা উপস্থিতি সত্ত্বেও হিন্দু যুবকরা মুসলিম হত্যায় মেতে ওঠে। কলকাতা গঙ্গা নদীর তীরে। তিনজন মুসলমান বালককে হিন্দুরা নির্মমভাবে হত্যা করে গঙ্গার পানিতে ভাসিয়ে দেয়। এবং দু জন মুসলমান দিন মজুরকে পিটিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনায় গান্ধীজী বিচলিত হলেন। এবং '৪৭ সালে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। পরদিন গান্ধীজীর অবস্থা খুব খারাপ হলো। মনে হলো, তার অনশন যদি চলতে থাকে, তাহলে তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না। এদিকে হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকলো এবং চরমপন্থী হিন্দুরা কোনরূপ সদুপদেশে কর্ণপাত করলো না। শেষ পর্যন্ত চরমপন্থী হিন্দু নেতাদেরকে গান্ধীজীর আশ্রমে সমবেত করা হয় এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাদের বোঝাতে থাকেন যে নোয়াখালী এবং পূর্ব-বঙ্গের অন্যান্য জায়গায় মুসলমানরা হিন্দুদের রক্ষা করছে। কিন্তু কলকাতায় যদি মুসলমান হত্যা বন্ধ না হয়, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভীষণ এবং দুঃখজনক হতে বাধ্য। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না। পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর এবং প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা শ্রী রাজা গোপালা চারিয়া বেতারে ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে হিন্দুদের অনুরোধ জানালেন, যাতে তারা এই পৈশাচিকতা বন্ধ করে। কিন্তু তাতে ও কোনো ফল হলো না। এ দিকে গান্ধীজীর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ছে। জনাব শহীদ সোহ-রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম নেতারা গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালো, যাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। গান্ধীজীর যদি কিছু হয় তাহলে ভারতে অবস্থিত মুসলমানদের বাঁচানো আর সম্ভব হবে না।

রাজাজীও উদ্বেগের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত কাটাতে থাকেন। তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র সংগ্রহ করে তাদের শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি মিশনে পাঠালেন। ফল অচিরেই উপলব্ধি করা গেলো। বিকেলের দিকে এক বিরাট হিন্দু জনতা, যাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নাম করা গুণ্ডাও ছিল, হায়দারী হাউজের সামনে লজ্জায় মাথা নত করে গান্ধীজীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলো। গান্ধীজী ক্ষীণকন্ঠে তাদের বললেন, যে সব লোককে তোমরা ছিন্নমূল করেছ, যাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করেছ, এবং যাদের পরিবার-বর্গকে হত্যা করেছ তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে যাও, তাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো, তাদের পুনর্বাসিত করো ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে এসো।

এরপর ট্রাক ভর্তি হিন্দু গুন্ডারা হায়দারী হাউসে আসতে শুরু করলো এবং হাত বোমা, বন্দুক, পিস্তল গান্ধীজীর সামনে জমা দিতে থাকলো। হিন্দু, শিখ ও মুসলমানরা যুক্তভাবে এক শপথনামায় স্বাক্ষরদান করলো। এই শপথনামায় লেখা হলো, 'আমরা এই শহরে আর কখনো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটতে দেব না এবং দাঙ্গা প্রতি-রোধের জন্য আমরা জীবন দান করতেও প্রস্তুত থাকব।" এই যুক্ত বিবৃতির পর রাজাজী মন্তব্য করেছিলেন ঃ গান্ধীজী তাঁর অহিংসা মন্ত্রবলে অনেক কিছুই লাভ করেছেন, কিন্তু কলকাতায় তিনি যে বিজয় লাভ করলেন, তার কাছে স্বাধীনতাও অকিঞ্চিৎকর।

প্রায় মৃত্যুশয্যা থেকে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন। শহীদ সাহেব তাঁকে কমলার রস পান করালেন। মুমূর্ষু গান্ধীজী একটু স্বস্তির হাসি দিয়ে বললেন, আগামীকালই আমি পাঞ্জাব যাত্রা করবো।

ভারত ভাগ হলো। সাম্প্রদায়িক অশান্তি উপমহাদেশ থেকে চির-তরে দূর হবে, এই আশা নিয়েই ভারত খন্ডিত হলো। উপমহা-দেশের সকল অঞ্চলে তখন আনন্দের উল্লাস চলছে, ঠিক এই সময়ে পূর্ব পাঞ্জাবে পৈশাচিক হত্যাকান্ড শুরু হলো। তারিখ ১৪ ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল। খবর পাওয়া গেল যে, অপরাহ্নে

হডসনের ভাষা

এক উন্মত্ত শিখ জনতা পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলিম বস্তি এলাকা আক্রমণ করে মুসলমান মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে অবর্ণনীয় অত্যাচারের পর তাদের হত্যা করছে এবং আগুনে পোড়াচ্ছে। ১৫ই আগস্ট সীমান্তের অপর পার থেকে খবর পাওয়া গেল যে, শিখদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে পশ্চিম পাঞ্জাবে। মুসলিম জনতা একটি গুরুদ্বার (শিখ মন্দির) আক্রমণ করে মন্দিরের সকল বাসিন্দাকে হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার পর লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পাঞ্জাবে একটু গোলমাল হবে এ আশঙ্কা আমার ছিল, কিন্তু এমন পৈশাচিক কাণ্ড শুরু হবে এমন আশঙ্কা আমি করি নি। এমন কি, ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্যের নেতারা এমন অমানুষিক হত্যালীলা যে ঘটবে তার কল্পনাও করেন নি।

দেশ বিভাগের সময়ে ভাওয়ালপুর এস্টেটের মন্ত্রী সার পেণ্ডারেল মুন তাঁর "ডিভাইড এণ্ড কুইট" গ্রন্থে ৯৩ পাতায় লিখেছিলেন ঃ

"আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে মধ্য ভারতে বিশেষ করে পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ অভ্যুত্থান ঘটবে এবং তার প্রতিক্রিয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এবং ধীরে ধীরে এই দাংগা বিস্তার লাভ করতে পারে। কিন্তু অতো ক্ষিপ্রতায় এবং এই পৈশাচিক পন্হায় হত্যা লুণ্ঠন অগ্নি দাহন ও লোকাপসরণ চলতে থাকবে তা কেউ কল্পনাও করেনি। হাজার হাজার লোক বস্তিতে বস্তিতে মরে পড়ে থাকলো, হাজার হাজার লোক উভয় পাঞ্জাবের সীমান্ত অতিক্রম করে পালাতে শুরু করলো, পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো উভয় পাঞ্জাবে। সাধারণ ভাবে পাঞ্জাবীরা এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না।"

উভয় পাঞ্জাবের বেসামরিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেংগে পড়লো। বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্যই সামরিক বাহিনী ডাকা হয়, কিন্তু যেখানে বেসামরিক কর্তৃত্ব অস্তিত্ববিহীন—সেখানে সামরিক বাহিনী কার সাহায্যে এগিয়ে আসবে? তাছাড়া, দেশ ভাগ হওয়ার সংগে সংগে বিদেশী সৈন্যদের সন্তর্পণে পৃথক করে রাখা হয়েছিল, কারণ ভারত ও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ হাংগামায় তাঁদের জড়িত হতে দেয়া

হবে না। ফলে, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। তার উপর সেনাবাহিনীর মধ্যেও সাম্প্রদায়িক বিষ ভয়াবহভাবে সংক্রমিত হয়ে পড়ায় তারাও দাংগাবাজদের ভূমিকা গ্রহণ করে।

বেসামরিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, উভয় পাঞ্জাবে শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। বেসামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে উচচপদস্থ অফিসারগণ তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় কোনরূপ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। এর ফলেই অফিসারদের মধ্যে ও কর্তব্যহীনতা ও উশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়।

পাঞ্জাব পুলিশ ফোর্সে শতকরা ৭০-৮০ জন ছিল মুসলমান। তাদেরকে অমসলিম অফিসাররা ১৫ই আগষ্টের পূর্বেই নিরস্ত্র করে দেয়। পূর্ব পাঞ্জাবে এই কারণেই মুসলমান পুলিশদের দাংগা দমনে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি, আর পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু পুলিশরা অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে পূর্ব পাঞ্জাবে পালিয়ে যেতে শুরু করে। শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় পশ্চিম পাঞ্জাবে যেমন হিন্দু ও শিখদের লাহোর ও তার সন্নিহিত এলাকা থেকে বিতাড়ন শুরু হলো, তেমনি পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসর জেলা থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন ও হত্যাকাণ্ড চলতে লাগলো এবং শুরু হলো উভয় পাঞ্জাবে বাস্তহারাদের পলায়ন।

অবস্থা যখন এই রকম তখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন জয়েন্ট ডিফেন্স কাউন্সিলের সভা ডাকলেন এবং ফিল্ড মার্শাল অচীনলেকের নিকট থেকে পাঞ্জাবের ভয়াবহ পরিস্থিতির রিপোর্ট গ্রহণ করলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে পন্ডিত নেহরু ও মিঃ লিয়াকত আলী খাঁন তাদের স্ব-স্ব মন্ত্রিসভা এবং সামরিক কমাণ্ডারদের নিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের আম্বালা শহরে আলোচনায় বসলেন। এই আলোচনায় পণ্ডিত নেহরু জানতে পারেন যে, পূর্ব পাঞ্জাবে দাংগার জন্য শিখ নেতারাই দায়ী।

শিখনেতা মাস্টার তারা সিং এই দাংগায় শিখদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, কিন্তু শিখনেতারা দেখলো যে এই দাংগায় শিখদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতি হয়ে চলেছে সর্বাধিক এবং শিখদের স্থলে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে

চলেছে, তখন বেগতিক দেখে মাস্টার তারা সিং এবং অন্যান্য শিখ নেতারা দাংগাবিরোধী প্রচারণার জন্য সুযোগ করে দিতে নেহরু ও লিয়াকতের নিকট আবেদন জানালেন। তারা শিখ নেতাদের সামরিক যানবাহন দিয়ে দাংগাবিরোধী প্রচারণায় লাগিয়ে দিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। এর পর নেহরু ও লিয়াকত ঘন ঘন উভয় পাঞ্জাবে সফর শুরু করলেন। এর ফলে প্রকাশ্যে দাংগাহাংগামা বন্ধ হলো, কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানগামী মুসলিম রিফিউজিদের ট্রেনের উপর শিখদের আক্রমণ লেগেই থাকলো। অবস্থা যখন এরকম ভয়াবহ, তখন সর্দার বল্লব ভাই প্যাটেল ও সর্দার বলদেব সিং পূর্ব পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসনকর্তাদের ডেকে পাঠালেন এবং বললেন তাদের নিজ নিজ এলাকা দিয়ে যখন মুসলিম রিফিউজিরা পাকিস্তানে যাবে, তখন তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানের যেন ব্যবস্থা করা হয়। এদের নির্দেশ সুফলপ্রসূ হয়েছিল। আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিশ্রাম নেয়ার জন্য সিমলায় গেলেন। ভারতীয় মন্ত্রিরা কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ ভি পি মেনন টেলিফোন যোগে জানালেন যে, দিল্লীতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙগা শুরু হয়েছে। আপনি দিল্লী না এলে এ দাঙগা দমন করা সম্ভব নয়। মাউন্টব্যাটেন দিল্লী এসে এক জরুরী কমিটি গঠন করলেন নেহরু ও প্যাটেলকে নিয়ে এবং তাদের অনুরোধে লর্ড মাউন্টব্যাটেন চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করলেন।

পাকিস্তান সরকার ও একটি জরুরী কমিটি গঠন করলেন। ইতিমধ্যে উভয় ডমিনিয়নের মন্ত্রিগণ ঘনঘন মিলিত হতে লাগলেন। লাহোরে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি গঠিত হলো এবং রিফিউজী চলাচল সম্পর্কে সকল দায়িত্ব এই মুভমেন্ট কন্ট্রোল বিভাগের উপর অর্পিত হলো।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে ভারতের কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু করতে পারছিলেন না; কারণ ভারতের মন্ত্রিরাই নিয়মতান্ত্রিক বিধানানুসারে কর্তব্য সম্পাদনের অধিকারী। ততসত্ত্বেও লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের গবর্ণর জেনারেল মিঃ জিন্নাহর সংগে ঘন ঘন পরামর্শ করতে লাগলেন।

এখানে দেখা গেল যে, মিঃ জিন্নাহ্ শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে যা নির্দেশ করেন মন্ত্রিসভা তা বিনা দ্বিধায় পালন করে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বাস্তুহারাদের চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। পাকিস্তান ও ভারতের কোথাও আর সাম্প্রদায়িক দাংগা ঘটছে না। কিন্তু ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের দিকে করাচীতে এক দুঃখজনক ব্যাপার ঘটে গেল। উত্তর সিন্ধু থেকে ১৮৪ জনের এক শিখ যাত্রীদল ভারতে চলে যাওয়ার পথে করাচীর এক গুরদ্বার ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সংবাদ পেয়ে হাজার হাজার মুসলমান গুরদ্বার ঘেরাও করে এবং ৬৭ জনকে হত্যা এবং বাকী অনেককে জখম করে। এরপর তারা করাচীর অমুসলমানদের দোকানপাট লুট করতে শুরু করে। গবর্ণর জেনারেল মিঃ জিন্নাহ সংগে সংগে নির্দেশ দেন যে, দাংগাকারীদের প্রত্যেককে গুলিকরে হত্যা কর। আমি বন্দী চাই না, আমি লাশ চাই। জিন্নার এই কঠোর আদেশের ফলে অচীরেই হত্যাকাণ্ড বন্ধ হলো এবং ধীরে ধীরে উভয় রাষ্ট্রেই শান্তি ফিরে এলো। এইচ, ভি, হডসনের বিবৃতি অনুসারে জানা যায় যে ৯৪৭ সালের পাঞ্জাব দাংগায় নারী পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে দুই লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে।

মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মতামত নিম্নে উদ্ধৃত করছি ঃ—

জাস্টিস খোসলা তার স্টার্ন রিকোনিংগ বইতে নিহতের সংখ্যা বলেছেন ৫ লক্ষ।

পেণ্ডারেল মুন তাঁর ডিভাইড এণ্ড কুইট গ্রন্থে বলেছেন ২ লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ।

এইচ. ভি, হডসন তাঁর "গ্রেট ডিভাইড" গ্রন্থে বলেছেন আড়াই লক্ষ।

স্যার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী (পাঞ্জাবের প্রথম গবর্নর) বলেছেন ২ লক্ষ ২৫ হাজার

গান্ধিজী তাঁর ওয়াদা মোতাবেক পাঞ্জাব গমনের উদ্দেশ্যে অনশন ভংগের পরদিনই কলিকাতা ত্যাগ করলেন। কিন্তু পাঞ্জাবে যাওয়া তাঁর

দিল্লীতে মুসলিম হত্যা যজ্ঞ

হলো না। কারণ, দিল্লীতে তখন একতরফাভাবে মুসলিম হত্যা শুরু হয়েছে। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে আকালি সম্প্রদায়ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সংঘ রাজধানী দিল্লীতে মুসলিম নিধন শুরু

করলো। তারা প্রথমে দিল্লী রেলওয়ে ষ্টেশনে ডজনখানেক মুসলমান কুলি ও পয়েন্টস ম্যানদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

এই সময় জনৈক ফরাসী সাংবাদিক দেখলেন যে. কনট সার্কেল এলাকায় একদল হিন্দু মুসলমানদের দোকান লুট করছে, আর তার মধ্যে খদ্দর পরিহিত এক ভদ্রলোক হতে লাঠি নিয়ে গুণ্ডাদের উপর হরদম প্রহার চালাচ্ছেন এবং কঠোর ভাষায় তাদের গালাগালি করছেন। আর তার পিছনে একদল পুলিশ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পরে জানা গিয়েছিল এই খদ্দরধারী ভদ্রলোকটি ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহের়। দিল্লীর দাংগায় মুসলমান ফল বিক্রেতারা পাইকারীভাবে নিহত হয় এবং তাদের দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সম্রাট হুমায়ুনের মাজারের নিকট মুসলমান বস্তির একটি লোকও গুণ্ডাদের কবল থেকে রক্ষা পায় নি। এদের মধ্যে সবচেয়ে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল, আর, এস, এস দল। তারা বোরকা পরিহিতা মুসলমান মেয়েদের ধরে ধরে একই স্থানে সমবেত করতে থাকে এবং তাদের বোরকায় কেরোসিন ঢেলে দিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই ঘটনাটা নেহেরুর বাড়ীর সামনে সংঘটিত হয়। নেহেরু মুসলমানদের রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন তার প্রতিবাদেই এই নৃশংসতার আয়োজন। দিল্লীর মুসলমান টাংগাওয়ালারা এই দাংগায় গুণ্ডাদের হাত থেকে রেহাই পায় নি। এক কথায় বলা চলে যে. দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় শাসনব্যবস্থা বলতে কিছু ছিল না।

ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পর গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন সিমলায় বিশ্রাম নিচিছলেন। সেই সময় ভি পি মেনন মাউন্টব্যাটেনকে টেলিফোন করে জানালেন যে, "আপনাকে অবিলম্বে দিল্লী ফিরে আসার প্রয়োজন।" উত্তরে মাউন্টব্যাটেন বললেন, আমি এই সেদিন মাত্র দিল্লী ছেড়ে এসেছি। নেহরু প্যাটেলকে বলে দাও 'আমি এখন ফিরছিনে।"

"বেশ' আমি বলে দেবো কিন্তু পরে আপনার এই সিদ্ধান্ত বদল করবার আর কোন মানে হবে না। আপনি যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে না আসতে পারেন, তাহলে আর আসবার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। কারণ তখন, বড্ড দেরী হয়ে যাবে। এবং এতোদিনে ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে।"

অনেক্ষণ নীরব থাকার পর মাউন্টব্যাটেন গম্ভীরভাবে বললেন, "বেশ তোমার কথাই মানলাম" তারপরে বিচ্ছিরিভাবে গালাগালী দিয়ে বললেন; "বৃদ্ধ শূকর তোমার জয় হলো। আমি দিল্লী আসছি।" এটা সাতচল্লিশ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের ঘটনা ।

৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাউন্টব্যাটেনে, বৈঠকখানায় মাউন্টব্যাটেন নেহরু ও প্যাটেল বসে আছেন। কারো মুখে কথা নেই এবং এটা ছিল একটা গোপন সভা। নেহরু ও প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনকে বললেন, "আপনারা যে স্বাধীনতা আমাদের দিয়েছেন, দয়া করে তা ফিরিয়ে নিন। আমরা সারা জীবন স্বাধীনতার জন্য জেল খেটেছি, কিন্তু দেশ শাসন করতে আমরা অক্ষম।" মাউন্টব্যাটেন ধমকের সুরে তাদের বললেন, "এ কথা দ্বিতীয়বার উচচারণ করবেন না। যদি জনসাধারণ আপনাদের এই অক্ষমতার কথা জানতে পারে, তাহলে আপনাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত খতম হয়ে যাবে।" তবে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে মাত্র কয়েকজন উর্দ্ধতন সামরিক ও বেসামরিক অফিসার নিয়ে যদি একটা জরুরী মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, তাহলে তিনি ভারতীয় মন্ত্রীসভার হয়ে কাজ করতে পারেন। নেহেরুজী স্বীকৃত হলেন। এবং সংগে সংগে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

মাউন্টব্যাটেন প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব হাতে তুলে নিলেন। বিমান বাহিনীকে সদা প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেয়া হলো। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে চব্বিশ ঘন্টার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হলো এবং তাদের উপর নির্দেশ দেয়া হলো যে হিন্দু বা মুসলমান যে কোন সম্প্রদায় থেকে কারোর উপর আক্রমন হতে দেখলে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে। এই ছিল তাদের নির্দেশ।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজী দিল্লীতে অবতরণ করলেন। কলকাতায় অনশনের কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। দিল্লীর বিরলা ভবনে তাঁর আশ্রম স্থাপিত হলো। তিনি হিন্দু ও মুসলমান আশ্রয় শিবিরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন তাঁর প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা করছিলেন তখন, হিন্দু জনতা প্রার্থনা সভার বাইরে গান্ধী মুর্দাবাদ ধ্বনি দিতে শুরু করলো।

ঠিক এই সময় গোয়ালিয়ারের লোক-চক্ষুর অন্তরালে এক সর্বনাশা ষড়যন্ত্র শুরু হলো। ডাঃ দত্তাত্রেয় পারচুরে নামক এই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানায় এই ষড়যন্ত্রের সদর দফতর স্থাপন করলো।

গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্র

ডাক্তারের অধীনে এক হাজারেরও বেশী আর, এস, এস স্বেচ্ছা-সেবক ছিল তারা যে কোন পৈশাচিক কাজ করার জন্য নিজেদের তৈরী রেখেছিল। এদের মধ্যে মদনলাল ঘোষণা করলো সে গান্ধীজীকে হত্যা করবে। মদন লালের বাবাকে মুসলমানরা খুন করেছিল। তাই ভূপাল থেকে মুসলিম যাত্রীবাহী ট্রেন আক্রমণ করে মদনলালরা বহু মুসলমানকে হত্যা করে। কিন্তু এতেও সে তৃপ্ত হয় নি। গান্ধীজীকে হত্যা করাই তার এখন প্রধান কর্তব্য বলে সে স্থির করেছিল। তাকে গোয়ালিয়ার থেকে পুলিশ বের করে দেয়। আহমদনগরে গিয়ে সে গুণ্ডামী, চুরি ও ডাকাতি করে তার দিন কাটাতে থাকে। এবং সুযোগ পেলেই মুসলমান হত্যা করে। আহম্মদনগরে মদনলালের এক বন্ধু মিললো। সে ছিল একটি সরাইখানার মালিক নাম বিষ্ণু কারকারে।

পুনায় হিন্দু রাষ্ট্র নামে একটি পত্রিকা ছিল। তার প্রকৃত পরি-চালক ছিলেন আর এস এস নেতা সাভারকার। এই পত্রিকা অফিসে ৪৭ সালের পহেলা নভেম্বর তারিখ দুজন মারাঠি ব্রাহ্মণ নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপতে চরমপন্থী হিন্দুদের নিয়ে এক চা চক্রের আয়োজন করলো। আহমদনগরের বিষ্ণু কারকারে এই চা চক্রে যোগদান করলো। চা পানের পর নাথুরাম গডসে বক্তৃতা করতে উঠে বললেন যে ভারত ভাগ হয়েছে কিন্তু গান্ধী এখনও বেঁচে আছে। গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন ভারতীয় হিন্দুদের তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় অসহায় করে রেখেছে। যখন হিন্দু রিফিউজিরা অনাহারে মরছে, গান্ধী তখন মুসলমান অত্যা-চারীদের রক্ষা করছে। হিন্দু মহিলারা তাদের ইজ্জত বাচানোর জন্য কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করছে। শকুনীরা ভারত মাতার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচেছ। অথচ গান্ধী অবিচল। আমরা এই যন্ত্রণা কতদিন সহ্য করব ?

হিন্দুরা গডসেকে তাদের শিবাজী মনে করতো। তার বাবা পনেরো টাকা বেতনের ডাক পিয়ন ছিল। গডসে নিজেও শিক্ষিত ছিল না।

সে আসে প্যাকিং বাক্সে পেরেক মারার কাজ করতো। সে নাকি ব্রহ্মচর্য পালন করতো। সাংবাদিক কলিন্স ও লাপিঁয়েরে আবিষ্কার করেছেন যে, গডসে তার রাজনৈতিক নেতা সাভারকারের সাথে সমকামিতার শিকার হয়েছিল। গডসে মিঃ জিন্নাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা হায়দ্রাবাদে (সিন্ধ) এক মুসলিম লীগ সভায় বোমা নিক্ষেপ করে এবং গেরিলা তৎপরতা চালায়। মিঃ জিন্না চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাবেন এই আশায় তারা সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে ও হত্যা করবার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু মিঃ জিন্না শেষ পর্যন্ত সুইজার-ল্যাণ্ডে যাননি।

গডসে একজন অস্ত্র চোরা কারবারির সংস্পর্শে এলো। তার নাম বাদগে। গডসে বললো, আমি একটা বিরাট কাণ্ড করতে যাচ্ছি। আমার হ্যাণ্ড গ্রেনেড ও পিস্তল প্রয়োজন। বাদগে তাকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে।

১৯৪৮ সাল, ১২ই জানুয়ারী তারিখে গান্ধী ও মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে আলোচনা চলছে। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন যে, যে সব মুসল-মান এখন ও ভারতে আছে তারা কি পাকিস্তানে চলে যাবে, না ভারতে থেকে যাবে? উত্তরে মাউন্টব্যাটেন বললেন. তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? গান্ধীজী বললেন, কেন, আমার ইচ্ছাশক্তি। মাউন্ট-ব্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন, হিন্দুরা কি আপনার কথায় কর্ণপাত করবে? গান্ধীজী অন্য প্রসঙ্গ তুলে বললেন, ভারত পাকিস্তানের পাওনা টাকা দিচ্ছে না। এর প্রতিবাদে আবার আমি অনশন করবো। মাউন্ট-ব্যাটেন জবাবে বললেন, আমার গভর্নমেণ্ট পাকিস্তানের পাওনা টাকা না দিয়ে এক কলংকময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এবং এর ফলে ভারতের মুখে কালি মাখানো হয়েছে। গান্ধীজী তখন দৃঢ়তার সংগে বললেন, এবার আমার অনশন হবে এই কালিমা মুছে ফেলার জন্য। গান্ধীজীর যে কথা সেই কাজ। তিনি '৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে আবার অনশন শুরু করলেন। বেলা তখন ১১ ৩৫।

ঠিক এই সময় দিল্লী থেকে সাতশো মাইল দূরে পুনা শহরে নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপতে গান্ধীজীকে হত্যা করার ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ করলো। এবং তাঁর জীবন বীমার টাকার উত্তরাধিকারী করলো তার ভাইয়ের স্ত্রীকে। তারপর তার ভাই গোপাল গডসে এবং নারায়ণ আপতেকে সংগে করে নয়াদিল্লী রওয়ানা হলো।

দুপুরের দিকে জওহরলাল নেহেরু, প্যাটেল ও ভারতীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ অনশনরত মহাত্মা গান্ধীর শয্যার পাশে সমবেত হলেন এবং তাঁরা গান্ধীজীকে অনশন ত্যাগ করার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। গান্ধী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, প্যাটেল তুমি আর সেই সর্দারজী নও। যাকে একদিন আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসতাম।

সন্ধ্যার দিকে বিরাট হিন্দুজনতা বিরলা ভবনের সামনে সমবেত হয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'গান্ধীকে মরতে দাও।' গান্ধীজী যখন মুমূর্ষু অবস্থায় তখন গান্ধীজীর হত্যাকারী তিনজন ১৭ই জানুয়ারী তারিখে দিল্লী বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। তাদের প্রতি সাভারকারের নির্দেশ ছিল যে, গান্ধী, নেহরু ও সোহরাওয়ার্দীকে যেন হত্যা করা হয়।

গান্ধীজীর অনশনের সংবাদ শুনে করাচী ও লাহোরের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। মুসলমান নেতারা অনশন ত্যাগ করবার জন্য গান্ধীজীর কাছে তার পাঠাতে লাগলেন। মুসলমান মহিলারা দলে দলে এক এক জায়গায় সমবেত হয়ে গান্ধীজীর জীবন রক্ষার জন্য আল্লার কাছে মোনাজাত করতে লাগলো। গান্ধীজীর জীবনের আসা নেই মনে করে গান্ধীর সহকর্মী পিয়ারে লাল শিখ ও হিন্দুদের আশ্রয় শিবিরে উপস্থিত হয়ে গান্ধীজীর অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ বিরলা ভবনে এসে ঘোষণা করলো, "আপনি অনশন ভঙ্গ করুন এবং ভারতকে দুর্দশার কবল থেকে রক্ষা করুন। আমরা দিল্লীতে মুসলমানদের যে ১১৭টি মসজিদ দখল করেছি, তা এখনই ফিরিয়ে দিচ্ছি, যে সব মুসলমানদের বাড়ী কেড়ে নিয়েছি, তাও ফিরিয়ে দিচ্ছে, এবং শপথ করছি আমরা মুসলমানদের সংগে এক হয়ে বাস করবো"। ১৮ই তারিখের সন্ধ্যায় ভারত পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ জারি করলো। বিরলা ভবনে গান্ধীজীর শয্যা পার্শ্বে জওহরলাল মাথা নীচু করে বসে কাঁদছেন। এমন সময় মাউন্টব্যাটেন ও লেডী মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীর নিকটে এলেন।

গান্ধীজী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, পর্বত শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদের কাছে এলো। গান্ধীজীর অবস্থা দেখে লেডি মাউণ্টব্যাটেন ও কাঁদতে শুরু করলেন। মাউণ্টব্যাটেন তাকে সান্ত্বনা দেন, তোমরা কেঁদনা গান্ধীজী শক্ত ও সাহসী মানুষ। তিনি ঠিক বেঁচে উঠবেন। গান্ধীজীর পক্ষে বাইরে তখন লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ। তারা ঘন ঘন দাবী জানাচেছ: "গান্ধীজীকে বাঁচান। গান্ধীজীকে বাঁচান।" লক্ষ লোকের স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতিপত্র নেহরুর হাতে দেয়া হল। তারা এই ওয়াদা করেছিল যে, আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবে না। তারা অহিংস থাকবে। নেহরু তাদের সামনে বক্তৃতা করে জনতাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। নেহরু যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন জনতার মধ্যে মদনলাল ও কারকারে উপস্থিত ছিল। তারা নেহরুর বক্তৃতার সময় চিৎকার করে হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। পুলিশ মদনলালকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। নেহরুর বক্তৃতা শেষ হলো। তিনি মওলানা আজাদকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজীর শয্যা পার্শ্বে এলেন। প্রথমে মওলানা আজাদ এবং পরে জওরলাল নেহরু গান্ধজীকে কমলার রস পান করালেন। গান্ধীজীর মুখে কমলার রস দিতে দিতে নেহরু বললেন, বাপুজী, আমি ও আপনার সংগে ১৩ ই জানুয়ারী থেকে অনশন করেছি। গান্ধীজী নেহরুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

অনশন ভঙ্গের পরদিন থেকে গান্ধীজী আবার রোজই প্রার্থনা সভা করতে লাগলেন। ২০ শে জানুয়ারী তারিখে গান্ধীজী যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন মদনলাল সভার মধ্যে একটি বোমা নিক্ষেপ করলো। কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। জনৈক মহিলা মদনলালকে বোমা ফেলতে দেখে এবং সে পুলিশকে জানিয়ে দেয়। সংগে সংগে মদন-লাল গ্রেফতার হয়। কিন্তু তার সঙ্গী গডসে, আপতে ও কারকারে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং আত্মগোপন করে থাকে। পুলিশ তাদের তখন ধরতে পারেনি।

॥ বারো ॥

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে মিঃ জিন্না জম্মু ও কাশ্মীরে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য মহারাজ হরিশিং গৌরকে একখানি পত্র লিখলেন যাতে তাঁর জম্মুতে থাকার সুবন্দোবস্ত করা হয়। তার ধারনা ছিল যে, কাশ্মীর মুসলিম প্রধান রাজ্য। সেজন্য কাশ্মীরকে পাকিস্তানে যোগদান করতে হবে। কিন্তু মিঃ জিন্নার প্রতিনিধি করাচী ফিরে এসে জানালো যে, মহারাজ হরিশিং মুসলিম জনগনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মহারাজা স্যার হরিশিং গৌরের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানী জনগণ এবং রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। প্রধান-মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এক গোপন সভা আহবান করলেন। এবং এই সভায় যদিও অনেকে অবিলম্বে কাশ্মীর আক্রমণের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন কিন্তু লিয়াকত আলি মিঃ জিন্নার সঙ্গে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, সরাসরি আক্রমণ করা উচিত হবে না। তবে কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে থেকে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে হবে, এবং একাজে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এবং তাদের লুটতরাজের প্রলোভন দেখাতে হবে।

ট্রাক বোঝাই পাঠানরা দলে দলে কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। হাতে তাদের রাইফেল ও সাব-মেশিনগান। এ সময় স্যার জর্জ কানিংহাম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন, স্যার ফ্রাংক মেসারভী। কানিংহাম মেসারভীকে টেলিফোনে জানালেন, এখানে এমন কিছু ঘটতে যাচেছ যার হদিস করতে পারিনি। ট্রাক বোঝাই উপজাতীয়রা "আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে পেশোয়ারের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের দিকে

বন্যার মতো চলেছে। গত কয়েকদিন ধরে এই রকম চলছে। আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং পাঠানদের ক্ষেপিয়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি ছাড়া আর সকলেই জানে এরা কোথায় যাচেছ। আপনি কি মনে করেন যে, গভর্ণমেন্ট এখনও কাশ্মীর আক্রমনের বিরুদ্ধে।" মেসারভী জবাবে বললেন, "আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, এরকম কোনো ইচেছ আমার নাই। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীও আমাকে জানিয়েছে যে, তিনি কাশ্মীর আক্রমণের বিরোধী।" স্যার কানিংহামের সাথে কথা বলার পর পরই তিনি লিয়াকত আলীর দপ্তরে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন সীমান্ত প্রদেশে কি ঘটছে সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি?" লিয়াকত আলী এ বিষয়ে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং সীমান্ত প্রধানমন্ত্রীকে টেলিফোনে নির্দেশ দিলেন যে, সীমান্তে কোনরকম বিশৃঙ্খলা যেন ঘটতে না দেয়া হয় এবং পেশোয়ার ও কাশ্মীর সীমান্তে যদি পাঠানরা গিয়ে থাকে তাহলে অবিলম্বে তাদের ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়া হোক। অক্টোবর মাসের ২২ তারিখে ২৩ বছর বয়সের এক তরুণ ন্যাশনাল গার্ড সায়রাব খান পাঠানদের কাশ্মীরে প্রবেশের নেতৃত্ব দিচিছলেন। তিনি মেজর শওকত হায়াত খার নেতৃত্বাধিনে এই অনিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনা করছিলেন। তিনি ঝিলাম নদীর এপার থেকে দেখলেন, মুজাফফরাবাদ থেকে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখা যাচেছ। ঝিলামের এপারে সংবাদ এলো যে, সমগ্র মুজাফফরাবাদ পাঠানরা দখল করে নিয়েছে, এবং জম্মুর দিকে তাদের অভিযান শুরু হচেছ। পাঠান অধিকৃত এলাকা থেকে শ্রীনগর তখন মাত্র ১৩৫ মাইল।

পাঠানদের কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের আটচল্লিশ ঘন্টা পরে ভারত জানতে পারল যে কাশ্মীর আক্রান্ত হয়েছে। তখন ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেরই প্রধান সেনাপতি ছিলেন ইংরেজ। তাদের টেলিফোন নম্বর দিল্লী ৩০১৭ এবং রাওয়ালপিন্ডি ১৭০৪ তখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। জওহরলাল কাশ্মীরের পরিস্থিতি জানতে পেরে ভীষণ বিচলিত হলেন। তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে চাপ দিতে লাগলেন যাতে বৃটিশ বাহিনীকে কাশ্মীরে এয়ার ড্রপ করা হয়। মাউন্টব্যাটেন এরকম পদক্ষেপ নিতে

অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, স্বাধীন উপমহাদেশে বৃটিশ সৈন্যরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে না। তাতে পরিনামে যাই ঘটুক না কেন। ভারত যদি কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে চায় তাহলে ভারতীয় সৈন্যদ্বারাই তা করতে পারে। তাছাড়া, মহারাজা যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকারীভাবে ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগদান করছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত কাশ্মীরে আইনত প্রবেশ করতে পারে না।

'৪৭ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর চাচাত ভাই ষণ্ট জর্জের নিকট একখানি পত্র লিখে জানালেন যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের পথে দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। মহারাজা হিন্দু বিধায় তিনি ভারত ইউনিয়নে যোগদান করতে চান, কিন্তু যেহেতু কাশ্মীরের মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা শতকরা আশিজন, সেইহেতু কাশ্মীরের জনগণ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিবে। পরে নেহরুকেও মাউণ্টব্যাটেন জানিয়েছিলেন যে, মহারাজা ভারতে যোগদানে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সেটা অস্থায়ী ব্যাপার হবে। কাশ্মীরে আইন ও শৃঙ্খলা ফিরে আসার পর গণভোটের মাধ্যমে তার ভাগ্য চুড়ান্তভাবে নিরূপণ করতে হবে।

ইতিমধ্যে কাশ্মীরের মহারাজা হরিসিং গৌর জীবনের নিরাপত্তার জন্যে শ্রীনগর ত্যাগ করে জম্মু উপনীত হলেন। ২৬শে অক্টোবর তারিখে মহারাজা ভারতে যোগদানের দলিল প্রস্তুত করছিলেন, এই সময় তিনি জানতে পারলেন যে, পাকিস্তানীরা শ্রীনগর থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে আছে। কাজেই মহারাজার দলিল তৈরী আর শেষ হলো না। তাকে শ্রীনগর থেকে পালিয়ে যেতে হলো।

ভারতীয় বাহিনীর বৃটিশ কমান্ডাররা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে রাজী হলেন না। কিন্তু নেহরুর চাপে পরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন শ্রীনগর কেবলমাত্র বিমান বাহিত ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে রাজী হলেন। সংগে সংগে তিনি ভি, পি, মেননকে জম্মুতে পাঠালেন মহারাজার নিকট থেকে ভারতে যোগদানের সপক্ষে এক পত্র নিয়ে আসতে। এই পত্র খানি আইনসংগতভাবে ভারতে যোগদানের দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এবং এই পত্রের বলেই ভারত কাশ্মীরে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারবে।

মেনন জম্মু থেকে ফিরে এসে ভারতে বৃটিশ হাই কমিশনার আলেক-জান্ডার সাইমনের সাথে মদ্য পান করতে করতে নিজের পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে বললেন, এই দেখুন, কাশ্মীর আমাদের হাতে এসে গেছে। 'বাস্টার্ড' এ্যাকসেশন এ্যাক্টে সই করেছে। এখন কাশ্মীর আমরা পেলাম এবং ভবিষ্যতে ও আমাদের থাকবে। আমরা কখনও কাশ্মীরকে হাত ছাড়া করবো না।

২৭ শে অক্টোবর সোমবার। প্রায় দশ হাজার ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করে। পক্ষান্তরে, পাঠানরা কাশ্মীর দখলের জন্য যুদ্ধ না করে লুটতরাজে ব্যাপৃত হয়। তাদের কমান্ডাররা অবাক বিস্ময়ে দেখল যে, পাঠানরা তাদের অধিনায়কদের নির্দেশ অমান্য করে অত্যন্ত জঘন্যভাবে লুটতরাজ ও অত্যাচার চালাচ্ছে। অবস্থা যখন নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেল তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কঠোর নির্দেশ দিলেন যাতে পাঠানদের অবিলম্বে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করা হয়। পরে ঘটনাটা ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে উপস্থাপিত হয়। এবং জাতিসংঘের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ এলাকা বরাবর পাকিস্তান ও ভারতীয় কাশ্মীরের সীমানা নির্ধারিত হয়। জাতিসংঘ থেকে কাশ্মীরে অবাধ গণভোটের নির্দেশ ও দেয়া হয়। কিন্তু ভারত জাতিসংঘের এ নির্দেশ অমান্য করায় কাশ্মীর সমস্যা এখনও অমীমাংসিত রয়েছে।

॥ তেরো ॥

মহাত্মা গান্ধীর হত্যার অর্থ ভারতের আত্মাকে হত্যা করা। যিনি সারাজীবন মানুষের কল্যাণকামনায় অতিবাহিত করেছেন, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যিনি ছিলেন পথ-প্রদর্শক এবং বিশেষ করে সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের ভীত মজবুত করতে চেয়েছিলেন, তাঁর হত্যা শতাব্দীর ঘৃণ্যতম পৈশাচিকতা। এই হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রেস এ্যাটাচী তাঁর ডায়েরীতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার থেকে কিছু অংশ পাঠকদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য উদ্ধৃত করছি ঃ

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী। ভোর থেকে গান্ধীজীর দিনের কর্মসূচী নিত্যকার মতো শুরু হলো। ফজরের নামাজের সময় গান্ধীজীরও প্রার্থনার সময়। এবং এই দিনই গান্ধীজীর শেষ প্রার্থনার দিন। বিড়লা ভবনে খড়ের গদীর ওপর আসন করে বসে এবং মারবেল পাথরের দেয়ালে পিঠ রেখে হেলান দিয়ে বসে গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনা মন্ত্র পড়তে লাগলেন যার অর্থ হলো (কোরান) জন্মালেই মরণ আছে, মরনেই জীবন। সুতরাং যা ঘটবার তা ঘটবেই এর জন্য শোক করার কিছু নাই। প্রার্থনার পর মনু গান্ধি গান্ধীজীকে পাশের একটা কামরায় নিয়ে গেলো। সেখানে বসে তিনি লেখাপড়া করবেন। তার পাকিস্তানে যাওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছে। অগ্রগামী দল হিসেবে ডঃ সুশীলা নায়ার করাচী গিয়েছেন। গান্ধীজী মনুকে বললেন, তুমি এই গানটা গাওতো।

তুমি ক্লান্ত হও আর না হও, হে মানুষ কখনও বিশ্রাম নিও না।

মনু গান গাইতে লাগলো। আর গান্ধিজী গান শুনতে শুনতে পত্র লিখতে শুরু করলেন। গান্ধিজী যখন বিড়লা ভবনে পত্র লেখা ব্যস্ত,

তখন দিল্লী স্টেশনে গান্ধীজীর হত্যাকারীরা ষড়যন্ত্রে রত। এদের মধ্যে ছিলো, নাথুরাম গডসে, নারায়ণ আপতে ও বিষ্ণু কারকারে। হত্যার ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ দেবার চেষ্টা করছে। তারা স্থির করলো বিকেলে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় প্রবেশ করে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ফিট দূর থেকে নাথুরাম গডসে গান্ধীজীকে গুলি করবে। আর আপতে ও কারকারে তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে গুলি চালানোর কোনো বাধা আসলে তা সরিয়ে দেবে। পরামর্শ খতম করে ওরা চললো বিড়লা ভবনের দিকে। যেতে যেতে হঠাৎ গডসের খেয়াল হলো, সে চিনেবাদাম খাবে। আশেপাশে কোনো চিনেবাদামওয়ালা নেই। কাজেই আপতেকে দৌড়াতে হলো চিনে-বাদামের খোঁজে। গডসের হয়তো এটাই শেষ সাধ, সে গান্ধীজীকে হত্যার পর বেঁচে থাকবে কিনা বলা যায় না, কাজেই সে সাধ তার বন্ধুরা পালন করলো। বাদাম পেয়ে গডসে যেন শিশুদের মতো গোগ্রাসে গিলতে লাগলো।

অপরাহ্নে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা। দলে দলে মানুষ সভায় যোগ-দানের জন্য চলেছে আর সেই জনতার সংগে মিশে চলেছে নাথুরাম গডসে ও তার সংগীরা।

দুপুরের পর বিড়লা ভবনে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ভিড় জমে যায়। দেখা করতে এলেন বিংশ শতাব্দীর মুঘল বল্লভ ভাই প্যাটেল। প্যাটেল ছিলেন একরোখা মানুষ এবং আধা ডিকটেটর। নেহরু সমাজতন্ত্র ঘেঁষা এবং ভাবপ্রবণ। এদের মধ্যে বিভেদ এতো বেশী বেড়ে গিয়েছিলো যে, প্যাটেল ঠিক এই সময় নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। গান্ধিজী ও লর্ড মাউন্টব্যাটেন এই ব্যাপার নিয়ে তার অনশনের পূর্বে গান্ধিজীর সংগে অনেকবার আলোচনা করেছেন। এবং প্যাটেলের পদত্যাগ প্রত্যাহার করানোর জন্য গান্ধিজীকে অনুরোধ করেছেন। এই ব্যাপার নিয়ে গান্ধিজীর সংগে প্যাটেলের দীর্ঘ আলোচনা চললো। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজেছে। মনু বিব্রত হয়ে গান্ধিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার ঘড়ি দেখিয়ে বললো, পাঁচটা দশ মিনিট।

গান্ধিজী আলাপ অসমাপ্ত রেখেই প্যাটেলকে বিদায় করে দিলেন এবং আভা ও মনুর কাধে হাত দিয়ে প্রার্থনা সভার দিকে চললেন।

তিনি প্রার্থনা মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন এমন সময় নাথুরাম তার দুই সংগিকে নিয়ে ঠিক গান্ধিজীর সামনে গিয়ে মাথা ঝুকিয়ে অভিবাদন করার ভংগীতে তার কোমর থেকে রিভলভার বের করে পর পর তিনটি গুলি করে জনতার ভিড়ে মিলিয়ে গেল। গান্ধিজী হে রাম শব্দটি উচ্চারণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তখন গান্ধি-জীর কোমরে ঝোলানো ঘড়িতে পাঁচটা বেজে সতেরো মিনিট।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে যখন সংবাদটা গেলো, তখন তিনি একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন ঃ কে এ কাজ করলো ? মাউন্টব্যাটেনের এ, ডি, সি জানালেন, এখনও জানা যায়নি। মাউন্টব্যাটেন ভীড় ঠেলে গান্ধিজীর মৃত দেহের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তখন একজন উন্মত্ত লোক চীৎকার করে বললো, একজন মুসলমান গান্ধীজীকে হত্যা করেছে। মাউন্টব্যাটেন তার দিকে তাকিয়ে ক্রোধে বিস্ফোরিত হয়ে বললেন, তুমি মূর্খ। জানোনা গান্ধিজীর হত্যাকারী একজন হিন্দু।

ক্যামবেল জনসন আস্তে আস্তে মাউন্টব্যাটেনকে বললেন, আপনি কেমন করে জানলেন যে, এটা হিন্দুর কাজ ? মাউন্টব্যাটেন একটু নৈরাশ্যের সুরে বললেন; আমি ঠিক জানিনে। তবে হত্যাকারী যদি মুসলমান হয় তাহলে ভারতে যে হত্যাকাণ্ড শুরু হবে, তার শেষ কোথায় তা কেউ বলতে পারে না। এই সময় বিড়লা হাউস থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে পুলিশের বড় কর্তা খবর পাঠালো গান্ধীজীর হত্যাকারী একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। নাম নাথুরাম গডসে। বেতারে ঘোষণা করা হলো, গান্ধীজীকে নয়া দিল্লীতে পাঁচটা কুড়ি মিনিটে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারী একজন হিন্দু। গান্ধীজীর বিছানা খড়ের গদি। খানিক আগে যিনি এই বিছানায় বসে প্যাটেলের সংগে কথা বলছিলেন, তাঁর মৃতদেহ এখন সেই বিছানায় শায়িত। নেহরু নিজে বসে দেয়ালে মাথা রেখে শিশুর মতো কাঁদছেন। আর প্যাটেল অপলক নেত্রে গান্ধীজীর মৃত দেহের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মৃত দেহের চারদিক ঘিরে মহিলারা বেদমন্ত্র পাঠ করছেন। মাউন্টব্যাটেন মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে বললেন, মহাত্মা গান্ধী ইতিহাসে বুদ্ধ ও

যীশু খ্রীষ্টের পাশে স্থান পাবেন। নেহরু ও প্যাটেলের দুই কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, আপনারা দু'জনেই জানেন আমি গান্ধীজীকে কত ভালোবাসতাম। এখন গান্ধীজীর শেষ অনুরোধ আপনাদের দুজনের জন্য আমার মাধ্যমে আপনাদের জানিয়ে গিয়েছিলেন আপনাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠছে তা ভারতের জন্য অকল্যাণকর হবে। তিনি আপনাদের উভয়কেই অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এবং এই ভালোবাসার দাবীতেই তিনি আপনাদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বলেছেন।

এর পর গান্ধীজীর শব সৎকারের পালা। কিন্তু নেতারা শোকে এতো মুহ্যমান যে, কী করা উচিত আর না উচিত তা ভাববার সময় নেই। মাউন্টব্যাটেন নেহরু ও প্যাটেলকে বললেন, গান্ধীজীর শবের শেষ দর্শনের জন্য সারা ভারতের মানুষ উদগ্রীব। কাজেই তাঁর শব একটি ট্রেনে করে সারা ভারতে ঘুরিয়ে আনা উচিত। গান্ধীজীর সেক্রেটারী পেয়ারে লাল ভীষণভাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন, গান্ধীজীর নির্দেশ ছিলো যে তাঁর লাশ যেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সৎকার করা হয়। পেয়ারে লালের কথা সবাই মেনে নিলেন। তবে মাউন্টব্যাটেন বললেন, গান্ধীজীর শোক যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করার একমাত্র ক্ষমতা রাখে সেনাবাহিনী। অন্য কারো দ্বারা সেটা সম্ভব নয়। নেহরু ও প্যাটেল আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিলেন, যিনি অহিংসার পুজারী যাঁর প্রার্থনা সভায় প্রকাশ্য পুলিশের প্রবেশাধিকার ছিলো না, তাঁর শব সামরিক বাহিনী পরিবৃত হয়ে যাবে, একথা ভাবতে ও দুঃখ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছাই কার্যকরী হলো। আর সামরিক বাহিনী না হলে শোক যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হতো।

গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদে পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। নারী, পুরুষ দলে দলে করাচি ও লাহোরে সংবাদপত্র অফিসে ভিড় জমাতে লাগলো শেষ সংবাদের আশায়। পুনায় সাভারকারের হিন্দু রাষ্ট্র পত্রিকা, সাভারকার ভবন, হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ দফতর হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হলো। দিল্লীর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বক্তৃতার জন্য ধীর পদক্ষেপে ও বিষাদ ক্লিষ্ট বদনে প্রবেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। মাইক্রোফোনে নেহরুর কন্টস্বর শোনা গেলো ঃ

আমাদের জীবন থেকে আলো নিভে গেছে। সর্বত্র অন্ধকার।
আমাদের প্রিয় নেতা বাপুজী ও জাতির পিতা আর ইহ জগতে নেই। আমি বলেছি, আলো নিভে গেছে। কিন্তু হয়তো আমি ভুল বলেছি। কারণ যে আলো এ দেশে জ্বলেছিলো তা সাধারণ আলো নয়। হাজার হাজার বছর ধরে এই আলোর দীপ্তি অগণিত মানুষকে প্রেরণা দিবে। কারণ, এই আলো অনেক মহৎ। অনেক বড় এবং জীবন ও সত্যকে এই আলোক উদ্দীপিত রাখবে। ভুল থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখবো এই প্রাচীন দেশকে স্বাধীনতার স্বর্ণদ্বারে পৌছে দেবে।

মিস্টার জিন্না পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল হিসাবে এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে শোক বাণী পাঠালেন। তিনি লিখেছিলেন, মিঃ গান্ধী আর ইহ জগতে নাই।

গান্ধীজীর মৃতদেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। নেতা ও জনতা সবাই সমাধি ক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। শুধু একজনকে দেখা গেলো মাতাল অবস্থায় গান্ধীজীর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের পানি ফেলছে। সে গান্ধীজীর প্রথম পুত্র, যক্ষা রোগাক্রান্ত হীরালাল গান্ধী। আর একজন তখন ও সমাধি ক্ষেত্র ত্যাগ করেননি। তিনি শোক-বিহবল, কান্নায় কাতর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু। গান্ধীজীর চিতাভস্মের ওপর কয়েকটি গোলাপের পাঁপড়ি ছড়াতে ছড়াতে তাকে বলতে শোনা গেলো, বাপুজী আপনাকে আজ এই শেষ ফুল দিলাম। অন্ততঃ আপনার অস্থি ও ভস্মের ওপর এই ফুল দিতে পারলাম। কাল আমি কোথায় ফুল দেবো আর কাকেই বা ফুল দেবো, এই বলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়লেন।

গান্ধীজীর আত্মদান তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে কিছুটা সফল হয়েছিলো। আপাততঃ সেখানে সাম্প্রদায়িক হানা-হানি, জাতিতে জাতিতে ও বর্ণে বর্ণে হানাহানি, অনেকখানি হ্রাস পায়। ভারত ও পাকিস্তানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ধারণা হয়েছিল বিরলা ভবনে গান্ধীজীর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে রক্তপাত বন্ধের নতুন যুগ হয়তো সৃষ্টি হতে চলেছে।

হত্যাকাণ্ডের নায়ক নাথুরাম গডসে হাতে পিস্তলসহ ধরা পড়লো। সে গ্রেফতার এড়ানোর কোনে চেস্টাই করে নি। অন্যান্য আসামীরা একের

পর এক ধরা পড়তে লাগলো। আপতে, গডসে. গোপাল গডসে মদন লাল, কারকারে, সাভারকার, পারচুরে ও দিগম্বর বাটগের ভৃত্যকে আটচল্লিশ সালের সাতাশে মে তারিখে বিচারের জন্য আদালতের সামনে পেশ করা হয়। প্রথম থেকেই গডসে হত্যার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। কিন্তুতার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপতের ফাঁসির হুকুম হয়। অন্য পাঁচজন আসামী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

যে মহাত্মা গান্ধী নিজে জাতীয় নেতা হয়েও নিজেকে একজন বর্ণাশ্রম ধর্মী হিন্দু বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনিও হিন্দু উগ্রপন্থিদের হাতে নিহত হলেন। গান্ধীজী একজন দেশ বরেণ্য নেতা হয়েও তাঁর প্রচার ও বক্তৃতায় হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম প্রচার করার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। ১৯২০-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে তখন গান্ধীজী সংযুক্ত জাতীয় আন্দোলনের নেতা, তিনি নিজেকে "সনাতন ধর্মী হিন্দু" বলে প্রচার করেছেন। উচচ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"আমি নিজেকে সনাতন হিন্দু বলেই ঘোষণা করছি। কারণ— আমি বেদ-উপনিষদ এবং পুরাণে আস্থাশীল। হিন্দু ধর্মগ্রন্হ মতে অবতার ও পুর্ণজন্মে আমি বিশ্বাসী। —বর্ণা-শ্রম ধর্মেও আমি বিশ্বাসী। তবে তা একান্তভাবে বৈদিক মতে, বর্তমানের অশোধিত ও প্রচলিত মতে নয়। —বর্তমানের প্রচলিত ধারণার চেয়েও বৃহত্তর ধারণা অনুযায়ী আমি গো-জাতি রক্ষার আদর্শের বিশ্বাসী। —আমি মূর্তি পুজায় অবিশ্বাসী নই।

এমন কি গান্ধীজী যখন হিন্দু-মুসলমানদের একতার কথা জোর গলায় প্রচার করেছেন এবং জনগণকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন, সেখানেও তিনি নিজেকে একজন জাতীয় নেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। সেখানে তিনি ছিলেন "হিন্দু সনাতন পন্থী" নেতা। তিনি হিন্দুদের "আমরা" এবং মুসলমানদের "তোমরা" বলে উল্লেখ করতেন।

বলা বাহুল্য এই বিশেষ কারণে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথম দিকে এদেশে সদগুণ সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টা ছিল বিশেষ কোন কাজ করার প্রতি। গান্ধীজীর সনাতন হিন্দু-ধর্ম প্রচারের সোচচারে হিন্দু মুসলমানের আগের সৌহার্দ্যভাব অন্তর্হিত হল। অপরিহার্যভাবে গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন মোড় নিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে। এবং তা মুসলমানদের বিশেষভাবে ভীত ও সন্ধিগ্ধ করে তুললো। তারা ভাবলো—ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে হিন্দু-ধর্মীয় শাসনের চাপে পড়ে মৃত-প্রায় হয়ে থাকতে হবে মুসলমানদের। এমন কি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

॥ চৌদ্দ ॥

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে যে "পাকিস্তান" প্রস্তাব গৃহীত হ'য়েছিল এবং ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন যেভাবে ভারত ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন তাতে মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত পাকিস্তানের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। বরং এ পাকিস্তান রাজা গোপালাচারিয়ার প্রস্তাব অনুসারে দেয়া হয়েছিল। জিন্নাহ সাহেব তাই বলেছিলেন, "মুসলিম লীগ যে পাকিস্তান পেল, সেটা পোকায় কাটা খণ্ডিত বিকলাঙ্গ পাকিস্তান। (Moth-eaten truncated Pakistan)"।

চক্রান্তের ঘূর্ণাবর্তে পাকিস্তান

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই বৃটিশ শাসকরা বুঝতে পেরেছিল যে ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে তাদের চ'লে যেতে হবে। কিন্তু চলে যাওয়ার আগে তারা এই উপমহাদেশে তাদের প্রভাব জিইয়ে রাখার প্রয়োজনে দেশকে এমনভাবে খণ্ডিত করার ব্যবস্থা করেছিল যাতে খণ্ডিত অংশগুলি চিরকালের জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান থাকে। এবং এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ শাসকরা বহু জটিল সমস্যা অমীমাংসিত রেখে যায়। যার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ক কখনও সৌহার্দ্যপূর্ণ হতে না পারে। এই ইচ্ছা সামনে রেখেই তারা ১৯৪৫ সাল থেকে উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাংগা বাধাবার সব রকম ষড়যন্ত্র ক'রে রেখেছিল। এবং এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে উপমহাদেশের নেতারাও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চাপে পড়ে সুষ্ঠু চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলে ছিল। যার ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে তাদের নিজ নিজ আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে মাউন্টব্যাটেনের রায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। কংগ্রেস অখণ্ড ভারত চেয়েছিল। কিন্তু তা পায় নি। কেন পায়নি এ সম্পর্কে

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তারা মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার দেয়ার চেয়ে খন্ডিত ভারত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে শ্রেয় মনে করেছিল। ভারত যাতে খন্ডিত না হয় তার জন্য মিস্টার জিন্নাহ্ ১৯২৮ সাল পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কয়েকজন কংগ্রেস নেতার বিরোধিতার ফলে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়, এবং তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত মুসলিম লীগ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ হ'তে থাকে। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ একটি আপোষমূলক ফর্মুলা গ্রহণে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করে। এই ফর্মুলা যদি কংগ্রেস গ্রহণ করতো তাহ'লে ভারত বিভক্ত করার কোন প্রয়োজন হত না। মুসলিম লীগ ও তার উপরতলার নেতারা সকলেই "Grouping ফর্মুলা" গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম লীগের পূর্বে কংগ্রেস এই ফর্মুলা গ্রহণ করে। কিন্তু পরে মুসলিম লীগ যখন এটা গ্রহণ করে তখন কংগ্রেস সোজাসুজী তা অগ্রাহ্য করে। এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও আসামের গোপীনাথ বড়দলুই। শুধু তাই নয়, বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র এঁদেরই উদ্ভাবিত, এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও বল্লভ ভাই প্যাটেলের দ্বারা প্রভাবিত।

পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়ন এই দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অভ্যুদয়ের পূর্ব মুহূর্তে দিল্লীর ইম্পিরিয়াল হোটেলে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এক সভা হয়। এই সভায় মাউন্টব্যাটেনের দেশ বিভাগের নয়া ফর্মুলা গ্রহণ করা হয়। এটা ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের ঘটনা। জনাব আবুল হাশেম বিষয়টার উপর পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ

"মাউন্টব্যাটেনের এই নতুন প্রস্তাব ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন কাজেই যে প্রস্তাব সারা ভারতের মুসলিম লীগ কাউন্সিলার ও সাধারণ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে, তা অগ্রাহ্য করে গুটি কয়েক পার্লামেন্টারী সদস্যের অন্য কোনরূপ ফর্মুলা গ্রহণ করার অধিকার আছে কিনা? তিনি এ কথাও বলেন যে, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তে দুইটি সার্বভৌম

রাষ্ট্র স্থাপনের বিষয় লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত ছিল। পরবর্তী কালে এটা পরিবর্তন করে মাত্র একটি রাষ্ট্র স্থাপনের বিষয় কি করে "লাহোর প্রস্তাবের" অন্তর্ভুক্ত করা হলো তা মুসলিম লীগের সাধারণ সদস্যগণ জানতে পারলেন না। এতে ভয়ানক রকম বিশ্বাস ঘাতকতা করা হয়েছে। জনাব হাশেম এ কথা জোরের সঙ্গে বলেন যে, ভৌগোলিক সত্যকে অস্বীকার করে অ-বন্ধু সুলভ একটি রাষ্ট্রের দুই বাহুতে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার যুক্তি দুনিয়া কোন দিনই স্বীকার করবেনা, কারণ উভয় অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। এ ধরনের এক রাষ্ট্রের কল্পনা হবে অবাস্তব। আর সেজন্যই এ রাষ্ট্র রক্ষা করাও হবে অসম্ভব।

বিতর্কের সময় মিস্টার জিন্নাহ মন্তব্য করেছিলেন, "State শব্দটির শেষে "S" অক্ষরটি যুক্ত হয়েছিল ছাপাখানার ভুলের জন্য।" ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে States শব্দটি ছিলনা।" জনাব আবুল হাশেম তখন মুল প্রস্তাবের Record বই তলব করলেন। নবাবজাদা লিয়াকত আলী তখন মুল প্রস্তাবের হাতের লেখা Record উপস্থিত করলেন। তাতে দেখা গেল যে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের স্বহস্ত লিখিত প্রস্তাবে "States" শব্দটি রয়েছে। এতে আরও স্পষ্ট বোঝা গেল যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর চক্রান্তে দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দুষ্ট চক্রান্ত করা হয়েছে। এবং জিন্নাহ সাহেব এই সম্মেলনে স্বীকার করলেন যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব পরিবর্তনের ক্ষমতা পার্লামেন্টারী সদস্যদের সম্মেলনের নেই। কিন্তু না থাকলে ও তারা গায়ের জোরে দুই রাষ্ট্রকে এক রাষ্ট্র করে ফেললেন। এমনি ভাবে পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রের প্রথম বীজ উপ্ত হয়েছিল।

মিস্টার জিন্নাহর জম্মু ও কাশ্মীরে গিয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই পাকিস্তানের প্রথম গবর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। একদিকে যেমন শরনার্থীদের চাপ বেড়ে চলেছে, অপরদিকে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে তাঁকে। ফলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে ১৮ ঘন্টাই পরি-

শ্রম করতে হচ্ছে, বুকে নিদারুণ যক্ষ্মার ক্ষত নিয়ে। তাঁর যক্ষ্মা যে কয়েক বছর আগেই হয়েছিল তা ভারতের কয়েকজন শিখ এবং হিন্দু ডাক্তার ধরে ফেলেছিলেন। কিন্তু মিস্টার জিন্নাহ তাঁদের কথায় কান দেননি। এমন কি, তাঁর জীবনের একমাত্র সঙ্গী ভগ্নী ফাতেমা জিন্নাহ তাঁকে কোন দিন রাত্র দুইটার পূর্বে ঘুমাতে যেতে দেখেন নি। তাঁর অনুরোধ উপরোধ ও তিনি অগ্রাহ্য করতেন।

এই সময় লাহোর গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এক মজার সংবাদ এলো। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে রিফিউজী ট্রেন বোঝাই হ'য়ে হিন্দু ও শিখরা যখন অমৃতসরে যাচ্ছিল, তখন ট্রেনের মধ্যে এক হিন্দু মাথায় করাঘাত করে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলো, "হায় হায়, আমি সর্বস্ব হারিয়েছি।" তখন প্রহরারত একজন শিখ সামরিক অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, "রিফিউজিরা তো সর্বস্বান্ত হয়েই পাকিস্তান ছেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি দেখছি একমাত্র ভাগ্যবান যার কাছে টাকা-কড়ি ছিল।' লোকটা তখন কাঁদতে কাঁদতেই বললে, "আমার কাছে ৫ লাখ টাকা ছিল। এ সমস্ত টাকা আমি তাকেই দান করতাম যে নেহরু ও গান্ধীকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহন করবে।" অফিসারটি একটু হেসে বলেছিলেন, "আপনার মত এদেশের বেশীর ভাগ লোকই দেখছি উন্মাদ হয়ে গেছে।"

এবার মিস্টার জিন্নাহর কথায় ফিরে আসা যাক। অসুস্থ শরীর নিয়ে মিস্টার জিন্নাহ্ ২৬শে অক্টোবর তারিখে লাহোরে গেলেন সরকারী কার্যক্রম উপলক্ষে। কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ পর তিনি করাচীতে ফিরে এলেন সম্পূর্ণ ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে। তাঁকে জিয়ারত-এ পাঠানো হ'লো স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। সংগে গেলেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এলাহী বখ্‌শ্। ডাক্তার বখ্‌শ্ ছিলেন যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ, আর সেবিকা রূপে সংগে ছিলেন বোন মিস্ জিন্নাহ্। জিয়ারত-এ থাকা কালে মিস্টার জিন্নাহ্ মাঝে মাঝে ডাক্তার এলাহী বখ্‌শ্-এর সংগে আলাপ করতেন। তাও নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নয়। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ডাক্তার এলাহী বখ্‌শ্-এর মুখে শুনেছি মিস্টার জিন্নাহ তাঁর সংগে আলাপ প্রসঙ্গে ব'লেছিলেন,

"দেখ ডাক্তার, আমি জীবনে দুটি ভুল করেছি তাও পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে। প্রথম ভুল করেছি লাহোর প্রস্তাবকে বিকৃত ক'রে, যা দেশের একজন নেতা হিসেবে আমার পক্ষে আদৌ উচিত হয় নি। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব মানবে না। তারা নিশ্চয়ই স্বাধীন হ'য়ে যাবে। আর এর অন্যতম কারন হচ্ছে, ওদের ওপর বিমাতাসুলভ আচরণ। পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে ওদের ত্যাগের জন্যই এসেছে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ওদের প্রতি অবিচার করছে।

আমার দ্বিতীয় ভুল, আমি ঢাকায় গিয়ে করেছি। গভর্ণর জেনারেল হিসেবে ভাষা সমস্যা নিয়ে কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আসলে ভাষা প্রশ্নের মীমাংসা পার্লামেন্ট করতে পারত। কিন্তু আমি কয়েকজন পূর্ব পাকিস্তানী নেতার দ্বারা বিভ্রান্ত হ'য়ে ভাষার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু পুর্ব্ব পাকিস্তানী ছাত্র ও জনগনের যে দৃঢ় মনোভাব লক্ষ্য করেছি তাতে আমি বিশ্বাস করি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করার দাবী তাদের অযৌক্তিক নয়।

মিস্টার জিন্নাহ্ আরও বলেছিলেন, উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানী জনগনের ভাষা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে যার জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশী সেখানে শতকরা ১০০ জনই বাংলা ভাষী। সুতরাং বুঝতে পাচছ, বাংলা ভাষার দাবী কত জোরালো। আর এই জন্যই আমি ভাষা সম্পর্কে আর কোন কথা কোন দিন উচ্চারণ করিনি।"

মিস্টার জিন্নাহ্‌র শেষ কয়েকটি দিন জিয়ারত-এ অত্যন্ত অবহেলার মধ্যে কেটেছিল। মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁকে একটি পুরানো "ডাকোটা" বিমানে "জিয়ারত" থেকে করাচী নিয়ে আসা হয়। এই বিমানে আনার দরুনই তাঁর অবস্থার ঘোরতর অবনতি ঘটে। ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ জিন্নাহ্‌র কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। মিঃ জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতির একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটলো। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে যেমন ভারতের আত্মার মৃত্যু ঘটেছিল, মিঃ জিন্নাহ্‌র মৃত্যুতে তেমনি উপমহাদেশের এক অনমনীয় চরিত্রবান ব্যক্তিত্বের তিরোধান ঘটলো, সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রেরও মৃত্যু ঘটলো পাকিস্তানে।

॥ পনেরো ॥

১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি যে ভাবে দেশ ভাগ করে-ছিলেন তাকে অসংকোচে পাকিস্তানের প্রতি অবিচার বলা যায়।

দেশ বিভাগে বৃটিশ ষড়যন্ত্র

আসামে যে গণভোট হয় তাতে বিপুল সংখ্যক লোক পাকিস্তানের পক্ষে এবং পাঞ্জাবের বিপুল সংখ্যক ভোট পাকিস্তানের পক্ষে দেয়া সত্ত্বেও আসামের করিমগঞ্জ এবং পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলা ভারতের অংশে তুলে দেয়ায় একটা গুরুতর অবিচার করা হয়েছিল। কাশ্মীর ও ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতের সংগে সংযুক্ত রাখার মতলবেই যে এটা করা হয়েছিল তা বেশ বুঝতে পারা যায়। আর ভারতের প্রতি এই উদারতার অন্যতম কারণ ভারতের ন্যায় পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল পদে মাউন্টব্যাটেনকে নিযুক্ত না করে মিঃ জিন্নাহ্‌র স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল পদ গ্রহণ। কোন কোন রাজনীতিক বলেছেন যে, মিঃ জিন্নাহ যদি মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট হিসেবে গ্রহণ করতেন তাহলে পাকিস্তানের প্রতি মাউন্টব্যাটেনের এই ইচ্ছাকৃত অবিচার করা সম্ভব হতো না। কিন্তু মিঃ জিন্নার মনোভাব ছিল অন্যরূপ। তিনি মনে করেছিলেন যে, স্বাধীন পাকিস্তানে বিদেশী শাসকদের প্রতীক হিসাবে মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট করলে সেটা জাতীয় অবমাননার বিষয়বস্তু হয়ে থাকতো।

যাহোক, যে সব পক্ষপাতমূলক অবিচার করা হয়েছিল সে সব অবিচারের ধরণ-ধারণ এমন ছিল যে ভারতীয় নেতারা মনে করতেন পাকিস্তান টিকবে না। তা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে।

র‍্যাডক্লিফ কোলকাতার উপর পাকিস্তানের দাবী অগ্রাহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু স্বয়ং লীগ নেতারাই অগ্রাহ্য করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে বৃটিশ সরকার একটা

আন্দাজী দেশ বিভাগ ঘোষণা করলেন, তখন জনাব শহীদ সোহরা-ওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনি ঢাকাকে রাজধানী করার ঘোষণা করলেন, আর ঢাকা শহরের ২০ মাইল এলাকা অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করলেন কোলকাতা গেজেটে। এটা শহীদ সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিম উদ্দীনের আনন্দের কারণ হল, কারণ কোলকাতা পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ুক, এটা তাঁরা চাননি। কিন্তু শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং বাংলার মুসলিম ছাত্র সমাজ কোলকাতা পূর্ব পাকিস্তানের হাতে পাওয়ার আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু আজাদ, স্টার অফ ইণ্ডিয়া, মর্নিং নিউজ পত্রিকাগুলি তাদের সুর নরম করল। এর মধ্যে আর এক ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠলো, মওলানা আকরম খাঁ ও খাজা নাজিম-উদ্দীনের নেতৃত্বে। পূর্ব্ব পাকিস্তান আইন সভার নেতা নির্বাচনে তারা শহীদ সাহেবকে হারিয়ে দিয়ে নাজিমউদ্দীনকে নেতা নির্বাচিত করেন '৪৭ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে। নেতা নির্বাচিত হওয়ার সংগে সংগে নাজিমউদ্দীন সাহেব সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে দেশ বিভাগ কাউন্সিলের সদস্য পদ থেকে সরিয়ে সেখানে হামিদুল হক চৌধুরীকে নিযুক্ত করলেন।

দেশ বিভাগের সংগে সংগে পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ বন্যার স্রোতের মত কোলকাতা ত্যাগ করে ঢাকার দিকে ছুটলেন। তাদের পাওনা সম্পদ বুঝে নেওয়ারও তর সইলো না। খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ শাসন করতে লাগলেন, এবং মুসলিম লীগ সরকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে যথে-চ্ছচারের পথ গ্রহণ করলো। সহজ কথায় বলতে গেলে বলা যায় মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের পকেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো।

১৯৪৮ সালের গোড়া থেকেই পূর্ববঙ্গে বিপ্লব ধূমায়িত হতে শুরু করলো; এবং মিঃ জিন্নার ঢাকা সফর ও রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে এই বিপ্লবের আগুন তীব্রভাবে জ্বলে উঠলো। বাংলার ছাত্র সমাজ দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে ঘোষণা করলো যে তারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চায়। তাদের এই প্রতিজ্ঞা রূপ নিলো '৫২ সালের

২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে বিক্ষোভ করায় কয়েকজন তরুণ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলো সত্য, তবে ৮ কোটি মানুষের মুখের ভাষা ও প্রাণ পেয়ে গেল তাঁদের এই আত্মত্যাগের ফলে।

পূর্ববঙ্গ মন্ত্রীসভা তথা সরকার সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে পূর্ববঙ্গে আসতে দেননি। কাজেই ভারতে তাঁর অবস্থান শেষ করে শহীদ সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেন। এবং লাহোর হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান। মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মিঃ জিন্নাহ। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর চৌধুরী খালেকুজ্জামান যখন ১৯৪৮ সালে ভারত থেকে পাকিস্তানে পালিয়ে এলেন তখন তাঁকেই মুসলিম লীগ পুনর্গঠনের ভার দেয়া হয়। কিন্তু তিনি উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করে রেহাই পান।

পাকিস্তানে মুসলিন লীগের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠলো। লীগ নেতারা একদিনের গণপ্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগকে পকেটে পুরে যখন আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন তখন সোহরাওয়ার্দী ও মামদোতের নবাব ইফতেখার হোসেন খান একত্রিত হয়ে জিন্নাহ আওয়ামী লীগ গঠন করলেন এবং সীমান্ত প্রদেশে গিয়েও তিনি মানকী শরীফের পীর সাহেবকে নিয়ে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। সিন্ধুতে জিন্নাহ আওয়ামী লীগ, আওয়ামী জমাত ও সিন্ধু দস্তর পার্টির সহযোগিতায় শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন করলেন। এদিকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতি এবং নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখার কুমতলবের ফলে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ছাত্র, যুবক ও বামপন্থী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মওলানা ভাসানী যুব নেতা শামসুল হক ও ছাত্র নেতা শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলেন। বিভিন্ন প্রদেশের সরকার বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় সাধিত হলো। ১৯৫২ সালে লাহোরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের এক সম্মেলন আহবান করলেন। এই সম্মেলনেই দেশের বিরোধী দলের শক্তিশালী বুনিয়াদ কায়েম হলো।

১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগের ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। এতে বিভিন্ন শিল্প জাতীয়করণ, বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান প্রভৃতি ওয়াদা করা হয়েছিল। "বাংলাদেশ বাঙগালীদের জন্য" এই শ্লোগান তুলে তারা বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটালেন।

নির্বাচন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না মনে করেই পূর্ব পাকিস্তানের নূরুল আমিন সরকার ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন সংগে সংগে মুসলিম লীগের মুকাবেলা করার জন্য আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক দল, নিজামে ইসলাম পার্টি, ও গণতন্ত্রী দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলো এবং এই যুক্তফ্রন্টের শ্লোগান ছিল হক-ভাসানী-শহীদ এক হও।

প্রত্যেকটি অংগদল থেকে সম-সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হয়। এবং স্থির করা হয় যে যে দলের প্রার্থী যে কেন্দ্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় তাকেই সেই কেন্দ্রে মনোনয়ন দান করা হবে। এই প্রার্থী বাছাই নিয়ে অনেক সময় অনেক বিতণ্ডা ও বচসা হয়েছে। হক সাহেব অনেক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেছেন, আবার মানিক মিয়া ও সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁকে তোষামোদ করে সভায় ফিরিয়ে এনেছেন এই রকম নানারূপ অবাঞ্ছিত ঘটনার মধ্যে দিয়ে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচন শেষ হলো, এবং মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল হিসেবে কেবলমাত্র ইতিহাসের পাতায় একটু স্থান পেল, কিন্তু দেশের মাটিতে তার আর অস্তিত্ব থাকলো না।

উপমহাদেশে দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দুই রাষ্ট্রের দুই মহান স্রষ্টার জীবনাবসান উপমহাদেশের জন্য নৈরাশ্যজনক।

অশান্তির কবলে দুই রাষ্ট্র

একজনের মৃত্যু হল তাঁর স্বধর্মী উগ্রপন্থীদের হাতে, আর একজনের মৃত্যু সহকর্মীদের অবহেলায়। এই দুইজনই ছিলেন পূর্ণ গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। মহাত্মা গান্ধী শুধ যে হিন্দু মুসলিম ঐক্যেরউদ্গাতা ছিলেন তাই নয়, গণতন্ত্রের অগ্রপথিকও ছিলেন আর মিঃ জিন্নাহ ছিলেন গণতন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ সাধক, বৃটিশ গণতন্ত্রের

ধাঁচে তিনি গড়ে উঠেছিলেন। তাই পাকিস্তানীরা মনে করত মিঃ জিন্নাহ যতই কঠোর মেজাজের মানুষ হোন না কেন, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবেই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে পাকিস্তানের জনগণের সে আশা ভঙ্গ হলো। ধীরে ধীরে পাকিস্তান স্বৈরতন্ত্রের পথে অগ্রসর হল।

ভারত ইউনিয়নেও গান্ধীজীর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হ'তে থাকলো। প্রধান মন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য হ'লেও, তাঁর সেই কালজয়ী প্রভাব ছিল না তাঁর মধ্যে। ফলে, দেখা গেল যে নেহরুর গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়ীক দুষ্ট প্রভাব। দেশ বিভাগের সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা যে উচ্চ আশা পোষণ করেছিলেন, দেশ বিভাগের কুড়ি বছর পরেও তাঁদের সে আশা অন্ততঃ ভারতে ফলবতী হয় নি। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানে তাঁদের নাগরিকরা অতপর নিরূপদ্রব ও শঙ্কাবিহীন জীবন যাপন করতে পারবে কিন্ত ভারত ইউনিয়নে মুসলমানরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হল।

লন্ডনের "হিউম্যান রাইটস (মানবাধিকার কমিটি)" দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ভারতে মুসলিম গণহত্যা ও অন্যবিধ অমানবিক অত্যাচারের যে বিবরণ ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রেছিলেন তার কিছু অংশ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসাবে এখানে উদ্ধৃত হল। পুস্তকের মুখবন্ধে বলা হ'য়েছে ঃ

ভারতীয় গণতন্ত্রের বিচার করবার কষ্টিপাথর হ'চেছ কিভাবে এর সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহার করা হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরু গর্ব ক'রে বলেছিলেন 'আমাদের রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক নয়। এই গণতান্ত্রীক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে।" নেহরুর এই দাবী সম্পর্কে ডক্টর জ্যোতিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর "ইন্দো-পাকিস্তান রিলেশানস্' — গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের যে ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচেছ, তা কি মুসলমানদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের পরিচায়ক ? (পৃষ্ঠা ২১৫-২১৬)

মানবাধিকার কমিটির রিপোর্টে শত শত বিভীষিকা পূর্ণ ঘটনার উল্লেখ আছে। এখানে তার মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করব:

ভারতের সাধারণ মানুষেরা শান্তি প্রিয়। ওদের জনসংখ্যার মতই ওদের সমস্যারও অন্ত নেই। অশান্তি তাদের কাম্য নয়, হিন্দু মুসলমান পার্থক্য তারা অত বোঝেনা। কিন্তু একটা নগণ্য শ্রেণী এক একটি বিশেষ দলের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হ'য়ে অঘটন ঘটিয়ে থাকে। এমনি অঘটন ঘটিয়েছিলো রৌরকেল্লা, জামশেদপুর ও রাঁচীর দাঙ্গাকারীরা। তারা শুধু মুসলিম গণহত্যা করেনি। নারী ও শিশুদের উপর যে অত্যাচার তারা চালিয়েছিল তা ইতিহাসের ঘৃণ্যতম অপরাধকেও লজ্জা দেয়। এইসব হিন্দুরা মনে করে যে ভারত একমাত্র হিন্দুদেরই দেশ। এখানে মুসলমান, খৃষ্টান বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর ঠাঁই নেই। অবশ্য মুসলমানরাই ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সেহেতু সাম্প্রদায়ীক হিন্দুদের দৃষ্টি প্রথমে তাদের উপরই পড়ে অবশ্য খৃষ্টান, শিখ এবং অস্পৃশ্যদের উপর এদের হামলা মাঝে মাঝে যে ভাবে চলছে তাতে সরকার যদি কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহ'লে আগামী দুই বা তিন দশকের মধ্যে অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

ভারতের কংগ্রেস সরকার সাম্প্রদায়ীক হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় ঐক্য পরিষদ গঠন করেছিলেন। এই কমিটির প্রধান কাজ ছিল যে সকল সংবাদপত্র সাম্প্রদায়ীক বিদ্বেষ ছড়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। এর ফলে মুসলমান পরিচালিত সংবাদপত্র গুলি সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়লো। কোন হিন্দু সংবাদপত্রকেই স্পর্শ করা হয়নি শুধু তাই নয়, হিন্দু মহাসভার নেতারা তাদের প্রচার পুস্তিকায় যে ধরণের উক্তি করতে লাগলেন তা সাম্প্রদায়ীক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগলো জওয়াহেরলাল ও অন্যান্য সুস্থ মস্তিষ্ক কংগ্রেস নেতাদের শুভ প্রচেষ্টায়ও তা বাধা সৃষ্টি করে ছিল।

আর, এস, এস নেতা গোলওয়ালকর তাঁর পুস্তিকা "বাঞ্চ অফ থট্স" এ লিখেছেন, " যে সব কংগ্রেস নেতা বলেন যে, হিন্দু মুসলিম ঐক্য

ব্যতীত স্বরাজ অর্থহীন, তারা নিশ্চয়ই দেশ-দ্রোহী। জওয়াহের লালজী ইসলামকে একটি ভারতীয় ধর্ম বলে মনে করেন, এবং যে সব মুসলমান ভারতে বাস করে তাঁদের ভারতীয় জাতি হিসেবে গণ্য করেন। এটা নেহরুজীর ভ্রান্ত ধারণা। আজ ভারত যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে তার কারণ ভারতে অবস্থিত পাঁচ কোটি মুসলমান। ১৯৪৭—৪৮ সালে ভারতীয় মুসলমানরা যখন পাকিস্তানে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন নেহরুই প্রধান ব্যক্তি যিনি এই পলায়ন বন্ধ করেছিলেন। কাজেই দেখা যাচেছ যে, নেহরুজী ভারতের নিরাপত্তা অপেক্ষা পাঁচকোটি মুসলমানের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দান করেন।

আর. এস. এস. নেতা গোলওয়ালকরের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সেক্রেটারী ১৯৪৮ সালের ২৭ শে আগস্ট তারিখে যে পত্রখানি লেখেন নীচে তার কিছু অংশ তুলে দেয়া হলো ঃ

"প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আর. এস. এস. কোনরূপ দোষী নয়, এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন, এসব কথা প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন। গভর্ণমেন্টের হাতে অনেক প্রমাণ মওজুদ আছে। যুক্ত প্রদেশ সরকার এর আগে আপনাদের সাবধান করে দিয়েছে যে আপনাদের কার্য্যকলাপ সাম্প্রদায়ীক, আপনারা মুখে এক কথা বলেন এবং কাজে অন্যরূপ করেন।"

সরকারের তরফ থেকে এ ধরনের অনেক সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর ও হিন্দু মহাসভার উপর হতে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে এ সময় ভারতে আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সামান্য কারনে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়, আর দাঙ্গার অর্থই এক তরফা ভাবে মুসলিম নিধন। এই দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য অন্য কথায় মুসলিম হত্যা বন্ধ করার জন্য "টাইমস্ অব ইন্ডিয়া" পত্রিকায় পাকিস্তানের সংগে ভারতের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের আদান প্রদানের কথা বলে ছিলেন। যার জবাবে লাক্ষ্ণৌএর

মুসলিম মজলিসের তরফ থেকে এক কড়া রকমের জবাব দেয়া হয়। তাতে তারা বলেন যে,

" পাকিস্তান কেন, কোন দেশই ভারতের এই আট কোটি মুসলমানকে জায়গা দিতে রাজী হবে না। তা ছাড়া, মুসলমানরা ভারতের নাগরিক। তারা বিক্রয় বা বিনিময় যোগ্য পন্য নয়। সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়ের মত সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমান অধিকার আছে এই দেশের উপর। মুসলমানরা এদেশেই থাকবে এবং এই সিদ্ধান্তের কোনরূপ রদবদল হবে না। দেশের কল্যানের জন্যই আমরা সবাই কাজ করে যাব এবং সরকারের ও কর্তব্য হবে সবার প্রতি সুবিচার করা।

নিম্নে মুসলমানদের উপর অত্যাচারের কয়েকটি বিবরণ দিচ্ছি, যাতে দেখা যাবে যে দাঙ্গাকারীদের সংগে সরকারী কর্মকর্তাদের কি রকম যোগসাজস ছিল ঃ

পিপরা ও ঝারাওয়ান দাঙ্গা, থানা ডোমারিয়াগঞ্জ, জেলা বস্তি, তারিখ ৮ই ও ৯ ই মার্চ ১৯৬৭ সাল।

গ্রামে গুজব রটে গেল যে, মুসলমানরা গরু জবেহ করেছে এ গুজবের সংগে সংগে হজার হাজার হিন্দু সমবেত হলো। তাদের নেতারা উত্তেজনা মূলক বক্তৃতা করতে লাগলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ অফিসাররাও সেই সভায় যোগদান করে—হিন্দুদের উৎসাহিত করলো। সংগে সংগে মুসলমান বস্তীতে লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগ শুরু হলো। প্রধানমন্ত্রী সি, বি গুপ্তা এবং পরে প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং দাঙ্গা দমনের চেষ্টা করলেন এবং কম্বল, শাড়ী, শার্ট পাজামা, সোয়েটার এবং গম ও নগদ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মুসলমান দাঙ্গা পীড়িতদের জন্য পাঠালেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা ও ডাকাতির মামলা দায়ের করা হলো। বিচারে মামলা ফেঁসে গেল। জজ তাঁর রায়ে বললেন যে, " এ মামলা মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।"

আর একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি। ঘটনাস্থল বারানসী, তারিখ ২১ শে, এপ্রিল, ১৯৬৭ সাল।

একটি তাজীয়া শোভাযাত্রা গোলা হনুমান ফটক দিয়ে যাচ্ছিল। তখন হিন্দুরা তাজীয়ার উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। এবং ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শোভা যাত্রার উপর লাঠি চার্জ করে। গলির শেষ প্রান্তে একজন ম্যাজিস্ট্রেট শোভা যাত্রার উপর গুলি চালনার নির্দেশ দেয়। ১৮ জন গুলি বিদ্ধ হয় এবং একজন মারা যায়। এ ছাড়া ও কয়েকজন মুসলমানকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে বহু সংখ্যক মুসলমানকে গ্রেফতার করে হাজতে রাখা হয়। এই ঘটনার উপর কোনরূপ তদন্ত হয়নি এবং কোন পুলিশ কর্ম-চারীকে দণ্ডিত করা হয়নি।

মুসলিম মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঃ গ্রাম-পুথ, থানা-জানি, জেলা-মিরাট, তারিখ ২০ শে জুন ১৯৬৭।

এই গ্রামের হিন্দু বালিকা সুরেশী খালের পানিতে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনাটা সাম্প্রদায়ীক হিন্দুরা এমন ভাবে প্রচার করে যে, একটি মুসলমান যুবকের সহিত প্রেম ঘটিত ব্যাপার নিয়ে সুরেশী আত্মহত্যা করেছে। প্রায় দুই শত হিন্দু গুণ্ডা এবং কিছু পুলিশ কনস্টেবল গ্রামে ঢুকে কয়েকজন মহিলাকে জোর করে ধরে থানায় নিয়ে যায় এবং তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। অত্যাচারীত মেয়েদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলাও ছিল।

লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ ঃ গ্রাম—পাকড়ী, থানা—সৌহা, জেলা—বস্তি তারিখ ২২ শে ডিসেম্বর ১৯৬৭।

এই গ্রামে একটি ষাঁড় স্বাভাবিক ভাবেই মরে পড়েছিল। কিন্তু গুজব রটানো হয় যে, মুসলমানরা গো হত্যা করেছে। সংগে সংগে প্রায় দশ হাজার হিন্দু পুলিশ সংগে নিয়ে মুসলমান বস্তী আক্রমন করলো। ৮৫ টি মুসলমান বাড়ীর মধ্যে ৮২ টি বাড়ী এবং ৩০ টি গরুর গাড়ী পুড়িয়ে ছাই করে দিল। এখানে কাউকে গ্রেফতার করা হয় নি।

এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গার যে ইতিহাস মানবাধিকার

কমিটি প্রকাশ করেছে তা এখানে দেয়া সম্ভব নয়। তবে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়ীক উত্তেজনা সৃষ্টি ও লুঠতরাজের সুযোগ করে নেয়ার এমন নজীর বোধ হয় আর কোন দেশেই পাওয়া যাবে না। তবে মাঝে মাঝে এ কথাই মনে হয় যে, মানুষের কল্যানব্রতী মহাত্মা গান্ধীকে যে হিন্দুরা হত্যা করতে পারে, তাদের দ্বারা যে কোন রকম জঘন্য নৃশংসতা অসম্ভব কাজ নয়।

স্বাধীন দেশে ইসলাম বিলুপ্তির চেষ্টা যে সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা করবেই এটা জানা কথা। কিন্তু সমূহ বিপদের মধ্যে ইসলাম তার নিজস্ব মহিমায় সমুন্নত থেকেছে চিরকাল, থাকবেও অনন্তকাল ধরে।

॥ ষোল ॥

যুক্তফ্রন্ট নেতা ফজলুল হক

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা হিসাবে জনাব এ, কে, ফজলুল হক পার্লামেন্টারী দলের নেতা মনোনীত হলেন এবং তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভা গঠন করলেন। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পূর্ব বাংলার এই বিজয় ভাল চোখে দেখতে পারলো না। তারা আদমজী পাটকলে এক ভয়াবহ দাঙ্গা বাধিয়ে দিলো। এই সময়ে এক মার্কিন সাংবাদিক কালাহান, হক সাহেবের এক বিবৃতি নিয়ে মার্কিন পত্রিকায় বিকৃতভাবে ছাপিয়ে দিয়েছিলো। এর পরপরই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলী করাচী ফিরে এলেন। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে মোহাম্মদ আলীকে বসানো হলো। তিনি প্রথমেই হক সাহেবের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করলেন। এবং তাঁকে দেশদ্রোহী বলে কুৎষিত ভাষায় গালাগালিও করলেন।

এতেও মুসলিম লীগ নেতারা ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের করাচী ডেকে পাঠালেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। কিন্তু তাঁরা করাচী থেকে ঢাকায় ফিরবার আগেই অত্যন্ত অভদ্রভাবে ৯২ (ক) ধারা জারি করে পূর্ব-বাংলায় গবর্নরের শাসন কায়েম করলেন। ঢাকায় অবতরণের সংগে সংগেই কয়েকজন মন্ত্রী এবং আইন সভার কয়েকজন সদস্যকে গ্রেফতার করা হলো। হক সাহেব স্বগৃহে অন্তরীণ থাকলেন। এ সময় চৌধুরী খালেকুজ্জামান ও হাফেজ মোহাম্মদ ইসহাক যথাক্রমে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ও চীফ সেক্রেটারী ছিলেন।

তাঁদের টেলিফোনে বদলী করে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও মিঃ এন এম, খানকে যথাক্রমে গভর্নর ও চীফ সেক্রেটারী করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হলো।

মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করার সংকল্প নিয়েই ইস্কান্দর মির্জা ঢাকায় এসেছিলেন এবং ঢাকা আগমণের পূর্বেই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, মওলানা ভাসানীকে তিনি গুলি ক'রে মারবেন। সৌভাগ্যের বিষয়, মওলানা ভাসানী তখন দেশে ছিলেন না— শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি ইউরোপে গিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে আরও তিন বছর পিছিয়ে যেতে হয়। ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর। রাওয়াল-পিণ্ডির এক জনসভায় বক্তৃতা করতে উঠলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। গুপ্তঘাতকের গুলি প্রধানমন্ত্রীর বক্ষ ভেদ করল। "আল্লাহ পাকিস্তান কো হেফাজত করে" বলে লিয়াকত আলী খান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার মধ্যে দিয়েই মনে হয় পাকিস্তানের গণতন্ত্র তথা ভবিষ্যৎকে হত্যা করা হলো। খাজা নাজিমুদ্দীন তখন গভর্নর জেনারেল। তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদি দখল করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন এবং প্রধানমন্ত্রীত্ব তাঁর দখলে এসে গেল। এই সুযোগে পঙ্গু গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হলেন। গোলাম মোহাম্মদ যখন এত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারেন না—সোজা হয়ে হাঁটতেও পারেন না। পঙ্গু গভর্নর জেনারেলকে দেখে মনে হ'ত পাকিস্তানের অবস্থাও কি এমনি ধারা হবে?

গোলাম মোহাম্মদ মূলতঃ রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি ভারতীয় রেলওয়ের অডিট বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন। পরে তাকে মন্ত্রি-সভায় গ্রহণ করা হয়। আর এই গোলাম মোহাম্মদই নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসালেন। কিন্তু এক বৎসর যেতে না যেতে ষড়যন্ত্রের গতিপথ বদলালো। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে বাদ দিয়ে পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসানো হলো। আর যে

শেরে বাংলাকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বিশ্বাসঘাতক বলে গালিগালাজ করেছিলেন তাঁকে এই মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে বহাল করা হলো। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর আমলেই ১৯৫৬ সালেয় ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। এ সময় মন্ত্রিসভা পঙ্গু গোলাম মোহাম্মদকে গভর্নর জেনারেলের পদ থেকে সরিয়ে মেজর জেনারেল পাকিস্তানের ইস্কান্দার মির্জাকে গভর্নর জেনারেলের গদিতে বসান। নতুন প্রথম প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামী গণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন। এর আগেই প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে ভেঙে এক ইউনিট করলেন এবং পূর্ব বাংলার নাম সরকারীভাবে এই প্রথম পূর্ব পাকিস্তান রাখা হলো। এটা ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসের কথা।

পাকিস্তানে ভাঙা গড়ার শেষ নেই। মুসলিম লীগ দলে আবার নতুন করে ভাঙন শুরু হলো। রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেছেন ডঃ খান সাহেব। ইনি সীমান্ত গান্ধী বলে পরিচিত খান আবদুল গফ্ফার খাঁর ভাই। পাকিস্তান হওয়ার আগে তিনি একজন জবরদস্ত কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তাঁর জন্যই সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ সুবিধে ক'রে উঠতে পারেনি। মুসলিম লীগ দলের অনেকেই ডঃ খান সাহেবের রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান করল, এবং খান সাহেব আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সমর্থনে এগিয়ে এলেন। ফলে, ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে সরিয়ে শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রীর গদী দখল করলেন। কিন্তু এই মন্ত্রিসভাও মাত্র ১৪ মাস স্থায়ী হলো। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। রিপাবলিকান দল আবার মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। ফলে, মুসলিম লীগের ইসমাঈল ইব্রাহীম চুন্দ্রীগড় পাকিস্তানের উজীরে আযম হ'লেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে বেশীদিন মন্ত্রীত্ব করা ঘটলো না। তিনিও পদত্যাগ করলেন। তখন ডঃ খান সাহেব তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি হিসাবে স্যার ফিরোজ খান নুনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন। ফিরোজ খান নুন মুলতঃ রাজনীতিক ছিলেন না, ছিলেন ঝানু কুটনীতিক। বৃটিশ আমলে তিনি ভারতের হাই কমিশনার

হিসেবে বহুদিন লণ্ডনে কাটিয়ে এসেছেন। ফিরোজ খান নূন এর সংগে আমার আলাপ হয় লেডী নূনের মাধ্যমে। লেডী নূন একজন বৃটিশ ইহুদী মহিলা, সমাজকর্মী হিসেবে তিনি পাকিস্তানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে ছিলেন। অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমি তাঁর সংগে সফর করেছি। অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি পরকে আপন ক'রে নিতে পারতেন। স্যার ফিরোজ খান নূন যখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন তখন লেডী নূনের উদ্যোগে ঢাকায় একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। লেডী নূনের নামানুসারে এই বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় "ভিখারুন নেসা নূন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।"

১৯৫৫ সালে ৯২ (ক) ধারার শাসন প্রত্যাহার করার পর থেকে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত পালাক্রমে আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খান কয়েকবার পূর্ব-পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রদেশে অনিশ্চিত অবস্থা এবং কেন্দ্রে অন্যায় অনিয়ম ও গোজামিল। কেন্দ্রে তখন ফিরোজ খান নূন প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছেন। এই অবস্থায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খান ইস্কান্দার মির্জাকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার এবং প্রেস সেন্সর শীপ জারি করে দেশে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করা হল।

সামরিক শাসন

সামরিক আইন জারি করে ইস্কান্দার মির্জাকে প্রেসিডেন্ট এবং নিজে প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করে আইউব খান দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করতে লাগলেন কিন্তু এতেও তিনি খুশী হলেন না। ২৭শে অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জাকে বন্দুকের মুখে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতা দখল করলেন। প্রেসিডেন্ট হলেন আইউব খান এবং তাঁর মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। তাঁর প্রথম কাজ হল দেশ থেকে চোরাচালানী, দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দূর করা। অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে আইউব খান শাসন ভার গ্রহণ করার সংগে সংগে চোরাচালানী ও মওজুদদারীর

অবসান না হলেও অনেকখানি কমে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দামও অসম্ভব রকম কমে গিয়েছিল। ফলে, সাধারণ মানুষ খুশী হল।

আইউবী শাসন চললো দীর্ঘ দশ বছর। স্বৈরতন্ত্রী শাসন হলেও এই দশ বৎসরে পাকিস্তানে উন্নয়নমূলক কাজ যথেষ্ট হয়েছে একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অনেক কম কাজ হয়েছে। সিংহ-ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানই নিয়েছে। এর জন্যে দায়ী যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেছে নেয়া কয়েকজন বাঙালী মন্ত্রী তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের কথা এই মন্ত্রীরা যদি প্রেসিডেন্ট আইউবের সামনে তুলে ধরতে পারতেন তাহলে হয়তো এতটা অবিচার হ'ত না।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর প্রথম তিন বছর কোনরূপ বিক্ষোভ বা আন্দোলন হয়নি। কিন্তু '৬২ সালের গোড়ার দিকে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিদেশী রাষ্ট্রের চর অভিহিত করে গ্রেফতার করলে—ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরপর ফেব্রুয়ারী মাসে আইউব খান ঢাকায় এলে এই বিক্ষোভ প্রচন্ডতর রূপ নেয়। পুলিশের গুলি চললো। প্রাদেশিক নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। জেনারেল আযম খান এই সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানের গবর্নর ছিলেন সে জন্যই বোধ হয় পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর নিপীড়নের মাত্রা অনেকখানি কম হয়েছিল।

শেরে বাংলার তিরোধন

এই বছরেই জাতির ভাগ্যাকাশে আবার কালমেঘ ঘনালো। '৬২ সালের ২৭ শে এপ্রিল তারিখে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ইন্তেকাল করলেন। সারা পূর্ব পাকিস্তানে জাগলো শোকের প্লাবন। আর এর ঢেউ লাগলো প্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে দুনিয়ার সবখানে। ২৮ শে এপ্রিল পল্টন ময়দানে জানাজার নামাজে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। শবদেহ স্থাপন করা হ'য়েছিল এক বিরাট খাটিয়ায়। আর সে খাটিয়া বহন করে নিয়ে চললেন গভর্নর আযম খান ও অন্যান্য নেতারা। হাইকোর্টের পাশে সমাহিত হলেন বাংলার কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের বন্ধু শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক।

১৯৬২ সালে আইউব দেশে মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যগণের ভোটে কেন্দ্রে ও দুই প্রদেশে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। '৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইউব মিস্ জিন্নাহকে শতকরা ৬৫ ভোটে হারিয়ে আরও পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লেন।

পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইউব কিছুটা কাজ করেছিলেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর উদ্যোগে জাতীয় পুণর্গঠন সংস্থা গঠিত হয়। বিভিন্ন শিল্পপতি ও ব্যাংক আইউবের অনুরোধে বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন। এদেশের অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বুলবুল একাডেমী ও নজরুল একাডেমী আইউব আমলেই সবচেয়ে বেশী সরকারী সাহায্য পেয়েছিল। অবিশ্যি এই সাহায্য যে বাঙালীদের প্রতি প্রীতির জন্যই দেয়া হয়েছিল একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

তিনি "ফ্রেণ্ড নট মাষ্টার" গ্রন্থে বাঙালী মুসলমানদের যে চরিত্র চিত্রিত করেছেন তা বাঙালী জাতির পক্ষে অবমাননাকর। অথচ তাঁর এই ইংরেজী পুস্তকের বাংলা তর্জমা করেছিলেন যে সব বাঙালী, তারা স্বাধীন বাংলাদেশের কেউকেটা হয়েছিলেন। কাজেই একথা মনে করার সংগত কারণ আছে যে আইউব এদেশের সাংস্কৃতিক অংগনে যে করুণা বর্ষণ করেছিলেন তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বাঙালীদের বিক্ষুব্ধ মনকে তাঁর পক্ষে টানবার জন্যই এইসব কাণ্ড কারখানা।

সামরিক আইন প্রত্যাহার করার পর দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন না করে একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের জন্য ৯ নেতা এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করলেন। এ সময়ে মিঃ সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। তিনি ৯ নেতার বিবৃতির সমর্থনে এক বিবৃতি প্রচার করলেন। নেতাদের সম্মতিক্রমে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা হলো। এই ফ্রন্টে যোগ দিল শেরে বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং আরও কয়েকটি ছোট ছোট দল। সব

দলের নেতারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য প্রচার অভিযানে অবতীর্ণ হলেন। দেশের দুর্ভাগ্য যে, এই ক্রান্তিলগ্নে সোহরাওয়ার্দী সাহেব অসুস্থ হয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্থাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব চলে যাওয়ার পর মুসলিম লীগ নেতা নুরুল আমীন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা পালন করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, দেশবরেণ্য সংগ্রামী নেতা মওলানা ভাসানী, জনাব আতাউর রহমান খান প্রমুখ ঐক্যবদ্ধভাবে দলের কাজ করে যাচ্ছেন। এতে শেখ মুজিব আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। নেতৃত্ব বুঝি তাঁর কব্জা থেকে ফসকিয়ে যায়। তিনি দিশাহারা হয়ে লণ্ডনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর কাছে হাজির হলেন এবং আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার দাবী জানালেন। শহীদ সাহেব বুঝতে পারলেন যে ঐক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা শুরু করেছেন শেখ মুজিব। অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকে শহীদ সাহেব জানিয়ে দিলেন যে. "শেখ মুজিব দেশের হয়তো অকল্যাণ করবে, তোমরা সাবধান থেকো"।

শহীদ সাহেব এরপর আর দেশে ফিরতে পারেন নি। ফিরে আসার পথে বৈরুতের এক হোটেলে ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁর জীবনাবাসন ঘটে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর সত্যিকার পরিচয় দিতে হলে কিছুটা পিছনের কথা বলতে হয়।

মিঃ হান্টার তাঁর "ইণ্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থে লিখেছেন, কলকাতার সরকারী অফিস আদালতে এমন কোন মুসলমানকে দেখতে পাওয়া যাবে না, যারা দারোয়ান, পিওন ও দোয়াত-কলম সাফ করা ছাড়া অন্য কোন চাকুরিতে বহাল আছে।

মিঃ হান্টার আরো বলেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানরা ভিস্তি ও ঘেসুড়ে ছাড়া আর কোন সম্মানজনক কাজ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিল।

ভারতীয় মুসলমানদের শোচনীয় দুর্ভাগ্যের এই পটভূমিকায় উপমহাদেশে পূর্বপ্রান্তে দুইজন মহান নেতার জন্ম হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে এ,কে,

ফজলুল হক ও পশ্চিমবঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। উভয়েই সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলেন। জন্মসূত্রে তাঁরা ধনীর সন্তান, কিন্তু কর্মজীবনে তাঁরা হয়েছিলেন সর্বহারার প্রতিনিধি।

স্যার জোহাদুর রহিম জাহেদের দ্বিতীয় পুত্র হোসেন শহীদ। ১৮৯২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর শহীদের জন্ম জীবনের প্রথম থেকেই তিনি বিদ্যালয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উপমহাদেশের বিখ্যাত রাজনীতিক ও লেখক এ. কে. এম. মুন্সী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছিলেন, "অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে দেখলাম দু'টি যুবক, যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তারা দুই ভাই। বড় হাসান, ছোট হোসেন। শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ে হাসান অনন্যসাধারণ আর রাজনীতিতে হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একচছত্র নায়ক। আমার বিশ্বাস, হোসেন পরবর্তীকালে উপমহাদেশেয় রাজনীতিতে অসামান্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে আবিভূত হবে।"

হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে মুন্সীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

যুক্তরাজ্যে শিক্ষা শেষ করে শহীদ সাহেব দেশে ফিরলেন ১৯১৮ সালে। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতে যোগ দিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন মামা আবদুল্লাহ-আল-মামুন সোহরাওয়াদী।

রাজনীতির অঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইনসভায় তাঁর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। আগেই বলেছি, সোনার চামচ মুখে নিয়ে তাঁর জন্ম কিন্তু তিনি তাঁর আসন করে নিয়েছিলেন সর্বহারাদের মাঝে। তাই তাঁকে দেখা গেছে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে শ্রমিকদের মাঝে। কৃষক-শ্রমিক মজুরদের সংগে এক কাতারে বসে তিনি পরম আনন্দে চা পান করেছেন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান শ্রমিক মজুরদের কাঁধে হাত দিয়ে পাশাপাশি চলেছেন আলাপ করতে করতে। আবার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যখন রক্তক্ষয়ী দাংগা শুরু হয়েছে ১৯৪৬ সালে, তখন দেখেছি, দূর্বল বিচিছন্ন মুসলমানদের একত্রিত করতে।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় ভয়াবহ দাংগার সময় দেখেছি শহীদ সাহেবের দুঃসাহসিকতা। তারিখটা মনে আছে এখনও। ১৮ই আগস্ট তারিখে পূর্ব কলকাতায় বিহারী গোয়ালারা পার্কসার্কাস আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল। এতে কিছু হিন্দু গোয়ালা হতাহত হল। ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনে শহীদ সাহেব তার এক দেহরক্ষী নিয়ে তার ছোট জাগুয়ার গাড়ীতে পার্ক সার্কাসে একাই হিন্দু এলাকায় চললেন। এভাবে একা হিন্দু এলাকায় যেতে আমরা বারণ করলাম। জবাবে তিনি বললেন, "শহীদ জীবনের ভয় করে না। আর হিন্দুরাও জানে শহীদ তাদেরও বন্ধু।" এই কথা বলেই তিনি গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

আরো অনেক আগের কথা। শহীদ সাহেব তখন কলকাতা হাইকোর্ট বারের নতুন ব্যারিস্টার ও দেশের একজন শ্রমিক নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তখন স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেছেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির জয়জয়কার। দেশবন্ধু দাস তাঁর ডান হাত হিসেবে পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র ও শহীদকে। মজার কথা, শহীদ সাহেব তখন কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির কোনটারই সদস্য ছিলেন না। তবুও দেশবন্ধু দাস শহীদ সাহেবকে কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়রের পদে নিয়োগ করেছিলেন। দেশবন্ধু দাস স্বয়ং মেয়রের পদ গ্রহণ করেছিলেন, সুভাষচন্দ হয়েছিলেন চীফ একজিকিউটিভ অফিসার।

শহীদ সাহেবের পরামর্শক্রমে দেশবন্ধু দাস "বেঙ্গল প্যাক্ট" রচনা করেছিলেন। এই প্যাক্ট বা চুক্তিতে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার, চাকুরীতে বিশেষ সুবিধা দিয়ে হিন্দুদের সমকক্ষ করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর হিন্দু নেতাদের চক্রান্তে প্যাক্টেরও অকাল মৃত্যু ঘটে।

১৯৩৬ সাল। ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ অনুযায়ী নির্বাচনে যে তোড়জোড় চলছিল সারা উপমহাদেশে, তাতে হিন্দুদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তার মোকাবিলায় মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন চেষ্টাই করছিল না। যে সকল প্রদেশে মুসলমানরা

সংখ্যাগুরু সেখানেও ক্ষুদ্র দলাদলি ও উপদলীয় স্বার্থে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী মুসলমানদের সংঘবদ্ধতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে কৃষক, প্রজা, শ্রমিক, মালিক, সবাই একদলভুক্ত হয়ে একই পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় ইউনাইটেড বা সম্মিলিত মুসলিম দল নামে একটি সংস্থা গঠিত হল এবং ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ বাহাদুর এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

১৯৩৬ সালেই মিঃ জিন্নাহ কলকাতায় এলেন এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীর সংগে সাক্ষাৎ করে একটি সম্মিলিত দল গঠনের প্রস্তাব করলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী সেই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ফলে মিঃ জিন্নাহর মুসলিম লীগ এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীর সম্মিলিত মুসলিম দল এক হয়ে গেল; এবং এই দলের নাম হল মুসলিম লীগ। জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দীর সম্মিলিত নেতৃত্বে ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হল। পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করার জন্য যিনি প্রাণপাত করেছিলেন, সেই সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতারা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে ঠাঁই দেয় নাই।

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে হক সাহেবের নেতৃত্বে যে লীগ প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তা ১৯৪১ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপর জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় জনাব সোহরাওয়ার্দীসহ মুসলিম লীগ দলীয় মন্ত্রীরা লীগের নির্দেশে পদত্যাগ করলেন।

১৯৪৩ সালে আবার মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হল এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেব খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বাংলার দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, তা তুলনাহীন।

১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর ১৮ই এপ্রিল তারিখে জনাব সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগ দলীয় প্রধান হিসেবে দিল্লীতে ক্যাবিনেট মিশনের সাথে দেখা করে বলেন; একমাত্র মুসলিম

লীগই ভারতের দশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। কাজেই লীগের পাকিস্তান দাবী মেনে না নেয়া হলে ভারতের শাসন-তান্ত্রিক সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

এরপর ১৯৪৬ সালের ২৯ শে জুলাই তারিখে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান হাসিলের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী ঘোষণা করেন যে কংগ্রেসকে একতরফা ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন খাজনা দেয়া হবে না।

রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে যখন অচল অবস্থার সৃষ্টি হল তখন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মিঃ শরৎচন্দ্র বসু বাংলা সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবে বাংলার স্বকীয়তা বজায় রেখে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রধানমন্ত্রীত্বের বিধান রাখা হয়। লীগ নেতারা এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেস পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেয়। ফলে, বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাবের আর কোন মূল্য থাকলো না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল। দেশ ভাগ হয়ে গেল কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব ভারতের ১০ কোটি মুসলমানের মুখ চেয়ে ভারতে থেকে গেলেন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে শান্তি-মিশনে কাজ করতে লাগলেন। তবে ভারতীয় হিন্দু নেতাদের মানসিকতার জন্য তাঁকে পরে পাকিস্তানে চলে আসতে হয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের মানসিকতা। যে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বাংলায় মুসলিম লীগকে সুপ্রতি-ষ্ঠিত করেছিলেন, মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে শেরে বাংলার পরে যাঁর নাম মনে পড়ে, তাঁকে পূর্ব-পাকিস্তানী সরকার পূর্ব-পাকি-স্তানের মাটিতে নামতে দেননি।

শহীদ সাহেবের ডান হাত স্বরূপ ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। ইত্তেফাকের সম্পাদক হিসেবে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর জন্য তিনি ছিলেন বিপজ্জনক ব্যক্তি। শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইত্তে-ফাক ছিল সর্বদাই উচ্চকন্ঠ। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মানিক মিয়াকে কয়েকবার গ্রেফতার ক'রে জেলে আটক রাখা হয়। তাঁর

পত্রিকা বন্ধ ক'রে দেয়া হয় এবং প্রেস বাজেয়াফ্ত করা হয়। এই মানিক মিয়াকেও দেশ হারালো। ১৯৬৯ সালের ১লা জুন পিন্ডির এক হোটেলে মানিক মিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, "মানিক চলে গেল, সাহস করে কথা বলার আর কেউ এদেশে থাকল না।"

১৯৬৫ সালের গোড়া থেকেই পাকিস্তান-ভারত সম্পর্ক খুব খারাপের দিকে চললো। পাকিস্তান প্রচার করতে লাগলো যে জম্মু ও কাশ্মীরে আন্তবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। অপর দিকে ভারত প্রচার করলো যে পাকিস্তান গোপনে কম্যান্ডো পাঠিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে উভয় রাষ্ট্রই স্ব স্ব সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে। কিন্তু এটা যে সর্বাত্মক সংঘর্ষের রূপ নেবে তা তখন বোঝা যায়নি। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভোরবেলা ঢাকা সেনা নিবাসের উপর তিনখানা ভারতীয় মিগ বিমান বোমাবর্ষণ করে পালিয়ে গেল। এরপর বেলা ১১টার সময় বেতারে আইউবের কন্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ভারত তষ্করের মত পশ্চিম পাকিস্তানের একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের উপর বিমান হামলা চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করেছে। তিনিও ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সৈন্যদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের নীলফামারী, সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিমান হামলা চালিয়েও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বেতারে ঘোষণা করতে লাগলেন যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালাবে না। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানীরা তাদের বন্ধু। 'শাস্ত্রীজীর এ ধরনের উক্তির কারণও ছিল। ভারত যখন পাকিস্তান আক্রমণ করল তখন ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের লাদাখ ও সীকিমের সীমান্ত বরাবর গণচীন তার আটটি মাউন্টেড ও পদাতিক ডিভিসন মোতায়েন করেছিল। এবং ভারতকে জানিয়ে দিয়েছিল যে সীমান্ত এলাকা থেকে ভারত যদি তার ছোট ছোট ঘাঁটিগুলি তিনদিনের মধ্যে ভেঙ্গে না ফেলে তবে চীন কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। ভারত চীনের এই নির্দেশ পালন করেছিল। আর এই কারণেই বোধহয় ভারত পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণের ঝুঁকি নিতে সাহস করেনি।

পশ্চিম পাকিস্তানে দীর্ঘ ১৭ দিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। নতুন দু'টি দেশের এই আত্মঘাতী যুদ্ধে বিশ্বজনমত জাগ্রত হলো। সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্যোগে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ শহরে পাক-ভারত আপোস আলোচনার ব্যবস্থা করা হল। উদ্যোগ নিলেন রুশ নেতা কোসিগিন। জানুয়ারী মাসে কয়েকদিন আলোচনার পর ১৯৬৬ সালের ১০ ই জানুয়ারী তারিখে পাক-ভারত আপোস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোঃ আইউব খান। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যে কাশ্মীর নিয়ে গোলযোগ সেই কাশ্মীর সমস্যাকে চুক্তির বাইরে রাখা হয়। ১০ই জানুয়ারী চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র ৯ ঘণ্টা পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোক-গমন করেন। শাস্ত্রীর মৃত্যুতে তাসখন্দ ভারত ও পাকিস্তানে শোকের ছায়া নেমে আসে। দুই নতুন রাষ্ট্র যে আত্মঘাতী সংগ্রামে মেমেছিল তার অবসানে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অবদান কম নয়। তিনি ভারতের অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের ন্যায় উগ্রপন্থী ছিলেন না। যুক্তির নিকট নতি স্বীকারের দুঃসাহস তাঁর ছিল বলেই তাসখন্দে শান্তি চুক্তি সম্ভব হয়েছিল।

দীর্ঘ দশ বছর দেশে সামরিক শাসন বলবৎ রাখার ফলে দেশবাসীর মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। এই বিক্ষোভ প্রচণ্ডতর হতে থাকলো

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

যখন জনগণ দেখলো যে, আইউবের পুত্রগণ ও আত্মীয়-স্বজন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে অন্যায় ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই জনগণ বিক্ষুব্ধ, ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ। এই বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো যুগপৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা সংগ্রামের পথ বেছে নিলো। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে জেলে আটক। সাধারণ মানুষ মনে করেছিল শেখ মুজিবকে মিথ্যা অভিযোগে আটক করা হয়েছে। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব নিজেই বলেছিলেন যে আগরতলা ষড়যন্ত্র বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রচেষ্টা। এবং তাঁরই নেতৃত্বে সংঘটিত।

গণবিক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য ১৯৬৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী আইউব ঘোষণা করলেন যে. তিনি সকল রাজনৈতিক নেতাদের সংগে আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠক ডাকছেন। এ জন্যে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানকে আহবায়ক নিয়োগ করা হলো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তা-নের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বাধলো গোলমাল। শেখ মুজিব আগরতলা মামলার আসামী হিসেবে তখন জেলে আটক আছেন. এবং শেখ মুজিব ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই আইউব আগরতলা মামলা তুলে নিলেন এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দিলেন।

বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হয় ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মওলানা ভাসানী ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন না। ১০ই থেকে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত সম্মেলন চললো। ১৩ তারিখে আইউব অকস্মাৎ বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। ভাসানী ও ভুট্টো যে আশঙ্কা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হলো। তবে এই বৈঠকের ব্যর্থতার ফলে আইউবের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটলো। পাকিস্তানের উভয় অংশে চরম অরাজকতা শুরু হলো। নিরুপায় আইউব ২৪শে মার্চ তারিখে একখানি পত্র দ্বারা জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ করে নিজে রাজনীতির অংগন থেকে বিদায় নিলেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া শাসনক্ষমতা লাভ করার সংগে সংগে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মাচ তারিখে আবার সামরিক আইন জারি করে ১৯৬১ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করে দিলেন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে; নির্বাচিত সদস্যরা ৪ মাসের মধ্যে নুতন শাসনতন্ত্র রচনা করবেন।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। তাঁর পরিচালনায় নির্বাচন এত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে জনগণের তিনি অকুন্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিত আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান কয়েকটি আসন বেশী পেয়েছিল। ফলে, গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত ছিল; কিন্তু তা না করে নিত্য নতুন আলোচনার অজুহাত সৃষ্টি করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হতে লাগলো। নির্বাচনের পর পরই জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কিরূপে বিভ্রান্ত হলেন তা বোধগম্য হওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। ঢাকায় যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছিল সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উর্ধতন সামরিক জান্তারা ঢাকায় ভিড় করতে থাকে এবং আপোস আলোচনার মধ্যে অহেতুক মাথা গলাতে শুরু করে। সেই সময়ে রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক সংবাদদাতাদের কেউ কেউ বলেছিলেন যে, জেনারেল ইয়াহিয়া সত্যিই অত খারাপ লোক নন। তবে মাত্রাধিক্যরূপে মদ্যপ। এই ধরনের লোক মূলতঃ ভাল হলেও অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ হয়ে থাকে। ইয়াহিয়াকে নাকি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে সামরিক জান্তারা শাসিয়ে দিয়েছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে ক্ষমতা যদি পূর্ব পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয়া হয় তা হলে ইয়াহিয়া খানের লাশ বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়া হবে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর হাতের পুতুল ইয়াহিয়া খাঁ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্ত না নিয়েই '৭১ সালের ২৪শে মার্চ ঢাকা ত্যাগ করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে মানুষের প্রয়োজন নাই কেবল মাটির দরকার। আর সেই মানুষ ধ্বংসের যজ্ঞ শুরু করলো পাকিস্তান সেনা বাহিনীর পিশাচের দল. ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রি থেকে। ঢাকা শহর এবং অন্যান্য স্থানে যে বর্বর হামলা শুরু হয়, ঘুমন্ত নিরীহ নিরস্ত্র আদম সন্তানের উপর যেরূপ পৈশাচিক নৃশংসতা চালানো হতে লাগলো তা নিষ্ঠুরতার ইতিহাসে নজীরবিহীন। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ এবং অন্যান্য শহরে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে অসংখ্য মৃতদেহ।

॥ সাতেরো ॥

সংবাদ নিয়ে জানা গেল আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা বেশীর ভাগই রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, আর শেখ মুজীব ২৫শে মার্চের রাতেই পাকিস্তান বাহিনীর হাতে ধরা দিয়েছেন। মনে হয় তিনি ধরা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। একটা বিপ্লবের নেতৃত্ব যিনি দেবেন তিনি কখনও স্বেচ্ছায় ধরা দেন না। নেতাহীন বিপ্লব কোন-কালেই পূর্ণ সাফল্য আনতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি আনে, নীতিহীন হয়ে পড়ে। তাই বাঙালী তরুণদের মনে এই চিন্তাই আলোড়ন সৃষ্টি করতে লাগলো যে, শেখ মুজীব কি বিপ্লবকে এড়িয়ে যেতে চান? তিনি কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চান না? ৭ই মার্চ তারিখে তিনি রেসকোর্সের ময়দানে বলেছিলেন, "আর যদি একটি গুলি চলে তবে তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।" এত কথা বলার পর এবং ছাত্র-জনতার দাবীর মুখেও শেখ মুজীব স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। আর ২৫শে মার্চ রাত্রে শত্রুর হাতে তাঁর আত্মসমর্পণ একটা রহস্যময় ব্যাপার হয়ে থাকলো।

জনগণের মধ্যে যখন চরম নৈরাশ্য, চরম আতঙ্ক, ঠিক সেই সময় ২৬শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের জনগণ এক অভয় বাণী শুনতে পেল। সে বাণী জিয়ার কন্ঠস্বর। সে বাণী দেয়ালে পিঠ রেখে পাল্টা আঘাত হানার আহবান। জিয়া জানালেন, শেখ মুজীবের বরাত দিয়ে সংগ্রামের কথা। বাংলার ছাত্রসমাজ কৃষক মজুর জনসাধারণ সাত্যি সত্যিই এবার প্রস্তুত হলো। হাতে তারা হাতিয়ার তুলে নিলো। দীর্ঘ ৯ মাস সংগ্রাম চললো। একদিকে নিরস্ত্র বাঙালী তরুণ এবং তাদের সঙ্গে বাঙালী সৈনিক, আনসার ও পুলিশ বাহিনীর একটি অংশ, আর অপর দিকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রসজ্জিত

সুশিক্ষিত পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী। অবশ্য ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার অস্ত্র সরবরাহ বাংগালী তরুণদের যথেষ্ট শক্তিশালী করেছিল। '৭১ সালের ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত মরণপণ সংগ্রাম করে মুক্তি যোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাদের অনেক স্থানে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। এমন সময় পাকিস্তান ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ভারত আক্রমণ করলো। ভারতও এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল। তারা বাংলাদেশের বৈমানিকদের সাহায্য নিয়ে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের পাকিস্তানী বিমান বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিলো এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী চারিদিক থেকে পাকিস্তান বাহিনীকে ঘেরাও করে ফেললো। এর ফলে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান বাহিনী ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করলো। পশ্চিম পাকিস্তানেও যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। ঢাকায় পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে মুক্তি যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে কাউকে স্বাক্ষর দান করতে দেয়া হয়নি। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে যারা যুদ্ধ সমাপ্তির পথে এগিয়ে এনেছিল, জয় যাদের সুনিশ্চিত বলে ধারণা করা হচ্ছিল, তাদের নিকট আত্মসমর্পণ না করে ভারতের নিকট একতরফাভাবে আত্মসমর্পণ করাটা বাংলাদেশের জনগণ সহজভাবে নিতে পারেনি।

এ ছাড়াও আরও একটা কথা আছে। পাকিস্তানের আত্মসমর্পন উপলক্ষে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন আহমদ এবং তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্যগণ এবং মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী কেউই উপস্থিত ছিলেন না। এটাও রহস্যজনক ব্যাপার বলে মনে হয়।

এ সম্পর্কে কোন কোন রাজনৈতিক ভাষ্যকার দুঃখ করে বলেছিলেন যে, যে মুক্তিবাহিনী নয় মাস ধরে যুদ্ধ করে হানাদার বাহিনীকে পরাজয়ের মুখোমুখি এনে ফেলেছিল, দুশমনদের আত্মসমর্পণের কৃতিত্ব তারা একটুও পেল না। বাংলাদেশের নেতাদের সুষ্ঠু নেতৃত্ব দানের অভাবই এই লজ্জাজনক পরিস্থিতির কারণ বলতে হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, অথচ বাংলাদেশের মন্ত্রীরা ও নেতারা তখনও ভারতে অবস্থান করছিলেন কেন, এ কথার জবাব হয়তো কোনদিন মিলবে না। অবশ্য আওয়ামী লীগ বিরোধীরা এবং চরম বামপন্থীরা বলতে শুরু করে যে নেতারা দাসখত লিখে দেয়ার জন্য নয়াদিল্লীতে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রীরা দেশে ফিরলেন। অবশ্য সপ্তাহখানেক পরে। বাংলাদেশের মাটিতে পা দেয়ার সাথে সাথে, কর্তব্য ছিল সর্বশক্তি নিয়োগ করে জাতীয় সংহতি এবং দেশের পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী হওয়া, কিন্তু তার পরিবর্তে এঁরা আত্মঘাতী পথ অবলম্বন করলেন। যারা দুশমনের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল তারা দেশভক্ত আর যারা দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে যুদ্ধ করেছিল দুশমনের বিরুদ্ধে, তারা দালাল আখ্যা পেল এবং হাজার হাজার দেশভক্তকে কারাগারে পাঠানো হল। এই যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন নেতারা, তার পরিণাম যে বিষময় হবে তা অনুধাবন করা গিয়েছিল। তবে একমাত্র আশা ছিল শেখ মুজীব মুক্তি লাভ করে দেশে ফিরলে অবস্থার হয়তো পরিবর্তন হতে পারে।

'৭২ সালের জানুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজীবকে মুক্তি দিলেন এবং তিনি যাতে সরাসরি বাংলাদেশে ফিরে শাসনক্ষমতা হাতে নিতে পারেন সে জন্যে তাঁকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিলেন। শেখ মুজিব লন্ডন থেকে সরাসরি বাংলাদেশে না ফিরে নয়াদিল্লীতে যাত্রা বিরতি করলেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের কোন কোন নেতা এটাকে ভাল চোখে দেখেননি।

মন্ত্রীরা দেশে ফিরে যে ভুল পথ ধরেছিলেন শেখ মুজীব তারই অনুসরণ করলেন। দেশে ফিরে প্রথমেই ২ টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিখ্যাত সমাজকর্মীদের তাড়ালেন এবং দুর্নীতির জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের সেই সব প্রতিষ্ঠানে জুটিয়ে কোটি কোটি টাকা মূল্যের সাহায্য-সামগ্রী চোরাচালান করে সীমান্তের ওপারে পাঠানো হয়। সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত দুধ, শিশু খাদ্য ও কম্বল বিক্রয় করে নেতারা অর্থের পাহাড় রচনা করেছেন। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় নিয়ে যে কান্ড-কারখানা হয়েছিল তা একটি স্বাধীন দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হাজার হাজার লোক পথে পথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে শুরু করলো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং পরে প্রেসিডেন্টের গদি দখলকারী শেখ মুজিবের মনে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। রেডক্রসের মালামাল সমানে বাজারে বিক্রয়

হয়, বাইরে চালান যায়, কিন্তু দেশের নিঃস্ব ও ক্ষুধিত জনগণ সে সাহায্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এ এক অসহনীয় অবস্থা।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে একনায়কত্বের শখ জাগলো কেন? কেউ কেউ বলেন পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার পথে নয়াদিল্লীতে যে যাত্রা বিরতি করেছিলেন সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবকে স্বৈরতন্ত্রী হওয়ার তালীম দিয়েছিলেন। অবশ্য এ গুজব সত্য নাও হতে পারে।

আওয়ামী লীগের পতাকাতলে জাতিকে সংঘবদ্ধ করে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। এটা গৌরবের বিষয় এবং আওয়ামী লীগের পতাকা সমুন্নত রাখাই ছিল জাতীয় নেতার কর্তব্য। কিন্তু শেখ মুজিব সে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হলেন। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন তারিখে তিনি আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে দিয়ে "বাকশাল" বা 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' গঠন করলেন এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘোষণা করে এক ফরমান জারি করলেন। পার্লামেন্টের ব কলম সদস্যরা প্রায় সবাই নিরব থাকলেন। তবে প্রতিবাদ করলেন জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী, মঈনুল হোসাইন ও মিজানুর রহমান চৌধুরী। ওসমানী ও মঈনুল হোসাইন দলের সদস্যপদ এবং পার্লামেন্টের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। মিজানুর রহমান চৌধুরী সদস্যপদ ত্যাগ করেন নি তবে রসিকতা করে বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগের যে নৌকায় চড়ে শেখ সাহেব বৈতরণী পার হয়েছিলেন তা ডুবিয়ে দিয়ে ভাল কাজ করলেন না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক গগণে বে-সামরিক নেতৃত্বের কথা বলতে গেলে দু'জনের কথা মনে আসে। একজন শেখ মুজীব অপর জন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। শেখ মুজীবের প্রবণতা ছিল এক নায়কত্বের, তার পরিচয় উপরে উল্লেখ করেছি। সর্ব্বহারার এক নায়কত্বের প্রবণতা থাকলেও শ্রেণী চরিত্রের জন্য এবং পারিপার্শিকতার জন্য তিনি সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে মধ্যবিত্তের এক

নায়কত্বের দিকে দেশকে ঠেলে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে মওলানা ভাসানী ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর কথাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দলিল, তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। এক নায়কত্বের প্রবণতা তাঁর ছিল তবে সেটা প্রলেটারিয়ান ডিক্টেটরশীপ। যা কিছু তিনি করবেন কৃষক-শ্রমিকদের জন্য করবেন, কৃষক শ্রমিকদের সংগে নিয়ে করবেন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তিনি নেবেন না; বরঞ্চ রাষ্ট্র পরিচালনা যাঁরা করবেন তাদের সমালোচনা করাই তাঁর ধর্ম ছিল। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুর্ব্বে বলেছিলেন, তাঁর লক্ষ্য মাত্র একটী, সেটা হল স্বাধীনতা। জাতির জন্য এরকম নেতার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাঁর মহাপ্রয়াণে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ও জনগণের নেতৃত্বের অবসান হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দেশে এক অসহনীয় শূন্যতা বিরাজ করতে লাগলো। মনে হলো এটা যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। দেশে অনাচার ও অত্যাচার পুরো-মাত্রায় চলছে। প্রতিবাদের কন্ঠ নীরব করে দেয়া হচ্ছে স্পেশাল পুলিশ নামক একদল ঘাতক পুলিশদের দ্বারা। নিজ দলীয় লোকদের পারমিট লাইসেন্স বিতরণ করে চরম দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং চোর ডাকাত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা অহরহ পরিবেষ্টিত থাকছেন। দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রের সমালোচনার তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। ১৬ ই জুন এক কালো অধ্যাদেশ জারি করে সরকার নিয়ন্ত্রিত দুটি ইংরেজী ও দুটি বাংলা দৈনিক রেখে বাংলাদেশের সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়। এ এক অসহনীয় অবস্থা।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্টের ভোর রাতে রাইফেল, মেশিনগান ও রকেটের গর্জনে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হল। সকাল বেলা ভীত সন্ত্রস্ত হৃদয়ে রেডিও খুলে দিতে আওয়াজ শোনা গেল "শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হয়েছেন। খোন্দকার মোশতাক ক্ষমতা দখল করেছেন। আজ সন্ধ্যায় নতুন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করবে।"

অবাক বিস্ময়ে দেখলাম একমাত্র রাজনৈতিক দলের নেতা প্রবল প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট শেখ মুজীবের মৃত্যুতে কোথাও কোনরূপ প্রতিবাদ হল না। অপরাহ্নে গণভবনে নতুন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করলো।

নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে দেখা গেল সেই সব চেনা মুখ, যারা প্রত্যহ শেখ সাহেবের কদমবুছি করত। এরাই তোষামোদ করে শেখ সাহেবকে বিভ্রান্ত করেছিল। একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শেখ সাহেবকে জনগণের কাছে অপ্রিয় করার জন্য এমন কি পতনের জন্য এরাই দায়ী। শেখ মুজীব হৃদয়ের দিক থেকে বিরাট এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন একথা যেমন সত্য, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক থেকে তিনি যে দেউলিয়া সে কথাও তেমনি সত্য।

শেখ মুজীব অন্য সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে জীবনের সব চেয়ে বড় ভুল করেছিলেন। এক নায়কত্বের মাধ্যমে গণতন্ত্র বাঁচানো যায় না, সেটা বুঝবার সময় তিনি পেলেন না, এটাই আফসোসের বিষয়।

এর পরের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। এবং যা অবিসংবাদিত সত্য তাই ঘটলো। এক স্বৈরতন্ত্র আর এক স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দেয়। ৩রা নবেম্বর উচ্চাভিলাষী সৈনিক খালেদ মোশাররফ বিদ্রোহ করলো এবং নিজে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের ক্ষমতা দখল করলো। এই সময় ঢাকা জেলে আওয়ামী লীগের কামরুজ্জামান, তাজুদ্দীন, মনসুর আলী ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিহত হন। অনেকে বলেন খালেদ মোশাররফ ঘাতকদের নিজে বিমানে উঠিয়ে দেশ ত্যাগে সাহায্য করেছেন, এটাও ওখানকার অনেকেই দেখেছেন। এই অভ্যুত্থানের মাত্র ৪ দিনে পরে আর এক নূতন অভ্যুত্থান ঘটলো ৭ই নবেম্বর তারিখ রাত্রে। এটাকে বলা হয় সৈনিক ও জনগণের সম্মিলিত বিপ্লব। শোনা যায় অবসর প্রাপ্ত কর্নেল তাহের এই বিপ্লবে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। খালেদ মোশাররফ পলায়নপর অবস্থায় দেশভক্ত সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়।

ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা কি বলবেন জানি না, তবে বর্তমানের কাহিনী এখনও রহস্যময় মনে হয়। কর্নেল তাহেরের কথাই বলছি। একথা সব মহলে সুবিদিত যে ৭ই নবেম্বর '৭৫ সৈনিক জনতা ঐক্যের মাধ্যমে যে বিপ্লব সাধিত হয় তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কর্নেল তাহের। তিনি ছিলেন জাসদের দলভুক্ত। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে তাঁর বিচার হয় এবং মৃত্যুদণ্ড হয়। তখন দেশে সামরিক শাসন বলবৎ ছিল, তাই প্রকাশ্যে বিচার হয়নি এবং অভিযোগ সমূহ দেশবাসী এখনো জানতে পারেনি।

মেজর জেনারেল জিয়াউর-রহমান দেশরক্ষাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। এবং তিনি প্রধান সামরিক শাসন কর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

সামরিক শাসকরা সাধারণত একবার ক্ষমতা হাতে পেলে সে ক্ষমতা সহজে ছাড়তে চাননা, কিন্তু জিয়াউর রহমানের মধ্যে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। দেশে স্থিতিশীলতা আনয়ন সাপেক্ষে তিনি বে-সামরিক বিশিষ্ট ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলেন। এঁদের মন্ত্রীদের মর্য্যাদা দেয়া হল। আবার এদের মধ্যে কাউকে অযোগ্য মনে হলে তাঁকে বাদ দিতেও তিনি কসুর করতেন না।

শাসন কার্য্যে শৃংখলা আনয়নের জন্য তিনি নিজে সরকারী দফতরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। জনগণের অভাব-অভিযোগ স্বচক্ষে দেখেছেন গ্রামে গ্রামে সফর করে। তাঁকে একথা বার বার বলতে শুনেছি যে কোন শাসন ব্যবস্থাই জনকল্যাণকর নয়, তা যদি জনগনের শাসন না হয়। তাই তিনি দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। নিজে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য জনগণের ভোট গ্রহণ করলেন ও নিজে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন, এই দলের আদর্শ হল নিছক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। কোন বিদেশী মতাদর্শ বা "ইজম" তিনি বা তাঁর দল বিশ্বাস করেন না।

জিয়া ওয়াদা করেছিলেন অতি শীঘ্র তিনি সাধারণ নির্বাচন দিবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি নুরুল ইসলামকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে তিনি অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের নির্দ্দেশ দিলেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়, জিয়ার রাজনৈতিক দল বি, এন, পি বহু ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলো। আর কালবিলম্ব না করে জিয়া ৩১শে মার্চ্চ তারিখে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। বিচক্ষণ পার্লামেন্টারিয়ান শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী ও মীর্জা গোলাম হাফিজ সংসদের স্পীকার নির্বাচিত হলেন।

জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগেই জিয়া এমন এক আইন পাশ করলেন, যা মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মন জয় করেছে। '৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে প্রথমে আল্লার

নাম রাখা হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়া সেটা সংশোধন করে 'বিসমিল্লাহির রহমানুর রহীম' দিয়ে শাসনতন্ত্র শুরু করেছেন। সংসদ এ সংশোধন গ্রহণ করেছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া পর্য্যায়ক্রমে তাঁর ওয়াদা পালন করে চলেছেন। '৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি নিজের ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারের সম্পত্তির হিসাব ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া '৭৯ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখে জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষণা করলেন। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবের শাসনামলে এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের শেষভাগে ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে, জিয়ার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের আট কোটী মানুষের কল্যাণ সাধন। এজন্য তিনি আরামকে হারাম করে গ্রামে গ্রামে চারণের বেশে ঘুরেছেন। তাঁর একমাত্র বাণী, উত্থিষ্ঠিত, জাগ্রত, ওঠো জাগো, নিজের ভাগ্য নিজে গড়ো। স্বনির্ভর হও। জিয়া বুঝেছেন, শহরেও রাজধানীতে বসে কাগজে কলমে দেশের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করলে কোন ফায়দা হবেনা, কৃষিপ্রধান এই দেশে খাদ্য উৎপাদন কমপক্ষে দ্বিগুণ করতে না পারলে দেশের কল্যাণ নেই। এজন্য প্রেসিডেন্ট জিয়া একটির পর একটি বিপ্লবের আহবান দিচ্ছেন। ১৯৭৯ সালের পয়লা ডিসেম্বর পবিত্র আশুরার দিন জিয়া মানিকগঞ্জে খাল খননের উদ্বোধন করলেন। এরপর শুরু হল সারা দেশব্যাপী খাল খনন অভিযান। চাষী শ্রমিক মজুরদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়া কোদাল কাঁধে যখন খাল খননে নিয়োজিত হলেন, তখন হাজার হাজার মানুষ—নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক এক অভূতপূর্ব কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে খাল কাটতে শুরু করলো। দেশের চাষী মজুর এবার আস্থা ফিরে পেলো যে, দেশ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

একটির পর আর একটি বিপ্লবের ডাক এল—এ ডাক আত্মোপলব্ধির ডাক—জাতীয় চেতনা সমুন্নত রাখার ডাক।

১৯৮০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জিয়ার দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক এল নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান। দেশের সকল স্তরের মানুষরা নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে আত্মনিয়োগ করলো। প্রেসিডেণ্ট আশা করেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষ-রতা দূর হবে। বাংলাদেশের কল্যানকামী মানুষদের যদি আন্তরিকতা থাকে তাহলে প্রেসিডেন্ট জিয়ার এই আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়।

কোন কোন রাজনৈতিক দল বলে থাকে জিয়া ক্ষমতা লোভী। এ সম্পর্কে সত্য মিথ্যা নির্ধারণ না করে বলা যায় যে রাজনৈতিক দল মাত্রই ক্ষমতা লোভী। তবে কেউ ক্ষমতায় থেকে দেশের অকল্যাণ ডেকে আনে, আবার কেউ ক্ষমতায় থেকে দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়াকে মানুষ দেশ প্রেমিক হিসেবেই জেনেছে। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে বলা যায় তিনি নির্লোভ, নীতিপরায়ণ।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি জনগণের সঙ্গে যে যোগাযোগ সৃষ্টি করছেন, তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে। কোন দেশের কোন রাষ্ট্রনায়-কই গ্রাম গঞ্জে, পল্লীতে এত মানুষের সংগে এর আগে মিশেছেন বলে ইতি-হাসে পাওয়া যায় না। জিয়া জনগণকে ভালবাসেন, তাই তাঁর লক্ষ্য জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ট সংযোগ। এই সংযোগ তিনি রক্ষা করে চলেছেন। তবে একথাও সত্য জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের চাবি কাঠি অর্থনৈতিক পরি-স্থিতি। তার উন্নতির বদলে অবনতি ঘটছে। এটাই আশঙ্কার কারণ। তবে গণসংযোগের ব্যাপারে জিয়া নিজেই একটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

গণতন্ত্রমণা জনগণ বলে থাকেন, রাষ্ট্রপতি জিয়া গণতন্ত্রের উত্তরণের কথা বলেন, কিন্তু কেন এখনো পার্লামেন্টারী প্রথার প্রবর্ত্তন করছেন না। এটা একটা জটিল প্রশ্ন। ভাল করতে গেলে মন্দ হয়ে যায় রাজনৈতিক দিক থেকে শিক্ষাহীন দেশে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজীব বাকশাল করেছিলেন, লক্ষ্য ছিল একনায়কত্বের। কৃষক শ্রমিক আওয়ামী পার্টি গঠনের মাধ্যমে তিনি সর্বহারার এক নায়কত্ব আনতে চেয়েছিলেন, আনতে চেয়ে ছিলেন সমাজতন্ত্র, কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত এক নায়কত্বে রূপ নিল। ফল সেজন্য ভাল হয়নি। রাষ্ট্রপতি জিয়া পার্লামেন্টারী প্রথায় এত তাড়াতাড়ী যেতে চাচেছন না, কারণ এদেশের মন-মেজাজের অস্থিরতায়

কিছুটা ক্ষমতা রাষ্ট্রনায়কের হাতে রাখা প্রয়োজন। বারবার মন্ত্রীসভা ভাঙাগড়ার দ্বারা আর যাই হোক, দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। স্থিতিশীলতা আসার পর বর্তমান সরকারকে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে হবে। কারণ দেশ সেভাবেই আগাগোড়া চলে এসেছে। রাজনৈতিক দলসমূহ বিলোপ করা হয়নি। এটাই পূর্ণ গণতন্ত্রে উত্তরণের আলামত বলা যায়। তবে তা কতদিনে, কত দেরিতে সেটা ভবিষ্যতই বলতে পারে। রাষ্ট্রপতি জিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মান অত্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন, একথা বিদেশের পত্র পত্রিকায় স্বীকৃত। এদেশের সংসদের বিরোধী দলপতি খান এ, সবুর যা বলেছেন, তার উল্লেখ করে এই বিষয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করছি ঃ

প্রবীণ পার্লামেন্টারিয়ান মুসলিম লীগ (সবুর) নেতা জনাব খান এ সবুর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যের প্রশংসা করে বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট জিয়া মুসলিম জাহানের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেভাবে তুলে ধরেছেন এর আগে অন্য কেউ তা এভাবে তুলে ধরতে পারেননি।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের জন্য কম কৃতিত্ব নয়। তিনি আরো বলেন যে, তায়েফে অনুষ্ঠিত ইসলামিক শান্তি শীর্ষ সম্মেলনে গঠিত ইসলামিক শান্তি মিশনে সদস্য পদ লাভ গৌরবের বিষয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে তিনি এজন্য ধন্যবাদ জানান। জনাব খান এ সবুর বলেন, আমি প্রেসিডেন্ট জিয়ার শুধু সমালোচনাই করি না, তাঁর গঠনমূলক কাজের প্রশংসাও করি।

॥ আঠারো ॥

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের স্থান সম্পর্কে যদি আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত পুঁথি সাহিত্যে মুসলমানদের দান ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে গুলি কোথাও বা সুফিবাদ এবং কোথাও বা পীর পূজা এবং অনেক জায়গায় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগ শুরু হলো। সেখানে দেখা গেল যে, মুসলমানদের মধ্যে বাউল গান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই গান মুসলমানদের সংসার বিমুখতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অথচ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজের সাহিত্যিক গোষ্ঠি ইংরেজী সাহিত্যের সুধার সমুদ্র হতে অমৃত মন্থন করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মাইকেল থেকে শুরু করে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও শত শত ছোট বড় সাহিত্যিক যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তা প্রধাণতঃ কোলকাতা কেন্দ্রীক কিন্তু সাহিত্যিকগণ এটাকেই গোটা বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি বলে ঘোষণা করেছিলেন। এর ফলে মুসলমানদের প্রায় আটশো বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বেমালুম অস্বীকার করে বসল। অস্বীকার করার উপায় নেই যে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার কারণ, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অপরিসীম ঘৃণা। আঠারোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিপ্লবের পর থেকে মুসলমানরা সর্বহারার জাতিতে পরিণত হলো। তারা ইংরেজদের ভাষা শিখবে না, ইংরেজী সাহিত্য পড়বে না, এই ছিল তাদের সংকল্প এটা স্বাভাবিক বিজয়ী জাতির প্রতি বিজিত জাতির এই যে অসহযোগিতা, একে বলা যায় এক ধরণের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ কিন্তু এই প্রতিরোধের ফলে সামাজিক

ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল, সাহিত্য সাংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তেমনি তারা পিছিয়ে গেল।

বেশ কিছুকাল পরে মোহগ্রস্ত মুসলমান সমাজ চোখ মেলে বুঝল যে, বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষা-ভাষী সবারই। কিন্তু যে সাহিত্য তাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে মুসলমান জীবন ও সংস্কৃতির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রতিবাদ মুখর বাঙ্গালী মুসলমান বলেছিল যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি যে সাহিত্যে নেই তা কখনও গোটা বাংলার সংস্কৃতি হতে পারে না। বরং এটাকে বলা যায় একের সংস্কৃতি অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যযুগীয় মনোভাব।

উনিশ শতকের শেষভাগে মুসলিম সমাজে নবজাগরণের যে উন্মেষ ঘটে ছিল তার ফলে মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে নবতর সাহিত্য সৃষ্টি হতে লাগল। এই সময় এক অসাধারণ প্রতিভাধর লেখকের অভ্যুদয় ঘটল। তিনি "বিষাদ সিন্ধুর" লেখক মীর মোশাররফ হোসেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্য গগনে দীপ্তসূর্যের মত বিরাজ করছিলেন সেই সময় মীর মোশাররফ হোসেনের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। মীর মোশাররফ হোসেন শুধু "বিষাদ সিন্ধু" লিখেই সাহিত্য ক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ করতে পারতেন কিন্তু এ ছাড়াও তিনি "গাজী মিয়ার বোস্তানী" রচনা করেন। মোশাররফ হোসেনের আরও ৩৫ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মুসলিম সমাজ জীবনের অন্ধকার যুগে আলোর দীপ্ত মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন।

মীর মোশাররফ হোসেনের পর থেকে মুসলিম সমাজ জীবনে যে নবজাগরণের দীপ্ত পদধ্বনি শোনা গেল তাতে আশার আলো দেখতে পেলো মুসলিম সমাজ। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অসাধারণ প্রতিভাবান সাহিত্যিক একরাম উদ্দিন আবির্ভূত হলেন তাঁর সার্থক উপন্যাস "কাচ ও মনি" নিয়ে। সংগে সংগে আবির্ভূত হলেন সার্থক জীবন শিল্পী কাজী এমদাদুল হক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "আবদুল্লাহ্"। এর পর শুরু হলো একটি নব-জাগ্রত জাতির অবিচ্ছিন্ন গতিধারা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই যে সব সাহিত্যিক আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করব। এরা হলেন, শেখ আব্দুর রহিম, শেখ ফজলুল

করিম, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাক্তার লুৎফর রহমান এবং মাইকেলের অনুসারী অন্যতম কবি কায়কোবাদ। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে সাহিত্য রচনায় যারা নিজস্ব কৃতিত্বের আলোয় দীপ্তিমান তাদের মধ্যে মাহবুবুল আলম, আবুল ফজল, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ইব্রাহীম খান, আকবর উদ্দিন, মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, জহির রায়হান, শহীদুল্লা কায়সার, কবি শাহাদাত হোসেন ও কবি গোলাম মোস্তফার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম বুদ্ধিজীবি মহলে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা জাগাবার উৎস হিসাবে সৃষ্টি হলো বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি। এই সমিতি প্রথমে কলকাতার ৪৭/১ মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি

স্থাপিত হয়। পরে ৩২ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীটে সমিতির কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। সাহিত্য সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ এবং সম্পাদক ছিলেন বাংলাদেশের দুই উজ্জল নক্ষত্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ভোলার কবি মোজাম্মেল হক। এঁরা দুই জনেই যেমন ছিলেন সাহিত্যের জন্য নিবেদিত প্রাণ তেমনি ছিলেন পান্ডিত্যের জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। এঁদের সংগে পরে এসে যোগ দিয়েছিলেন মুজাফফর আহমদ ও কবি নজরুল ইসলাম। মুজাফফর আহমদ পরে সমিতির অন্যতম সম্পাদক হয়েছিলেন।

এখানে ডাক্তার শহীদুল্লাহ্ ও কবি মোজাম্মেল হকের জীবন কাহিনী কিছুটা উদ্ধৃত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেজন্যে প্রথমেই শহীদুল্লাহ্ ও পরে মোজাম্মেল হকের সাহিত্য কীর্তি সম্পর্কে উল্লেখ করলাম:

১৯১০ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চরম পরিনতির দিকে চলেছে। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তখন খুবই নাজুক। গোদের উপর

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

বিষফোড়ার মত বেরুল আর এক সমস্যা। সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে পাশ করে সংস্কৃতে এম-এ পড়তে গিয়ে রক্ষনশীল হিন্দু পন্ডিতদের বিরোধিতায় মুসলমান ছেলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এল। 'কমরেড' পত্রিকায় মওলানা মুহম্মদ আলী এ ঘটনার নিন্দা করেছেন! প্রখ্যাত প্রবন্ধ—দি লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা অব ইন্ডিয়া-তে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ

ব্যানার্জীর সমর্থক পত্রিকাগুলোতেও নিন্দা করা হয়েছিল এ ঘটনার। শহীদুল্লাহর নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্নধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হালে পানি না পেয়ে "কম্পারেটিভ ফাইলোলজী" বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ খুললেন। শহীদুল্লাহ্ তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করতে গিয়ে ভাষাবিদ হরিনাথদের নজরে পড়েছিল তাঁর পরামর্শে এম,এ-তে এই নতুন বিষয় নিয়ে পাশ করে তদানীন্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম শিক্ষার্থীর গৌরব অর্জন করে।

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পাশ করে চাকরী করার সুযোগ তেমন হল না। আইন পড়ে মফঃস্বল শহর বসিরহাটে আইনজীবী হল শহীদুল্লাহ্। কিন্তু সাহিত্য শিক্ষা অঙ্গনে তাঁর মন পড়ে রইল। কলকাতায় যেখানে আছে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রহিত যখন হয় এবং বাংলার হিন্দু সমাজের উল্লাস যখন মুসলমান সমাজকে হীনমন্যতায় মুহ্যমান করল তখন ১৯১১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ এবং বি,এল ক্লাশের ছাত্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উপর। নবীন সাহিত্যরথী শহীদুল্লাহ্ ১৩২৩ সালে যশোহর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির ৮-ম অধিবেশনে বলেছিলেন—'বাঙালী মুসলমান' যদি তুমি জড়জগতের ন্যায় বসিয়া থাক, তবে বাঙ্গলার বক্ষে তোমার স্থান নাই। জান না কি যোগ্যতমের রক্ষাই প্রকৃতির নিয়ম? তোমাকে বড় হইতে হইবে। তোমাকে তোমার অগ্রজের সমান হইতে হইবে।

আমাদিগকে বড় হইতেই হইবে। বড় গাছের তলায় ছোট গাছের মত যদি আমরা শুকাইয়া মরিতে না চাই, তবে আমাদিগকে বড় হইতেই হইবে। এই বড় হইবার জন্য সাহিত্য চাই। শুধু অলস বেকার হয়ে সময় কাটাইবার জন্য নহে. বড় হইবার জন্য সাহিত্য চাই।

বাঙ্গালীজাতি মুসলমানের ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টা এ উদ্দীপনাময় বাণীতে উদ্বুদ্ধ হ'ল সেকালের সাহিত্যসেবীরা। জন্ম হ'ল বঙ্গীয় মুসলমান

সাহিত্য পত্রিকার। এ পত্রিকার সম্পাদকের অন্যতম ভূমিকায় তখন "মৌলভী পণ্ডিত" মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। আইনজীবির পেশা ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রনে তিনি তখন প্রখ্যাত অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সেনের শরৎ কুমার লাহিড়ী গবেষণা-সহায়করূপে যোগদান করেন ১৯১৯ সালে।

এ সময়ে শিশু কিশোর সাহিত্য পত্রিকা সচিত্র "আঙুর" সম্পাদক রূপেও তিনি কর্মরত হলেন। এই পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদককে যে পত্র লেখেন তার কিছু অংশ প্রনিধানযোগ্য বলে উদ্ধৃত করছি—

"আঙুর পত্রিকাখানি আপনি বাহির করিয়াছেন, তাহাতে আমি মোটেই আশ্চর্য্য হই নাই। আমাদের বাড়ীর কাছে একটা মস্ত বড় বকুলের গাছ আছে, তার শাখা প্রশাখা প্রকান্ড কিন্তু ফুলগুলি মুক্তার মত ছোট। আপনার মত এত বড় পন্ডিত, যাঁহার বিদ্যার পরিধি আয়ত্ব করিবার সাধ্য আমাদের নাই, যিনি বেদ-বেদান্তের অধ্যাপক, ফারসী ও আরবী যাঁহার নখদর্পনে, যিনি জার্ম্মান ব্যাকরণের জটিল ব্যূহ ভেদ করিয়া অবসর রঞ্জন করেন, তিনি একটি আঙুর হাতে করিয়া উপস্থিত? বকুল ফুল বকুল বৃক্ষে যে অসামঞ্জস্যই থাকুক না কেন, ইহাতে যে বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধতা নাই, তাহা প্রকৃতিই দেখাইতেছেন, সুতরাং আপনার মতন পণ্ডিত আঙুর সম্পাদন করিতে পারেন তাহা মঞ্জুর করিয়া লইলাম।"

[শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, ১৯৬৭ পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৩]

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে কলকাতা ছেড়ে নতুন কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন শহীদুল্লাহ সাহেব। দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বয়কট চলছে। বাংলার মুসলমান শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল তাই তিনি এগিয়ে এলেন উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠে নিবেদিতপ্রান শিক্ষার গবেষকরূপে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হলেন তিনি, ছাত্রাবাস 'মুসলিম হলে'র আবাসিক শিক্ষকরূপে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা এ সময়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৯২৬ সালে দু'বছরের জন্যে প্যারীস বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ফরাসী ভাষায় গবেষণা করে "ডক্টর অর লিটারেচার" ও "ডিপ্লোমা ইন-ফনেটিকস্" নিয়ে ফিরে এলেন এবং তখন থেকে পরিচিত হলেন 'ডক্টর শহীদুল্লাহ" নামে।

১৯২৮ থেকে ১৯৬৭ সাল এই চল্লিশ বছর ডক্টর শহীদুল্লাহর জীবন বিচিত্র প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। তিনি এই সুদীর্ঘকাল বহু শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, যুবক, ছাত্র, শিক্ষক সম্মিলনীতে ভাষণ দিয়েছেন। ধর্মীয় সভায় যোগ দিয়েছেন, মিলাদ মহফিলে বক্তব্য রেখেছেন। উলেমা প্রতিনিধি দলে চীন ভ্রমণ করেছেন। পবিত্র হজ্জ করেছেন। করাচীতে কিছু দিন বসবাস করে উর্দু অভিধান সম্পাদনা করেছেন। বাঙলা একা-ডেমীর আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। মাঝে কিছু দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে গিয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ তথা কলা অনুষদ চালু করেছেন বিভাগীয় প্রধান ও অনুষদের জীবনের মর্যাদা নিয়ে।

নিজ সাহিত্য সাধনার বিচিত্র সম্ভারে এ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে একদিকে হাফিজ, উমর খৈয়্যাম, বিদ্যাপতি ও ইকবালের কাব্যানুবাদ, ছোট গল্পের বই রকমারী, গবেষণা কর্মের অনবদ্য অবদান বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বুডিডস্ট মিস্টিক সংস্কৃতি (বৌদ্ধ গান), ইসলাম প্রসঙ্গ প্রভৃতি পুস্তকসমূহ। বাংলা ভাষার প্রকৃত একটি ব্যাকরণের জন্য সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্র-নাথ, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেরূপ একটা ব্যাকরণ তিনি প্রনয়ন করেছিলেন। তাঁর বাঙালা ব্যাকরণ ১৩৪২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এর পূর্বে আর কেউ এরূপ উল্লেখযোগ্য বাংলা ব্যাকরণ প্রনয়নের প্রচেষ্টা করেননি। লোক সংস্কৃতি বিষয়ক ইউনেস্কো প্রকল্পে প্রনীত "ট্রেডিশনাল কালচার অফ ইস্ট পাকিস্তান" তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান।

এই চারযুগের বিভিন্ন সময়ে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ, এশিয়াটিক সোসাইটী, ইসলামিক একাডেমী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রমুখ প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রেরনায় পরিচালিত হয়েছে,

আদমজী ও দাউদ সাহিত্য পুরস্কারের প্রধান বিচারক হিসেবেও তিনি অবদান রেখেছেন।

দেশ বিদেশে এ সময়ে তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত হয়েছে নানা উপাধী দানের মাধ্যমে। নিম্নে তার একটা তালিকা দেওয়া হল:

১৯৫২—ঢাকা সংস্কৃত পরিষদ—" বিদ্যাবাচষ্পতি "

১৯৫৮ পাকিস্তান দিবসের " প্রাইড অফ পারফরমেন্স" পদক ও ১০ হাজার টাকা। (উল্লেখ্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সাধনার জন্য এই ছিল প্রথম রাষ্ট্রীয় পুরস্কার)।

১৯৬৭—ফরাসী দেশের জাতীয় দিবস উপলক্ষে " স্যেভনেয়র দ্যে ল্যা আর্টস এ্যাড দ্যে লেতারস।"

মরনোত্তর উপাধি ও পুরস্কার পেয়েছেন এদের কাছ থেকে।

১৯৬৯ —পাকিস্তান দিবস উপলক্ষ্যে —" হিলাল-ই ইমতিয়াজ।'

১৯৭৪—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—' ডি-লিট।"

১৯৮০—বাংলাদেশের স্বাধীনতা পদক ও ১০'০০০ টাকা পুরস্কার।

এছাড়া উল্লেখ্য যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স " ১৯৬১ তে বিশ্বের দশজন মনীষীকে বিশিষ্ট সদস্য পদ দানের জন্য ডক্টর শহীদুল্লাহকে মনোনয়ন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের অনুমতি না পাওয়াতে তিনি সে সম্মান গ্রহণ করতে অপারগ হন।

তাঁর সাথে জড়িয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। তাঁকে স্মরণ রাখতে এখানের বৃহত্তম ছাত্রাবাসের নাম " শহীদুল্লাহ হল " রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কলা ভবনটীর নাম "শহীদুল্লাহ কলা ভবন" রাখা হয়।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটা প্রধান প্রেরনামূলক ভূমিকা পালন করেছে। এই আন্দোলনের ইতিহাসে এখনও ডক্টর শহীদুল্লাহর ভূমিকা নিরূপিত হয়নি যদি ও তিনিই উর্দু বনাম বাংলা সমস্যার সমাধানে সহজ সুন্দর বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সন্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের

সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন— "অনেক দিন পূর্ব্বে উর্দ্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতরে উঠিয়াছিল. তাহাতে বাংলার পক্ষে ডিগ্রী--হইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বর্ত্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দ্দুপক্ষকে বিস্তর সওয়াল জওয়াব করিতে শুনিতেছি। কিন্তু ন্যায়বান বিচারক দেখিবেন যে উদ্দু বাংলার দখল উত্যক্তে কিছুতেই খাস দখল পাইতে পারে না, দখল বাংলারই থাকিবে, তবে উর্দ্দু বাংলার অধীনে ইচছাধীন প্রজাই স্বত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে মাত্র।"

ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিকোনে দেখে যে সব বক্তব্য শহীদুল্লাহ সাহেব রেখেছেন তা যেমন অমূল্য, বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রামে তার বাণীও অতন্ত্র প্রহরীর মত সজাগ।

পাকিস্তান রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠার পূর্বক্ষণে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর যিয়াউদ্দীন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করার কথা বলে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা পড়ে ডক্টর শহীদুল্লাহ "আজাদ" পত্রিকায় "পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা সমস্যা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠান। এটি ১২ই শ্রাবন, ১৩৫৪ (ইং ২৮/৭/১৯৪৭) প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেন "ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ডাঃ যিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশ সমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি বিরোধী নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতিবিগর্হিত বটে।"

২-৪ জুলাই, ১৯৪৮ পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভাপতির যে ভাষণ দেন তা' আলোড়িত করে শিক্ষিত সমাজকে কিন্তু পাকিস্তান শাসকবর্গের ভক্তদের কাছে "শহীদুল্লাহ রাষ্ট্রদ্রোহী" ও ভারতীয় মানসীকতার অনুসারী বলা হল তাঁকে ভাগীরথী তীরে বসবাস করার কথা কাগজের পাতায় প্রকাশিত হলো।

আরবী অক্ষরে বাংলা লেখার এবং পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষা বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করার সরকারী প্রচেষ্ঠা চলল ১৯৪৮ থেকেই। শহীদুল্লাহ সাহেবের "আরবী হরফে বাংলা ভাষা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ ৬ ৭ বৈশাখ ১৩৫৬-তে আজাদে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছিলেন—"যাঁহারা মনে করেন আরবী হরফ দ্বারা আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান বৃদ্ধি হইবে তাঁহারা হয়তো জানেন না যে আল্লাহর রহমতে পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা ধর্ম্মজ্ঞানে ও ধর্ম্ম-আচরনে অগ্রগণ্য। ধর্ম্ম জ্ঞানের জন্য ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক পুস্তিকা ও পত্রিকার প্রয়োজন এবং ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তারের জন্য অবিলম্বে ধর্ম্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও ধর্ম্ম গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। আরবী হরফ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

অনমনীয় মনোবল নিয়ে নিরলস ভাবে বাংলা ভাষাকে বাংলা অক্ষরে চালু রাখা শিক্ষার বাহন করার জন্যে যে সব বক্তব্য তিনি ক'বছর রেখে ছিলেন তার মধ্যে সব থেকে কঠোর ও বজ্রকঠিন উদ্দীপনাময় হচেছ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক কনভেনশনের সভাপতির ভাষণে (কুমিল্লা ১৬·১৭ই মার্চ, ১৯৫১) বলেছিলেন—"We educationists should however, emphatically protest and if necessary should revolt against the fresh imposition of any language other than Bengali as the medium of instruction for East Bengalee students. This imposition will be tantamount to the genocide of East Bengalees"

ইতিহাসবেত্তা ও সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, ১৯৫২-সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারীর যে পটভূমি আছে তাতে ডক্টর শহীদুল্লাহর এসব উক্তির এক অবদান আছে। তা ছাড়া "রিভোল্ট' ও "জেনোসাইড" এ শব্দ দুটোর ব্যবহার তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে কেউই ১৯৭১-র রক্তাক্ত সংগ্রামের সূচনার পূর্বে আর কারুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি।

এ মহামনীষীর তিরোধান হয় ঢাকাতে রবিবার ১৩ ই জুলাই ১৯৬৯ সাল। তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে ঢাকার ঐতিহাসিক মুসাখান মসজিদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে। তাঁর প্রশান্ত আত্মার মাগফিরাত করতে বা জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে রাষ্ট্রীয় কোন প্রচেষ্টা নেই।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চিরজীবন জ্ঞানের সাধনাই করেছেন—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, প্রবচন, উপদেশ, গ্রন্থরচনা, অনুবাদ ও গ্রন্থ সম্পাদনা— এই সব কাজেই এই জ্ঞানতপস্বীর সুদীর্ঘ জীবন ব্যয়িত হইয়াছে। [ডক্টর শহীদুল্লাহ সম্পর্কে তথ্য তাঁর পুত্র জনাব মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহর সৌজন্যে পেয়েছি ।]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দৃপ্ত পদক্ষেপে উত্তরণের যুগ শুরু হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'' প্রতিষ্ঠার পর থেকে। আর এই সমিতির অন্যতম কর্ণধার ছিলেন কবি মোজাম্মেল হক।

কবি মোজাম্মেল হক

কবি মোজাম্মেল হক ছিলেন অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমায় বাগুা গ্রামে বাংলা ১২৯১ সালের ২১ শে ভাদ্র অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৯ ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। শৈশবে ভোলার বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে তিনি ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। বরিশালের কালেক্টর বিটসন বেল তখন জেলা কালেক্টর। তিনি সাইকেল যোগে ভোলায় আসেন। এর আগে ভোলার কেউ সাইকেল দেখেনি।

কবি মোজাম্মেল হক ভোলার হাই স্কুলে তৃতীয় শ্রেনীতে ভর্ত্তি হন। ম্যাট্রিক পর্যন্ত এই স্কুলে পড়েন। শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক তখন 'লহরী' নামে একটি পত্রিকা বের করতেন, ভোলার মোজা-ম্মেল হক এই পত্রিকায় একটি কবিতা লেখেন। এই সময় কবি বহু কবিতা লিখে ছিলেন। কুণ্ডলীন প্রেস থেকে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'জাতীয় মঙ্গল' প্রকাশিত হয়। এই একখানি কবিতার বই ছাত্র মোজাম্মেল হককে বাংলার জনগণের কাছে পরিচিত করেছিল। ১৯১১ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির প্রতি-ষ্ঠার পর থেকে যুবক মোজাম্মেল হক সমিতির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এই সুযোগে তিনি সাহিত্য অঙ্গনের সর্বত্র যোগাযোগের সুযোগ লাভ করেন। ১৯১৫ খৃঃ কবি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। ১৯১৮ সালে হাওড়া টাউন হলে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

হয় তাতে কবি মোজাম্মেল হক বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাস লেখক দুর্গাদাস লাহিড়ী। সম্মেলনে মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুজাফ্ফর আহমদ, শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক প্রমুখ আটজন মুসলমান লেখক। এটাই প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে মুসলমানরা যোগদানের সুযোগ লাভ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে মুসলমান সাহিত্যিকদের বিশেষ সম্মান দেখানো হয় তাদের মঞ্চে আসন প্রদান করে। এর ফলে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেন প্রমুখ অনেক বিখ্যাত হিন্দু সাহিত্যিককে মঞ্চে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই সম্মেলনে কবি মোজাম্মেল হক ''মিলনগীতি'' নামক একটী কবিতা পাঠ করেন। জলধর সেন মহাশয় তরুণ কবি মোজাম্মেল হককে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন মোজাম্মেল, তুই কি বাণী আজ শুনাইলি। এই মিলন গীতি মাসিক ''ভারতবর্ষে'' ছাপা হয়। সন্ধ্যায় সকল সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সম্বর্ধনা সভায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কবি মোজাম্মেল হককে কারমাইকেল হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশ লাভ করে। কবি নজরুলের " ক্ষমা " কবিতা সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। ' হেনা ' নামে নজরুলের একটী ছোট গল্প ও ছাপা হয়। ক্ষমা কবিতাটীর নাম বদলে 'মুক্তি' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলের এই কবিতা পড়ে বিখ্যাত সমালোচক সুরেশ সমাজপতি লিখেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর প্রতিভার আবির্ভাব ঘটলো।

১৯৩৬ সালের পর থেকে কবি মোজাম্মেল হক রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েন। প্রথম লীগ-প্রজা কোয়ালিশনে তিনি প্রজা-পার্টীর হুইপ ছিলেন। এমন এক সময় ফজলুল হক সাহেব মন্ত্রীসভা গঠন করলেন যখন মুসলমান প্রজা-খাতকরা হিন্দু মহাজনদের নিকট ৪৫০

কোটী টাকা ঋণী ছিল। মহাজনী বিলোপ করার জন্য মন্ত্রীসভা যেমন উদ্যোগী হয়েছিল; তেমনি হিন্দু-মুসলমান জমিদাররা যাতে মহাজনী বিলোপ আইন পাশ হতে না পারে সেজন্য সদস্য ভাঙানোর কাজে ব্যাপৃত হন। কবি মোজাম্মেল হক স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন যে, এই জঘন্য কাজে অগ্রনী ছিলেন নওয়াব মোশাররফ হোসেন ও দেবী প্রসাদ খৈতান। হক মন্ত্রীসভা প্রথম ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে মহাজনী বিলোপ আইন পাশ করা হয়। এর পর পাশ করা হয় কলকাতা কর্পোরেশন সংশোধন আইন। এতে চাকুরীতে মুসলমানদের শতকরা ২৫টি আসন সংরক্ষিত করা হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে সাধারণ চাকুরীতে মুসলমানদের শতকরা ৫০টি আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। হুইপ হিসাবে কবি এই কাজগুলি করার নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন সন্দেহ নেই।

কবি মোজাম্মেল হক ফজলুল হক সাহেবের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু হক সাহেব যখন প্রোগ্রেসিভ মন্ত্রীসভা গঠন করেন তখন অন্য ছয়জন সদস্যসহ কবি মোসলেম লীগে যোগদান করেন। কেবলমাত্র হাশেম আলী খাঁ ও সৈয়দ আফজাল বরিশাল জেলার এই দুই জন মাত্র হক সাহেবের সংগে ছিলেন।

এর পর কবি মোজাম্মেল হককে আমরা সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে হারিয়ে ফেলি। জানা যায়, তাঁর অনেকগুলি বইয়ের পাণ্ডুলিপি আছে প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা জানা যায়নি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির গোড়া পত্তনের পর এই সমিতিকে কেন্দ্র করে বহু সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছিল, সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। এয়াকুব আলী চৌধুরীর ভাই রওশন আলী চৌধুরীর সম্পাদনায়—" সহচর " পত্রিকা এবং ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে 'মুসলিম ভারত' প্রকাশিত হয়। এর ও কয়েক বছর পরে কবি বেনজীর আহমদ ও ফজলুল হক সেলবর্ষীর নেতৃত্বে ' নওরোজ ' নামে একটী প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "মুসলিম ভারত ' ও "নওরোজে" কবি নজরুলের কবিতা ও গল্প নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। শুধু মুসলমান সমাজে নয়, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল

সম্প্রদায়ের নিকট এই দুটি পত্রিকা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ছিল। তবে মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত 'সওগাত' সবার আগে প্রকাশিত হয় এবং মুসলিম জাতির মধ্যে সাহিত্য ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক চেতনার সৃষ্টি করে ১৯১৮ সালে এর জন্মের পর থেকে। মোটের উপর ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত সময়টাকে আমরা নজরুল যুগ বলতে পারি। কারন এই সময়ে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের কাছে নজরুল গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন; তার অন্যতম কারণ নজরুলের বিপ্লবী ভূমিকা। কবি রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী প্রতিভাও এই সময়ে ম্লান হয়ে পড়েছিল নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতার জন্য।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত সমিতি তার ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে, কিন্তু এর পর থেকে সমিতি রাহুগ্রস্ত হল। জনৈক পশু-ক্লেশ নিবারনী ইনস্পেক্টর ষড়যন্ত্র করে সমিতিকে কব্জা করে ফেললো, ফলে সাহিত্যিকরা সমিতি ত্যাগ করে একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হল সাহিত্য-সংসদ। জনাব নাসির আলী বি-কম এই সমিতির প্রথম আহবায়ক হলেন। অন্যান্য যাঁরা কমিটিতে এলেন তাঁরা হলেন জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মওলবী আয়নুল হক খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, খালেকদাদ চৌধুরী, মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, কবি ফররুখ আহমদ, প্রভৃতি। এদের পরে আরেকজন শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটে, ইনি কবি আহসান হাবিব, শওকত ওসমান ও আবুরুশদ মতিনুদ্দীন এই সময় সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। শওকত ওসমানের আসল নাম আজিজুর রহমান।

সাহিত্য সংসদ যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল তখন অবিভক্ত ভারতে রাজনীতির ডামাডোল শুরু হলো। ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে মুসলিম সাহিত্যিক সমাজে একটা নতুন চিন্তা ভাবনার কারন সৃষ্টি হলো। পাকিস্তান যেমন সংখ্যা লঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তেমনি বাংলা সাহিত্যেও মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণের দাবির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। এই অনুভূতির ফলে ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে দৈনিক আজাদকে

কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি নামে একট নতুন সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থার গোড়াপত্তন করা হলো। একজন আহ্বায়ক সহ এগারো জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয়। এদের নাম উদ্ধৃত করা হলো ঃ

আবুল কালাম শামসুদ্দিন,
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্ বাহার,
মুজিবর রহমান খাঁ (কনভেনর),
সৈয়দ সাদেকুর রহমান,
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ,
মোহাম্মদ মোদাব্বের,
আবদুল হাই,
জহুর হোসেন চৌধুরী,
আনোয়ার হোসেন,
ডাঃ ফজলুল করিম খাঁ,
মোশাররফ হোসেন।

এই রেনেসাঁ আন্দোলন শুরু হওয়ার সংগে সংগে শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হিন্দুদের মধ্যেও বেশ সহানুভূতি সূচক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। এর আগে স্বাধীনতা আন্দোলন বলতে বুঝানো হতো সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ভারত একটা দেশ নয়, একটা উপমহাদেশ। এবং ভারতের অধিবাসীরা সামগ্রীকভাবে একটা জাতি নয়, বিভিন্ন জাতির একটা মহাসমাবেশ ক্ষেত্র। এবং সংখ্যালঘু জাতি হিসাবে তাদের একটি আবাসভূমি দাবী করার সংগত কারন আছে। দশকোটি মুসলমানের একটা বিরাট জাতি একটা দেশের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়ে থাকবে, এটা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। হিন্দু-মুসলমানের জীবন ধারায় প্রভেদ সীমাহীন, সামাজিক ব্যাপারে এই দুই জাতির একত্র সমাবেশ দেখানো অচিন্তনীয়, সেখানে এই দুইয়ের একটি মিলিত জাতির আশা আকাশ কুসুম বললে অত্যুক্তি হয় না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যের যে ইংগিত পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে পাওয়া গেল, সাহিত্য ক্ষেত্রেও একটা নতুন দৃষ্টি-কোনের ইংগিত পাওয়া গেল। এ সম্পর্কে আমার সাংবাদিক অগ্রজ জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন লিখেছেন—এই নতুন দৃষ্টিলাভের ফলে মুসলমান বুঝতে পারল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দু মুসলমান উভয়ের ভাষা ও সাহিত্য হলেও উভয়ের জীবন দর্শন ও সামাজিক পরি বেশের পার্থক্য হেতু উভয়ের ভাষা ও রচনায় একটা মৌলিক পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। রসের ক্ষেত্রে সাহিত্যের সার্বজনীনতা স্বীকার্য নিশ্চয়ই, কিন্তু রূপ ও প্রকাশ ভঙ্গীর দিক দিয়ে সেখানেও মৌলিক পার্থক্য অনস্বীকার্য। এই পার্থক্য সম্পর্কে এতদিন আমরা সচেতন ছিলাম না। তাই হিন্দুর অগ্রগামী সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণই মাত্র আমরা করে এসেছি। তাই আমাদের অধিকাংশ সাহিত্য প্রচেষ্টায় স্বসুস্থতা ও স্বকীয়তা ফুটে নাই। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টার ব্যর্থতাই বেশী দেখা গেছে। কারণ অনুকরণে সৃষ্টি সম্ভব নয়।

১৯৪৩ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গনে একটি রেনেসাঁ সম্মেলনের আয়োজন করা হলো। এজন্যে একটি অভ্যর্থনা সমিতিও গঠিত হলো। এই সমিতির সভাপতি হলেন জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন। সম্পাদক হলেন কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস এবং সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মোহাম্মদ নাসির আলী ও সৈয়দ সাদেকুর রহমান। এবং আরও দশ জনকে নিয়ে কার্যকরী সংসদ গঠিত হলো। অভ্যর্থনা সমিতির এক বৈঠকে সম্মেলনের মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিগনকে নির্বাচিত করা হয়। তাঁরা হলেন :

মূল সভাপতি—আবুল মনসুর আহ্‌মদ

সাহিত্য শাখার সভাপতি—সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

ভাষা শাখার সভাপতি—আবুল হাসনাত

তমদ্দুন শাখার সভাপতি—মুজিবর রহমান খাঁ

অর্থনীতি শাখার সভাপতি—অধ্যাপক আব্দুস সাদেক

পুঁথি সাহিত্য শাখার সভাপতি—অধ্যাপক আদমুদ্দিন আহ্‌মদ

রাষ্ট্রনীতি শাখার সভাপতি—অধ্যাপক সুশোভন সরকার
শিক্ষা শাখার সভাপতি—মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ বাহার
লোক সাহিত্য শাখার সভাপতি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
ইতিহাস শাখার সভাপতি—আবদুল মওদূত
শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতি—বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ
সঙ্গীত শাখার সভাপতি—ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু ।

রেনেসাঁ সম্মেলন সার্থক ভাবে অনুষ্ঠিত হলো এবং হিন্দু ও মুসলমান পরিচালিত সকল পত্রিকায় সম্মেলনের বিবরণ এবং প্রস্তাব সমূহ প্রকাশিত হলো। এর ফলে রেনেসাঁ আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিভিন্ন মহলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে রেনেসাঁ সোসাইটির বিভিন্ন সভায় যে সকল রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবি যোগদান করেছিলেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন, তাদের মধ্যে র‍্যাডিকেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা কমরেড এম, এন রায়, কমরেড রজনী মুখার্জি, কুম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা কমরেড পি, সি যোশি এবং আরও অনেকে।

তবে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের স্বাতন্ত্র স্বীকার করতে অনেকে অনিহা প্রকাশ করেছিলেন, কারণ এদের অনেকেই দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেশ যখন ভাগ হয়েই গেল তখন অপর সকল মুসলমানের মত তারাও কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আশ্রয় নিলেন। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবি আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন—শেষ পর্যন্ত দেশ যখন ভাগ হয়েই গেল, তখন তাঁরা ঢাকায় আশ্রয় নিলেন কিন্তু মনের দিক থেকে তাঁরা কলকাতাই থেকে গেলেন। তারা বলতে লাগলেন যে, শিল্প সাহিত্য অবিভাজ্য। রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাগ হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভাগ হয়নি। অবশ্য এই সব বুদ্ধিজীবিদের নিকট থেকে পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক-সংস্কৃতিক স্বকিয়তা ও স্বাতন্ত্রের দাবি বা উপলব্ধি আশা করা যায় না। তাঁরা স্বাধীন রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে বসে কলকাতার ভাষায় পশ্চিম বাংলার সাহিত্য ঐতিহ্য বহন করে চল্লেন।

তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব-বাংলার জাতীয় কবি, কলকাতার কৃষ্টিকে পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্দ অংগ বলে গৌরব বোধ করতে লাগলেন। নয়া রাষ্ট্র এবং নয়া জাতি নয়া কৃষ্টি ও নয়া সাহিত্য যে পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এটা বুঝতে একটু সময় লাগেই। এ কারনেই—এটা উপলব্ধি করবার দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতাদের। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় রাজনৈতিক নেতারা সে দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবে দেখলাম যে, পাকিস্তান আন্দোলনের বন্যা স্রোতের সামনে দাঁড়িয়ে কলকাতা থেকে চারের দশকে আমরা কতিপয় সাহিত্যিক পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, কৃষ্টির স্বকীয়তা ও জাতীয় স্বাতন্ত্রের কথা স্বগর্বে বুলন্দ আওয়াজে বলতে পেরেছিলাম, পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় বসে তার কিছুই বলতে পারলাম না।

বাংলাভাষায় উদু' ফারসী আরবী শব্দ

রেনেসাঁ আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু আগে ভাষা নিয়ে এক দীর্ঘ বিতর্কের সূত্রপাত হয়। হিন্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রভৃতি কয়েক জন নাম করা সাহিত্যিক আন্দোলন শুরু করলেন যে, কাজী নজরুল উর্দু, ফারসী ও আরবী শব্দ বাংলা ভাষার মধ্যে আমদানী করে ভাষার ইজ্জত নষ্ট করেছে অর্থাৎ বাংলা ভাষার কৌলীন্য বজায় থাকছে না। এই বিষয় নিয়ে তাঁরা 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায় দীর্ঘ পত্র লিখলেন। কয়েক জন মুসলমান সাহিত্যিক এই প্রতিবাদ দেখে চুপ থাকতে পারলেন না। তাঁরা হিন্দু সাহিত্যিকদের মন্তব্যের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, বাংলা ভাষার ভিতর থেকে যে বিদেশী ভাষার শব্দ গুলো কায়েম মোকাম হয়ে বসে আছে তাদের বাংলা ভাষা থেকে উৎখাত করতে হবে। এর ফলে বাংলা ভাষা আর বাংলা ভাষা থাকবে না সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর ঘটবে। হিন্দু সাহিত্যিকগণ যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশের ফলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। এই প্রতিবাদ লিপিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তারা হচ্ছেন হাবিবুল্লাহ বাহার, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ,

মোহাম্মদ মোদাব্বের, ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। এই বিতর্ক স্টেটসম্যানের পাতায় কয়েকদিন ধরে চললো। পরে সম্পাদক মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে এই বিতর্কের অবসান ঘটালেন। তাঁর মতে কোন একটা ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করবে কিনা তা লেখকের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যে সাহিত্যিকরা অন্য ভাষার শব্দ সম্পদ চয়ন করে নিজের ভাষার মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারবেন তিনি তত বড় শক্তিশালী সাহিত্যিক। নিজের সাহিত্য ভাণ্ডার এমনি করে পূর্ণ করেছেন ইংরেজী সাহিত্যিকরা, তাঁরা ডাকাতের মতো অন্য ভাষার সুন্দর শব্দ গুলি এক রকম কেড়ে এনেছেন নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য। কাজেই, কোন ভাষায় অন্য কোন ভাষার শব্দ অনুপ্রবেশ করবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। এই প্রবন্ধ লিখে সম্পাদক বিতর্কের অবসান ঘটালেন। হিন্দু সাহিত্যিক বন্ধুগণ ও আর উচ্য-বাচ্য করেন নি। অবশ্য এই ঘটনার পর লক্ষ্য করা গেছে যে, অচিন্ত্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের লেখায় হর-হামেশা উর্দু ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।

রেনেসাঁ আন্দোলন পরিপূর্ণ রূপ নেওয়ার মুহূর্তে ভারত ভাগ হল। কাজেই পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে রেনেসাঁ আন্দোলনের অপরিহার্যতা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার আর সুযোগ হলো না। মুসলমান সাহিত্যিকরা দুই একজন ব্যতিত সবাই দলে দলে পূর্ব বঙ্গে হিজরত করলেন। তবে যাঁরা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁরা তাঁদের সে বিশ্বাস হারান নি।

পূর্ব বঙ্গে আগমন

পূর্ব বঙ্গে আশার পর সকল দল ও মতের সাহিত্যিকরা এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হলেন। নতুন রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা যেন সাহিত্যিকদের কর্নধারণ করে শেখাতে লাগলেন যে, সাহিত্য বাংলা হরফে লেখা চলবে না। পাকিস্তানের অবাঙালী মুরব্বীরা এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু উচ্য-বাচ্য করেননি তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালী মন্ত্রী ও টাউটগণ এই উদ্ভট পরিকল্পনার জন্য দায়ী বলে জানা গিয়েছিল। সরকারী মহলের উপর তলার খামখেয়ালীপনায় সাহিত্যিক মহল স্তম্ভিত হলো, তাদের সৃষ্টির প্রস্রবণ মরুভূমির বালুতে মিশে শুকিয়ে গেল। অনেকে

মনে করেছিল বাংলাভাষার যে সর্বনাশ এরা করলো তার থেকে উদ্ধারের বোধ হয় আর কোন পথ নেই। কিন্তু ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বীরগণ বুকের রক্ত দিয়ে প্রমাণ করলো যে, যত ষড়যন্ত্রই করা হোক বাংলা ভাষার বিনাশ নাই। এই বীরদের স্মরণে ২১শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় শোক দিবস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। আমরা একটু অনুসন্ধান করলে বুঝতে পারবো যে, কলকাতা থেকে বিরাট সংখ্যক কবি ও সাহিত্যিক পুর্ব বঙ্গে এসেছিলেন এবং যারা আগে থেকেই এদেশে ছিলেন তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আর এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক শক্তিমান কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন তাদেরকে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বলা যেতে পারে। আমি এখানে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক, গাল্পিক, ও কবির নাম উল্লেখ করছি ঃ

উপন্যাস, গল্প ও মনন সাহিত্যে মাহবুবুল আলম, আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আকবর উদ্দিন, গোলাম কাশেম, আবুরুশদ্ ও ইব্রাহীম খাঁ, সরদার জয়েন উদ্দিন, মুজিবুর রহমান খাঁ, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, প্রভৃতি। এবং কাব্য সাহিত্যে ঃ কবি শাহ্দাত হোসেন, বেনজীর আহ্মদ, বন্দেআলী মিয়া, হাবিবুর রহমান, আহসান হাবিব, হোসনে আরা, ফয়েজ আহ্মদ, জাহানারা আরজু, সুফিয়া কামাল, মাহ্মুদা খাতুন সিদ্দিকা, ফররুখ আহ্মদ, হাবিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন প্রভৃতি স্বনামধন্য লেখক ও লেখিকাগণ আমাদের সাহিত্য ভান্ডারে তাঁদের অমুল্য অবদান দিয়ে পুর্ণ করেছেন।

উপরে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো তাদের মধ্যে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী আবুল মনসুর আহ্মদ। তিনি একাধারে সাহি-ত্যিক ও সাংবাদিক। রস সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি পাওয়া দুষ্কর। তাঁর রচনা মাঝে মাঝে পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত রস-রচয়িতা রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। আবুল মনসুর সম্পর্কে আমি কিছুকাল পুর্বে বাংলাদেশ বেতারে বক্তব্য রেখেছিলাম, এখানে তা উদ্ধৃত করছি—

"বাংলাদেশে পয়লা কাতারের সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের নাম করতে হলে সবার আগে মনে পড়ে একটি নাম—আবুল মনসুর আহমদ। সাংবাদিক হতে হলে যে নির্ভীকতা, যে স্পষ্টবাদিতা ও যে সুক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন আবুল মনসুরের মধ্যে তার প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা গেছে। সাহিত্যিক আবুল মনসুর ছিলেন এক অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থে তাঁর এই প্রতিভার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। আবুল মনসুরের সাহিত্য কীর্তি অমর ও অবিনশ্বর। তার কারণ আবুল মনসুরের ছিল অসাধারণ সমাজ চেতনা। যে অন্ধ বিশ্বাস, গোঁড়ামী ও সমাজ বিরোধী পঙ্কিলতা মুসলিম সমাজকে অজ্ঞানতার অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে আবুল মনসুর বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এই সংগ্রাম বিপদ সঙ্কুল ছিল। কারণ সমাজের একটা বিরাট অংশের অন্ধ বিশ্বাস, ভন্ডামী ও গোমরাহীর বিরুদ্ধে তিনি যে আঘাত হেনেছিলেন তা সমাজকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, হয়তো এই আঘাতের প্রত্যাঘাত আসার সম্ভাবনাও ছিল।

আবুল মনসুরের "আয়না" বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। সমাজকে তিনি যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং যে চেহারা 'আয়না'য় প্রতিফলিত করেছেন তা সমাজের সকল স্তরের মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে। তাঁর ফুড কনফারেন্স" ব্যঙ্গ রসাত্মক রচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এদিক থেকে রাজশেখর বসুর পরেই আবুল মনসুরের স্থান। আবুল মনসুরের "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" রাজনৈতিক সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য অবদান। তাঁর লেখা ব্যঙ্গ রচনা "গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত", "সত্য মিথ্যা" ও ছোটদের "মুসলমানী কথা' বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে ব্যঙ্গ রচনায় আবুল মনসুর একমাত্র লেখক।

এবার সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। আমি তখন ইংরেজী 'দি মুসলমান" পত্রিকায় আমার চাচা মৌলবী মুজিবুর রহমানের কাছে সাংবাদিকতার তালিম নিচ্ছি। সে সময়ে শুনলাম, কলকাতায় আবুল কালাম শামসুদ্দিনের এক বন্ধু এসেছেন এবং তিনি খুব তেজী সাংবাদিক। 'মুসলিম জগৎ" নামে একটি

সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি লিখছেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে মৌলবী মুজিবুর রহমান তাঁর ছোটভাই মৌলবী রফিকুর রহমানকে বলেছিলেন যে, লোকটির উপর নজর রেখো, হয়তো একদিন ওকে আমার দরকার হতে পারে। এটা ১৯২৩ সালের কথা। এরপর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আবুল মনসুর 'ছোলতানে' দেড় বৎসর কাজ করার পর সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী"তে যোগদান করেছেন, কিন্তু মোহাম্মদীতে তাঁর চাকুরী টিকলো না। এই সংবাদ পেয়ে মৌলবী মুজিবুর রহমান তাঁকে "দি মুসলমান" পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের চাকরী দিলেন। "দি মুসলমান" তখন সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে তিনি মৌলবী মুজিবুর রহমান ছাড়াও আরো দু'জন জাঁদরেল সাংবাদিকের তত্ত্বাবধানে ইংরেজী সাংবাদিকতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে লাগলেন, এদের একজন হলেন অধ্যক্ষ জে, এল, ব্যানার্জি এবং অপরজন অধ্যাপক আনন্দময় ধাড়া। অবিশ্যি আবুল মনসুর সাহেব তাঁর আত্মচরিতে আনন্দময়কে ভুল করে রসময় লিখেছেন।

"দি মুসলমান" দৈনিক হওয়ার চেষ্টা চলছে আর সঙ্গে সঙ্গে "খাদেম" নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগলো "দি মুসলমান" থেকে। আবুল মনসুর আহমদকে এই পত্রিকা সম্পাদনার পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হলো। আবুল মনসুরের তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদিতা, ভাষার তেজস্বিতা এবং মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে বলিষ্ঠ ভূমিকা মৌলবী মুজিবুর রহমানকে মুগ্ধ করেছিল।

আমি ততদিনে সাংবাদিক হয়ে গেছি। ইংরেজী "দি মুসলমানের" বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করছি, কিন্তু বাংলা লেখায় তখন আমার হাতেখড়ি হয়নি। কিন্তু আমার মন চাইত যে, আমি বাংলা ভাষার লেখক হই। আর এই আশায় রাত জেগে অতিকষ্টে একটি কবিতা খাড়া করলাম এবং গোপনে আবুল মনসুর সাহেবকে দেখালাম। তিনি ত আমার লেখার উচ্ছসিত প্রশংসা করে নিজের কাছে সেটা রেখে দিলেন এবং বললেন, "খাদেম"-এ ছেপে দেব। ছাপাও হয়েছিল, কিন্তু দেখলাম আমি যা লিখেছিলাম তার কয়েকটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই নেই এবং শিরোনামটাও পাল্টে গেছে। তবে লেখক হিসেবে আমার নাম

ছাপা হয়েছিল। সেই দিন থেকে আমি তওবা করে কবিতা লেখার দুঃসাহস ত্যাগ করলাম, কিন্তু আবুল মনসুর আমাকে ছাড়লেন না। তিনি আমায় বুঝালেন যে, কবিতা তোমার হবে না সত্যি, কিন্তু ভাষার উপর তোমার যা দখল আছে তাতে বাংলা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে শুরু কর, কারণ ইংরেজী প্রবন্ধ লেখায় তোমার যে দক্ষতা আছে সেটা কাজে লাগবে। এরপর আমি প্রায়ই সপ্তাহে কমপক্ষে দুটো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আবুল মনসুর সাহেবের নিকট পেশ করেছি, তিনি কিছু কিছু সংশোধন করে তাঁর "খাদেম"এ প্রকাশ করেছেন। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, ইংরেজী সাংবাদিকতায় যেমন মৌলবী মুজিবুর রহমান আমার গুরু, আবুল মনসুর আহমদও তেমনি বাংলা সাংবাদিকতায় আমার দীক্ষা গুরু।

আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে, দূরদৃষ্টি ও নির্ভীকতা আবুল মনসুরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। একটি ব্যাপারে তাঁর এ গুণের বিশেষ পরিচয় পাই। আবুল মনসুর তখন "খাদেম" সম্পাদক। এই সময় স্বামী সত্যদেব নামে এলাহাবাদের এক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে, এই নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সে কি উল্লাস। কলকাতার মুসলমানরাই শুধু নয় চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের মুসলমানরাও তাকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করলো। তাঁরা তাকে প্রায় ৬ লাখ টাকা তুলে উপহার দিল। এই ঘটনা আবুল মসুরকে বিব্রত করলো। তিনি "খাদেমে" লিখলেন যে, কোন অমুসলমান ইসলাম কবুল করলেই তাকে অভ্যর্থনা দেয়ার যে ঘটা হয়, এটা ইসলাম ও মুসলমান সমাজের পক্ষে অপমানকর। কারণ, মানুষের কাছে এটাই তুলে ধরা হয় যে, এই ভদ্রলোক ইসলাম কবুল করে মুসলমানদের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। অবশ্য আবুল মনসুর যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটলো, স্বামী সত্যদেব মুসলমানদের লাখ লাখ টাকা ঠকিয়ে নিয়ে এলাহাবাদে ফিরে আবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয় তিনি ইসলাম বিরোধী একখানি বই লিখলেন।

প্রায় সাড়ে চার বৎসর "খাদেমে" থাকার পর আবুল মনসুর স্বাধীন-ভাবে ওকালতী ব্যবসা করার জন্য চাকরী ছেড়ে দিলেন। ১৯২৯

সালের ডিসেম্বরে তিনি "খাদেম" ত্যাগ করলেন এবং আমিও আমার গুরুর সান্নিধ্য থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হলাম।

দেশ বিভাগের পর আমরা সাংবাদিক হিসেবে আবুল মনসুরকে হারিয়েছি কিন্তু পেয়েছি রাজনীতিক হিসেবে। তিনি মন্ত্রী হয়েছেন, জননেতা হয়েছেন, কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে যে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন তার তুলনা অন্য সব কিছুই অতি নগণ্য।

'৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর "ফ্রীল্যান্সার" হিসেবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আবুল মনসুরের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল। এ সময়ে তাঁর লেখনী ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সুতীব্র। বারবার তাঁকে বলতে শুনেছি যে "স্বাধীনতা আমরা অনেক বেশী মূল্য দিয়ে পেয়েছি, কিন্তু দেশের একদল দুশমন তা অতি কম মূল্যে বিকিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।" তাঁর মৃত্যুর মাত্র দুইদিন পূর্বে রোগশয্যায় শায়িত আবুল মনসুর আমার মাথাটি তাঁর বুকে চেপে বলেছিলেন, মনে রেখো, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা যদি পরাজিত হই, তা হলে আমাদের রাজনৈতিক পরাজয় ঠেকানো যাবে না।

এই ঘটনার দুই দিন পর ১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে খবর পেলাম যে, একটি মহান জীবনের অবসান ঘটেছে। দীর্ঘ ৮৩ বৎসরের জীবনে তিনি জাতিকে অনেক কিছু দিয়েছেন। এ জন্য জাতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। নতুন রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিকরা ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পরম উৎসাহে সাহিত্য সৃষ্টি করে চল্লেন। প্রকাশকরা ও পুস্তক প্রকাশে এগিয়ে এলেন কিন্তু তাদের সংখ্যা নগন্য। সাহিত্য সৃষ্টি হতে লাগলো কিন্তু সে তুলনায় প্রকাশনা ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব সাহিত্যিক সমাজে কোন রূপ প্রেরনার পরিচয় পাওয়া গেল না। যখন পূর্ব বঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির একটা প্রেরণা জাগলো, সাহিত্যিক সমাজ নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তির উপর নূতনতর ও সুন্দরতর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উন্মুখ, তখন কাগমারীতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের নামে একটি সম্মেলনের আয়োজন করলেন মওলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী। পশ্চিম-বঙ্গের সেরা পাকিস্তান-বিরোধী সাহিত্যিকদের এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হল; সম্মেলনের জন্য বহু তোরণ নির্মিত

হয়েছিল তার বেশীর ভাগ ভারত ও পশ্চিম বঙ্গের নেতাদের নামে। মওলানা ভাসানী ছিলেন গোঁড়া-পাকিস্তানী, তবে উদারতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ তিনি কেন করলেন তার হদিস পাওয়া যায়নি।

এরপর ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে আর একটি সাহিত্য সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন আহবান করেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মওলবী আবদুর রহমান। মওলনা মোহম্মদ আকরাম খাঁ মূল সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে পাক-বাংলায় রূপ রেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবুল মনসুর ও মোহম্মদ বরকত উল্লাহ মুসলমান সাহিত্যিকদের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা সম্পকে বক্তব্য পেশ করে। মনন শাখায় সভাপতির ভাষণে আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন যে, পাকিস্তান পূর্ব যুগে এখানকার মুসলমানদের মনে জাতীয় রেনেসাঁর বাণী যে রকম জোর দানা বেঁধেছিল, পাকিস্তান উত্তর যুগে দেখা যাচ্ছে, তা যেন ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে। এটা নিশ্চিতভাবে দুঃসংবাদ। আবার বিদেশী ও বিজাতীয় সম্মোহন পাকিস্তানী তরুণ মানসে মায়াজাল বিস্তার করেছে দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে নেপথ্য থেকে গত যুগের একদল ছিটকে পড়া সম্মানিত পাণ্ডিত্যাভিমানী এ অপচেষ্টার পিছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

১৯৫৮ সাল। আইউব খাঁ পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করলেন। সাহিত্যিক সমাজ স্তম্ভিত হলো। তাঁরা মনে করলেন পশ্চিমের শাসকরা বাংলা সাহিতের এবার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। সাহিত্যিকদের এই ভাবনা চিন্তার মধ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটলো তাঁর বিবরণ দিচ্ছি পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারির কয়েক মাস পরেই কর্নেল নাজির আহমদ ও কুদরত উল্লাহ সাহাব ঢাকায় এসে সকল শ্রেণীর সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের এক সমাবেশ ঘটালেন এবং বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য কি করা যায় সে সম্পর্কে এক আলোচনার ব্যবস্থা করলেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এই ব্যপারে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন অধ্যাপক মুনির চৌধুরী। তৎকালীন জগন্নাথ হলের আইন সভা মঞ্চে সভা শুরু হল। কর্নেল নাজির আহমদ প্রথমে তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন পূর্ব-বঙ্গের সাহিত্যিকদের প্রশংসা করে। তারপর তিনি বললেন, পাকিস্তানী জাতি এখন খুব নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে

চলেছে। তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি না করতে পারলে স্বাধীনতাই অর্থহীন হবে। এজন্য সাহিত্যের মাধ্যমে জাতিকে মজবুত করতে হবে। আর তা করতে হলে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার প্রয়োজন। কুদরত উল্লাহ সাহাব ও একই ধরনের বক্তব্য রাখেন। এই সভায় জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর পূর্ব্ব-পাকিস্তান শাখার গোড়াপত্তন হয়। এর আগে করাচীতে জাতীয় পুনগঠন ব্যুরো ও পাকিস্তান কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানেও পাকিস্তান কাউন্সিলের শাখা গঠিত হল। লেখকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য এবং লেখকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত হল রাইটার্স গিল্ড। এই গিল্ড ১৯৬০ সালের দিকে 'পরিক্রম' নামক একটি সাহিত্য মাসিক বের করে। প্রথমে 'পরিক্রম' পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন সম্ভবতঃ ডাঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং পরে সম্পাদক হয়েছিলেন আবদুল গনি হাজারী ও জাহানারা আরজু। পত্রিকাখানি বেশ উন্নতমানের হয়েছিল সন্দেহ নেই।

আইউব খাঁ সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি বিধানের জন্য অনেক কিছু করেছেন। তাঁর এ দান অস্বীকার করা সঙ্গত হবে না। আইউব আমলে শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কগুলিকে আদমজী পুরস্কার, দাউদ পুরস্কার ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক পুরস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্ত্তন করা হয়। বুলবুল একাডেমী ও নজরুল একাডেমীকে বিরাট অঙ্কের অনুদান দেওয়া হয় এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানী সংস্কৃতি দলের বিদেশ সফরেরও ব্যবস্থা করা হয়।

পাকিস্তানের আইউব সরকার হয়তো মনে করেছিল যে, দেশে তাঁর নীতির বুনিয়াদ মজবুত করার জন্য সাহিত্যের সমর্থন প্রয়োজন। তিনি বুঝেছিলেন যে, একটা জাতির জয় ও পরাজয় নির্ভর করে যথাক্রমে সাহিত্যের শক্তি ও দূর্বলতার উপর। এই সত্য অনুধাবন করেই আইউব পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানে নাম করা সাহিত্যিকদের সহযোগীতা পাওয়ার সক্রিয় চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভাষার উন্নতির জন্য বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয়ে করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে "উর্দু উন্নয়ন বোর্ড" ও পূর্ব পাকিস্তানে "বাংলা উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করে উভয় ভাষার উন্নতির যে চেষ্টা করেছিলেন তা প্রশংসনীয় হলেও পূর্ব পাকিস্তানের

প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেন নি, কারণ "উর্দু উন্নয়ন বোর্ডে" যখন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তখন "বাংলা উন্নন বোর্ডে" বরাদ্দের পরিমান ছিল মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা। পূর্ব পাকি-স্তানের প্রতি এই বিমাতাসুলভ আচরন সত্ত্বে ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। "ব্যুরো অব ন্যাশনাল রি কন্সট্রাকশন" ব্যাপক ভাবে পুস্তক প্রকাশনায় নিয়োজিত হয়। এই সময় বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

আইউব যে উদ্দেশ্যে সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষকতা করছিলেন সেই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সাধিত না হলে ও বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের যে অনেকখানি কল্যান সাধিত হয়েছিল সে সম্পর্কে খুব বেশী দ্বিমত নেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে স্বাধীনতা লাভের ৪—৫ বৎসর পর পর্যন্ত সাহিত্যের গতি ধারা শ্লথ এবং প্রকাশনা স্তব্ধ হয়ে গেছে। পুস্তক প্রকাশকরা পাঠ্য পুস্তক ও নোট বুক ব্যাতীত সাহিত্য সম্পর্ক গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে আসছেন না। সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য যে "দাউদ ফাউণ্ডেশন, আদমজী, বাওয়ানী, ও সোনালী ব্যাঙ্ক" প্রভৃতি এগিয়ে আসতো। এখন আর তারা সে চেহারায় নেই। এখন যারা এ সবের কর্ণধার তারা ইচ্ছা করলে তাদের সাহিত্য পুরস্কার গুলি চালিয়ে যেতে পারতেন। কারণ চালিয়ে যাওয়ার মালিক আমাদের জাতিয় সরকার।

বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্যের অনুপস্থিতির সুযোগে এদেশে বিদেশের অপসাহিত্য ও অশ্লীল সাহিত্য অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশের জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতির ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। মনেরাখা দরকার যে, কোন জাতির রাজনৈতিক পরাজয় তখনই হয় যখন সে জাতির সাংস্কৃতিক পরাজয় ঘটে। বাংলাদেশে সাহিত্য প্রকাশনার দ্বার রুদ্ধ হয়ে আছে। এ দ্বার খুলতে হবে! জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যে চেতনার স্পন্দন জেগেছে তার স্ফুরণ ঘটানোর প্রয়োজন অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে এবং প্রকাশনার দায়ীত্ব নেওয়া উচিৎ জাতীয় সরকারের। তা না করলে হিমালয় প্রমান ভুল করা হবে।

॥ উনিশ ॥

মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত। আর এই গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন যে সকল মনীষী, তাদের কথা না বললে কিছুই বলা হবে না। এই ইতিহাস স্রষ্টাদের পুরোভাগে দেখা যায় ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিক, চির-কুমার মওলবী মুজীবুর রহমানকে। ১৯০৬ সালে ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি-মুসলমান' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। 'দি মুসলমান" ও মুজীবুর রহমান যেন একীভূত হয়ে গিয়েছিল। সে কাহিনীই বলছি।

সাংবাদিকতায় মুসলমান

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চব্বি শপরগণা জেলার নিহালপুর গ্রামে এক জীর্ণ পর্ণকুটিরে জন্ম নিয়েছিলেন অমিত তেজা সত্যাশ্রয়ী মুজিবুর রহমান। তাঁর পিতার নাম এলাহী বখ্‌স।

মুজীবুর রহমান

মুজিবুর রহমানের বয়স যখন মাত্র ১১ বৎসর তখন তিনি পিতাকে হারান। নাবালক দুটি পুত্র ও একটি কন্যা নিয়ে বিধবা মা নিভৃতে অশ্রুবিসর্জন করতেন। শৈশবে গ্রামের স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পর মুজিবুর রহমান কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। চাচা আবদুর রউফ মুজিবের লেখাপড়ার ভার নিলেন। কিন্তু কলেজে ভর্তি হলে কি হবে? ছেলের দায়িত্বজ্ঞান টনটনে। গ্রামে দুখিনী মা ভাল খেতে পরতে পাচ্ছেন না, সংসারের অভাব অনটন দূর করবার জন্য ও ছেলেদের ভাল করে লেখাপড়া শেখাবার জন্য ছোট চাচা উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন, এমন অবস্থায় নিশ্চিন্তে লেখা-পড়ায় মনোনিবেশ করা কি সম্ভব? তাছাড়া দেশোদ্ধার করতে হলে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

করিতকর্মা ছেলে মুজিব কলেজে ২ বৎসর যেতে না যেতেই শেয়ালদা কোর্টে একটা পেশকারের চাকরী জুটিয়ে নিলেন। তার স্বপ্ন

মায়ের অভাব দূর করা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা, এবং সুযোগ বুঝে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া।

কিন্তু চাকরী তাঁর ভাগ্যে বেশী দিন সইল না। ঘুষের রাজত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি ১৭৬/২ বউবাজারে একটা ছোট মনোহারী দোকান খুলে বসলেন। কিন্তু দোকানও চলল না। কারণ দোকানদার-দের যে রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, খারাপ জিনিষকে ভাল বলে প্রচার করতে হয়, তা মুজিবের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাঁর দোকানও বন্ধ হয়ে গেল।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালালেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের নীতির সংগে ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর নীতির গরমিল হওয়ায় তিনি সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে ফিরে এলেন। এরপরে সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের সংগে মুজিবের পরিচয় হয় এবং সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা "দি বেঙ্গলী"তে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন বাংলাকে দু-ভাগ করলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ করার জন্য সারাদেশে আন্দোলন শুরু হল। মুজিবুর রহমান এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে হিন্দু নেতাদের স্নেহভাজন হয়েছিলেন। এই সময়ে ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল, আবদুল হালিম গজনভী ও মৌলভী আবুল কাসেম একখানি সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা বের করলেন, পত্রিকাটির নাম দেওয়া হল "দি মুসলমান।" ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর সাপ্তাহিক "দি মুসলমান" প্রকাশিত হলো। সম্পাদক হলেন মৌলভী আবুল কাসেম ও ম্যানেজার মৌলভী মুজিবুর রহমান। তিন সংখ্যা "দি মুসলমান" প্রকাশিত হওয়ার পর কাসেম সাহেব সম্পাদকের দায়িত্ব মজিবুর রহমানের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। কাজেই পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্ব মুজিবুর রহমানের উপর এসে পড়ল। ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল ও হালিম গজনবী পত্রিকা চালানোর খরচ যোগাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝ পথে গজনবী সাহেবও সরে পড়লেন। একমাত্র রসুল সাহেবই জীবনের শেষ দিন অর্থাৎ ১৯১৭ সালের ৯ই আগষ্ট পর্যন্ত "দি মুসলমানকে" – সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।

হিন্দুদের নীতি বিগর্হিত কাজের কঠোর সমালোচনা করেছেন মুজিবুর রহমান। তবুও হিন্দুরা তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলতে কোনদিন সাহস করেনি বরং সকল মতের সর্বস্তরের মানুষ স্বীকার করত যে, মুজিবুর রহমান একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, একজন সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়পরায়ণ আদর্শ সাংবাদিক।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে "দি মুসলমান" ইলিয়ট রোডের বাড়ী থেকে ১১/৫ কড়েয়া বাজার রোডে স্থানান্তরিত হল। চিরকুমার মুজিবুর রহমান এই বাড়ীতেই তাঁর মা ও চাচাত ভাইয়ের পরিবারকে এনে রাখলেন।

১৯২০ সালে গান্ধিজীর ডাকে সাড়া দিয়ে মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সময়ে তিনি খেলাফত আন্দোলনেও শরীক হন এবং চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন।

১৯২১ সালে মুজিবর রহমান এক বৎসর কারাদণ্ডে ও পাঁচশত টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হন। বলা বাহুল্য, মুজিবর রহমান জরিমানা দেননি। সেজন্য তাঁকে আরও ৫ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

মুজিবর রহমান দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয়ভাবে জন সেবায় নিযুক্ত থেকেও নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র জীবন যাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবনে তিনি একটি বারও মিথ্যে কথা বলেননি, অন্যের একটি পয়সাও তিনি অপচয় করেননি বা মুহূর্তের জন্যও তিনি আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেননি। যতই উত্তেজনার কারন ঘটুক না কেন তাঁর মুখ থেকে কখনো কটু বা অশ্লিল বাক্য বার হয়নি। জীবনে তিনি কারো দান গ্রহন করেননি। কারও কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেননি। রাজনীতিক জীবনে এগুলিকে অবিশ্বাস্য ও অবাঞ্ছনীয় ব্যতিক্রম বলতেই হবে।

প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার চাইতে সাংবাদিকতাকেই মুজিবুর রহমান বেশী পছন্দ করতেন এবং অন্য সকল কর্তব্যের চাইতে এটাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি মনে করতেন সভা-সমিতি বক্তৃতার চাইতে সুলিখিত ও যুক্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবন্ধই জনগণের মনে অধিক এবং স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। জনগণকে জাতীয় চেতনায় তথা স্বাধী-

নতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য সংবাদপত্রই সবচাইতে উপযুক্ত মাধ্যম। কুটনীতিক ইংরেজ সরকারের দূরভিসন্ধিমূলক শাসন-শোষন ও দমন নীতির প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করার ও প্রতিবাদ করার এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের কার্য্যাবলীর সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করার দায়িত্ব সাংবাদিকের।

জেল থেকে বেরিয়ে মুজিবুর রহমান প্রথমেই মনোযোগ দিলেন ক্ষীয়মান সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে দৈনিকে উন্নীত করতে। ১৯২৫ সালে দি মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানী নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী করে কিছু শেয়ার বিক্রি করার প্রচেষ্টা চালালেন।

দি মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানী থেকে ১৯২৬ সালে বাংলা সাপ্তাহিক "খাদেম" প্রকাশিত হয়। খাদেম সম্পাদনার ভার দেওয়া হল, আবুল মনসুর আহমদকে। ১৯৩০ সালে দি মুসলমান দৈনিকে রূপান্তরিত হল এবং এটাই হল তাঁর কাল। ১৯৩৫ সালে দি মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড দেনার দায়ে লিকুইডেশনে গেল। নিউ মুসলিম মজলিশের খাজা নুরুদ্দিন "দি মুসলমান" এর গুড উইল কিনে নিলেন এই সর্তে যে মুজিবুর রহমানই পত্রিকার সম্পাদক থাকবেন এবং তাঁর সম্পাদকীয় নীতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। সোজা কথায় মুজিবুর রহমান তখন "দি মুসলমান" এর বেতনভুক সম্পাদক হলেন।

১৯৩৭ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে মুজিবুর রহমান পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন। এরপর ১৯৪০ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হলেন এবং ডাক্তার আসার পূর্বেই ইন্তেকাল করলেন। এইরূপে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর এক গৌরবময় সাংবাদিক জীবনের অবসান ঘটল।

মওলবী মুজিবুর রহমানের পরেই নাম করতে হয়, বাংলা সাংবাদিকতার পথিকৃত মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর। তৎকালে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সেবক, জামানা, পরে আজাদ প্রকাশ করে মওলানা আকরম খাঁ বাংলার সাংবাদিকতার ভুবনে অনন্য ব্যক্তিত্ব। যা শিক্ষা দীক্ষায় তিনি অনন্য সাধারণ আলেম।

মওলানা আকরম খাঁ

ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক গগণে যে সকল আজাদীকর্মী বিপ্লবী নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের অধিকাংশই ছিলেন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাদের বেশীর ভাগ ছিলেন মওলানা জামালুদ্দীন আফগানীর মন্ত্রশিষ্য। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্যতম নায়ক ছিলেন শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী। লক্ষণীয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কয়েকজন খ্যাতিমান মওলানা দেশের মুক্তি সাধনায় বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে মওলানা কেরামত আলী, মওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী, মওলানা কিফায়েত উল্লা, মওলানা হাসরাত মোহানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পীর শরীয়তুল্লাহ, পীর বাদশা মিয়া, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিশেষভাবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক গগণ আলোকিত করেছিলেন। এদের মধ্যে আর একজন মওলানা তাঁর বহুমুখী কর্মতৎপরতা ও অসাধারণ বাগ্মীতার জন্য বিপ্লবীদের পয়লা কাতারে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন আলেম। আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত, বাংলা ভাষায় ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী, পয়লা কাতারের সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার নির্ভীক সেনানী; জীবন ছিল তার সংগ্রামশীল। নানা প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি বড় হয়েছেন, দেশবিখ্যাত হয়েছেন। উপমহাদেশের মনীষীদের কাতারে তিনি বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন।

মুসলমান জাতির পতন যুগে মোহাম্মদ আকরম খাঁর জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের বশীরহাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রামে এক শিক্ষিত পরিবারে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে তিনি জন্ম লাভ করেন। তাঁর পিতা মওলানা আবদুল বারী ও মাতা বেগম রাবেয়া খাতুন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্প বয়সে একই দিনে তিনি মাতা ও পিতা উভয়কে হারিয়েছিলেন। এদের কলেরায় মৃত্যু হয়েছিল। কাজেই এতিম আকরম খাঁ নানার কাছে লালিত পালিত হয়েছিলেন। শৈশব থেকেই তাঁর মনে স্বাধীনতার

আগুন জ্বলে উঠে। তাই তিনি ইংরেজী স্কুল ছেড়ে কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেন।

মওলানা আকরম খাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯০৬ সাল থেকে। স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের গোড়া পত্তনের সংগে সংগে তিনি লীগে যোগদান করেন। রাজনৈতিক জীবন শুরু করার সংগে সংগে তিনি বুঝতে পারলেন যে, অচেতন মুসলিম সমাজকে সচেতন করার জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সংবাদপত্র। ইতিমধ্যে মওলানার বাগ্মীতার কথা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্ষুরধার লেখনীর কথাও কারও অজানা ছিল না; কাজেই সুযোগ এসে গেল। হাজী আবদুল্লাহ নামে একজন ধনী ব্যবসায়ীর একটি মুদ্রণ যন্ত্র ছিল এবং তিনি মোহাম্মদী নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন বাংলা ও উর্দু ভাষায়। কিন্তু উপযুক্ত সম্পাদকের অভাবে পত্রিকাটি জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। হাজী সাহেব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সংগে যোগাযোগ করে মুদ্রণ যন্ত্র ও পত্রিকাটি তার হাতে তুলে দিলেন, এটা ১৯১০ সালের ঘটনা। এই সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকা বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানের জীবন-কাঠির কাজ করেছে। উপ মহাদেশের মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সংবাদপত্র বলতে তখন 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' কেই বোঝাত। সরকারী ও বেসরকারী মহলে এই পত্রিকার প্রভাব ছিল অসাধারণ।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল বিভিন্ন-মুখী। যুক্তভারতে বিপ্লব সংঘটনের জন্য তিনি সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতীয় পাঠান সর্দারদের সংগে যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু তাদের নিকট থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নি। পরবর্তী জীবনে তিনি কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক নেহরু রিপোর্ট প্রকাশের পর তিনি যখন দেখলেন যে, এতে ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের উপর অবিচারের ইঙ্গিত রয়েছে তখন তিনি ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন।

মুসলমান জাতির স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য সাপ্তাহিক পত্রিকা যথেষ্ট নয়, বিশেষ করে কংগ্রেস ও হিন্দু প্রভাবিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা শুধু বাংলায়ই দু'ডজনের উপর, অথচ মুসলমানদের একটিও পত্রিকা নেই। এই দুঃখজনক অবস্থার অবসান চাই, সেজন্য মওলানা সাহেব ১৯২১ সালে 'দৈনিক সেবক' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। সেকালের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা সেবক পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। এদের মধ্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। নজরুলের 'সেবক' কবিতাটি এই সময়ে সেবকে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে পত্রিকাটি বেশীদিন চলেনি অর্থাৎ ইংরেজ সরকার চালাতে দেয়নি। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি জোরালো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে মওলানা সাহেব গ্রেফতার হন। বিচারে তাঁর এক বৎসর কারাদণ্ড হয়। অবশ্য এই কারাবাস একদিক থেকে জাতির প্রতি আশীর্বাদ মনে করার কারণ আছে। এই কারাবাসকালেই মওলানা সাহেব তাঁর অমর গ্রন্থ 'মোস্তফা চরিত' রচনা করেন। ধর্মীয় জীবন ইতিহাসে 'মোস্তফা চরিত' মওলানার অবিনশ্বর কীর্তি এবং বাংলা সাহিত্যের জগতে এক অমূল্য সম্পদ।

পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বোধ হয় সবার অগ্রগামী। "দৈনিক জামানা" নামে একটি উর্দু পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। মওলানা সাহেবের জামাতা আবদুর রাজ্জাক খাঁ এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। রাজ্জাক খাঁ মাদ্রাসা পাশ ছিলেন। সেজন্য উর্দু আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল।

১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য এ,কে ফজলুল হক সাহেব মনে করেছিলেন যে, তাঁর প্রজাপার্টি সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে। কিন্তু তা সম্ভবপর হয়নি। কারণ, মুসলিম লীগের হাতে 'মোহাম্মদীর' মত একটি শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল। নির্বাচনের পর যখন লীগ প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হল, তখন একটি শক্তিশালী দৈনিকের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলেন দেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ।

এই জন্যই মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশ করলেন। "এই আজাদ" পত্রিকাই মুসলিম জাতির ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ। "আজাদ" প্রকাশের পর থেকে মুসলমান জাতি মনে হ'ল নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে।

মওলানা আকরম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। কিছুদিন তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউনসিলের এবং পরে পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণ-পরিষদ ভেঙে দিলেন। প্রতিবাদে মওলানা মুসলিম লীগ ত্যাগ করলেন। তার আগে ১৯৫১ সালে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মওলানা ঢাকায় চলে এলেন। তাঁর আজাদ পত্রিকা ঢাকায় এল ১৯৪৮ সালে। এসময় পর্যন্ত আমি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হিসেবে এবং তার আগে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র বার্তা সম্পাদক হিসেবে ঘনিষ্ঠভাবে মওলানা সাহেবের সাথে জড়িত ছিলাম। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৩ বৎসর মওলানার পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা আনন্দময় পত্রিকার মালিক হিসেবে তিনি কোনদিন সম্পাদকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। বরং তাদের সংগে নিজের সন্তানের মত ব্যবহার করেছেন। কেবল মাত্র নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি সম্পাদকমণ্ডলীকে নিয়ে আলোচনায় বসতেন। সে আলোচনায় মত ও পথ ঠিক হ'ত। আমাদেরও অভিজ্ঞতা বাড়ত।

সাংবাদিক আকরম খাঁর আর একরূপ দেখেছি ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সেরূপ বিপ্লবীর রূপ, সেরূপ বেপরোয়া গণনেতার রূপ। তখন তাঁর বয়স ৯৫ বছর। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইউব খাঁ প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন। এই বেআইনী আইনের বিরুদ্ধে সাংবাদিক ও সাহিত্যিকরা তীব্র প্রতিবাদে মুখর হলেন। তাদের উদ্যোগে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল রাজপথে নামল, আর মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন চলৎশক্তিহীন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

এর অল্প কিছুদিন পরের ঘটনা। মওলানা সাহেব তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি কেবিনে এবং অপর এক কেবিনে আর এক মনীষী ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ডঃ শহীদুল্লাহর নির্দেশে তাঁকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে মওলানার কেবিনে নিয়ে গেলাম। দুই মহাসাধক মনে হল যেন দুই অসহায় শিশু—উভয়ের চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরছে; কেউ কথা বলতে পারেননি। কি দুঃসহ বেদনা উভয়ের মনে, তা উপলব্ধি করলাম।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিপ্লবী মওলানাদের অন্যতম—একথা বিনাদ্বিধায় আমি বলছি, কারণ সারাজীবন তিনি গণ-মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন আর লেখনীর মাধ্যমে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন। তাঁর লিখিত 'মোস্তফা চরিতে'র বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সমাধান, মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস, তফসিরুল কুরআন জাতির সম্পদ হয়ে আছে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাঁকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেন আর উপমহাদেশের মুসলমানরা তাঁকে প্রাণঢালা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে ধন্য হয়েছে।

' মওলানার জীবন একটি গৌরবদীপ্ত ইতিহাস', একটি অমর কীর্তি যা প্রায় একশতাব্দীকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। কংগ্রেস, খেলাফত, কৃষক-প্রজা ও মুসলিম লীগ, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা—সর্বক্ষেত্রেই সবার আগে দেখি প্রতিভাদীপ্ত সেই মানুষটি—মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

'মোহাম্মদী' ও 'আজাদ' পত্রিকার পরই নাম করতে হয় "দৈনিক সোলতান" পত্রিকার। এই পত্রিকা মুসলিম নব জাগরণে আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে অবিভক্ত বালায়। আর সোলতানের কাণ্ডারী ছিলেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

একটা জাগ্রত জাতির লক্ষ্য নব সৃষ্টির উল্লাসে সামনে এগিয়ে চলা। কিন্তু এগিয়ে চলার প্রেরণা পেতে হলে আমাদের মাঝে মাঝে

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

পিছনে তাকিয়ে দেখতে হবে। যাঁরা আমাদের জন্যে রেখে গেছেন তাঁদের অবিনশ্বর কীর্তি, সেই কীর্তির ধ্বজা ধরে এগিয়ে চলার দুর্জয় সাহস জাগবে মনে। সেই হিসেবে পূর্বসুরিদের উত্তরাধীকার পরবর্তী যুগের মানুষের চলার আলোক বর্তিকার কাজ করবে।

জাতির জন্য এই উত্তরাধিকার যাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী নিঃসন্দেহ অন্যতম। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর কর্মতৎপরতা সমাজ সংস্কারে, ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানে মুসলমানদের সর্বপ্রকার উন্নতিমূলক প্রচেষ্টায়, সংবাদপত্রের সম্পাদনা ও পরিচালনায় এবং আজাদী সংগ্রামে তাঁর নেতৃত্ব ত্যাগ ও নিরলস কর্তব্য পরায়ণতার কথা দেশ ও জাতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। নিজের মত ও আদর্শের প্রতি তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস ছিল। শত বিপদ আপদেও তিনি সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতেন না। আজ মওলানার ধর্মপ্রচারও সমাজ সেবা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। মওলানা ইসলামাবাদীর জন্ম ভারতের এক যুগসন্ধিক্ষণে। সেটা মুসলমানদের পতন যুগ বলা যায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ধাক্কা তখনও মুসলমান জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে রেখেছিল। ইংরেজ শাষকদের অত্যাচারে মুসলমানরা চাকুরী, সম্পত্তি প্রভৃতি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে অমানবিক জীবন যাপন করছিল। সেই যুগে অর্থাৎ সিপাহী যুদ্ধের মাত্র ১৮ বছর পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত বরমা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। কোন কোন লেখক বলেছেন তাঁর জন্ম হয় আড়ালিয়া গ্রামে। আসলে তাঁর জন্ম বড়াল ও বরমা গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত আড়ালিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা মৌলভী মতিউল্লাহ্ পণ্ডিত সাহেব ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক। পুত্রকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে এক মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। পরে মওলানা মনিরুজ্জামান প্রথমে হুগলী মাদ্রাসায় পরে কোলকাতার আলিয়া মাদ্রা-

সায় শিক্ষালাভ করেন। মনিরুজ্জামান আরবী ও ফারসীতে সুপণ্ডিত হলেও বাংলা ও ইংরেজী জানতেন না, ফলে বিশাল বিশ্বে তিনি যেন অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য্যের অধিকারী ইসলামাবাদী সাহেব নিজের চেষ্টায় বাংলা ও ইংরেজী স্বল্পকালের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলেন। শুধু আয়ত্ব করাই নয় সংবাদপত্র সম্পাদনার যোগ্যতা অর্জন করে সাংবাদিক জগতেও বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে গেলেন।

মওলানা ইসলামাবাদী মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে পেটের তাগিদে রংপুরের হারাগাছ মাদ্রাসায় চাকরী নিলেন। কিন্তু চাকরী করা তাঁর পক্ষে বেশী দিন সম্ভব হল না। রংপুরের চাকরী অবস্থায় বুঝতে পারলেন যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলমানরা বঞ্চিত অবহেলিত হয়ে আছে। পক্ষান্তরে হিন্দু লেখকরা এই সুযোগে মুসলমানদের অতীত গরিমা মুছে ফেলতে বেদেরেক কলম চালিয়ে যাচেছ। তখন তিনি কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আল-ইসলাম নামে একটি মাসিকপত্র তিনি প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ইসলামের যেসব প্রচারক বিভিন্ন মতোদর্শের ভিত্তিতে ঝগড়া-ঝাটি ও বিতর্ক করে কাল কাটাচিছলেন তাদের নিয়ে আঞ্জুমানে ওলামায়ে ইসলাম বাংলায় পত্তন করেন মওলানা ইসলামাবাদী। জমিয়াতে ওলা-মায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠার মূলে মওলানা ইসলামাবাদীর অবদান অনেকখানি ছিল। ১৯২৩ সালের যখন উত্তর ভারতে হিন্দুরা অপ্রতিহতভাবে শুদ্ধি আন্দোলন চালাচেছ ফলে হাজার হাজার মুসলমান মালকানা রাজপুত মুসলমান হিন্দু হয়ে যাচেছ তখন এই শুদ্ধি অভিযানের বিরুদ্ধে মওলানা মনিরুজ্জামান আগ্রায় একটি মিশন পাঠালেন। বিখ্যাত আলেম ও বহু ভাষাবিদ ডঃ মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ্ এই মিশনের একজন সদস্য ছিলেন।

অতীত ইতিহাসের চিত্র যদি জাতির সামনে তুলে না ধরা হয় তাহলে জাতি বাঁচে না। সুতরাং মওলানা ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। লেখা হলো "ভারতের মুসলিম সভ্যতা", "আওরঙ্গজেব', 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান", "খগোল শাস্ত্রে মুসলমান।" সাহিত্যের মাধ্যমে উত্তর ভারতে

মুসলমানদের জাগাতে চেয়েছিলেন শিবলী নোমানী আর বাংলায় জাগাতে চাইলেন মওলানা ইসলামাবাদী।

মওলানা বিশ্বাস করতেন যে দেশে শিক্ষার আলো জ্বালাতে হবে, তবে সে শিক্ষা হবে ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। এই জন্য চাই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। আর এজন্য চাটগাঁর দেয়াঙ পাহাড়ে সমুদ্রর ধারে ছয়শত বিঘার এক বিস্তৃত এলাকা তিনি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবিত আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মওলানা শওকত আলী। সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে একটি স্কুল, মুরগী ও মৎস্য চাষ প্রকল্প শুরু করেছিলেন। ভারতের আলেম সমাজ মওলানা মনি-রুজ্জামান-এর এই প্রচেষ্টায় পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন, কিন্তু দেশ যেহেতু বিদেশী শাসনের অধিন ছিল সেজন্য অনেক প্রচেষ্টার মত মওলানার এই প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। তাঁর অন্যতম কীর্তি চট্টগ্রামের ইসলাম মিশন মাদ্রাসা ও কদম মোবারক এতিমখানা। ১৯৩১ সালের ১৮ই জানুয়ারী এতিমখানার গোড়াপত্তন হয়। মওলানার স্বপ্ন ছিল বিরাট এবং লক্ষ্য ছিল মুসলমান জাতির এবং সংগে সংগে সমগ্র দেশের উন্নয়ন। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হওয়ার আগেই তিনি আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন ১৯৫০ সালের ২৪'শে অক্টোবর।

সাংবাদিকতায় বাংলাদেশের মান নিরূপণের কথা যদি ওঠে, তবে নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে, যে কোন দেশের সংবাদপত্রের সংগে আমাদের সংবাদপত্রের তুলনা করা যেতে পারে। আঙ্গিকের দিক থেকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও এরা সুন্দরতর সংবাদপত্র প্রকাশনার চেষ্টা করে থাকে। শুধু দৈনিক নয়, সাপ্তাহিক ও সাময়িকীগুলোও বেশ উচ্চ স্তরের। কাজেই আমরা বলতে পারি সাংবাদিকতায় আমরা সোনালী যুগের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছি।

গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, এই গ্রন্থ যখন মুদ্রনালয় থেকে বেরিয়ে আসছে, সেই সময় ৩০শে মে খবর পাওয়া গেল আমাদের প্রাণপ্রিয় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর এক কালের সহকর্মী ও সেনা বাহিনীর কয়েকজন বিভ্রান্ত অফিসারদের দ্বারা নিহত হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহে)। এই গ্রন্থের অনেকখানি স্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়ার কর্মতৎপরতা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থখানি দেখার সাধ তাঁর ছিল, তাই তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এ গ্রন্থটি জড়িয়ে দিলাম।

লেখক পরিচিতি

১৯০৮ সালের ৬ই অক্টোবরে বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার শালিপুর গ্রামে মোহাম্মদ মোদাব্বেরের জন্ম। স্যার আর. এন মুখার্জি স্কুল থেকে ১৯২২ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রাবস্থায় মাঝে মধ্যেই তাঁকে জেল হাজতে কাটাতে হয়েছে। ১৯২৮ সালে অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর প্রথম জেল হয়। এরপর ১৯৩২ সালে দিল্লীতে গ্রেফতার হন সন্ত্রাসবাদ দমন আইনে। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হন ১৯৩৪-এর জানুয়ারীতে। তাঁর চাচা মৌঃ মুজিবর রহমান ছিলেন সাংবাদিক এবং দি মুসলমান 'পত্রিকার, সম্পাদক। তাঁরই কাছে পাঠ্যাবস্থায় মোদাব্বের সাংবাদিকতা শেখেন। তারপর নেতাজী সুভাস বসুর ডেইলি ফরওয়ার্ড পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৩৫-এর শেষের দিকে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকায় এবং ১৯৩৬-এ নিউজ এডিটর হয়ে যোগ দেন দৈনিক আজাদ-এ। পরে দৈনিক ইত্তেহাদে। ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং অর্ধসাপ্তাহিক 'পাকিস্তান' নামে নিজের সম্পাদনায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। '৬৫ পর্যন্ত এই পত্রিকা চালিয়ে যান। এর মধ্যে ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'দৈনিক মিল্লাত' প্রকাশিত হয় এবং এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে তিনি যোগ দেন।

১৯৪১ সাল থেকে তিনি শিশু ও কিশোরদের জন্য কাজ করতে আরম্ভ করেন। আজাদের পৃষ্ঠায় বাগবান ছদ্মনামে

প্রথম তিনি 'মুকুলের মহফিল' লিখতে শুরু করেন। বাংলাদেশে এখন যে মুকুল ফৌজ আন্দোলন চলছে এটা তাঁরই সৃষ্টি। আজাদের মুকুলের মহফিলের পরিচালক বাগবান এখনো মহফিলের পরিচালনা করে চলেছেন। শুধু এদেশে নয় এই উপ মহাদেশে শিশু কিশোর আন্দোলনের স্রষ্টা তিনি।

চীন এবং রাশিয়া ছাড়া তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই সফর করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত ছিলেন। বুলবুল একাডেমী, নজরুল একাডেমী প্রভৃতির তিনি প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। শিশু কল্যাণ পরিষদ, রেডক্রস ও যক্ষা সমিতির সংগে জড়িত থেকে কাজ করেছেন। এখনো রেডক্রস এবং শিশু একাডেমীর সংগে যুক্ত আছেন।

১৯৬৫ সালে তিনি শিশু-সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী এওয়ার্ড পান এবং ১৯৭৯ সালে তিনি সাংবাদিকতার জন্য একুশে পদক লাভ করেন।

তাঁর লেখা বইঃ ছোটদের জন্য

হীরের ফুল, তাক ডুমাডুম, অভিযান, কিসসা শোন, গল্প শোন, ডানপিটের দল, সন্ধানী আলো, আনলো যারা জীবন কাঠি, যাত্রা হলো শুরু, এক থলি নাটক, বউ হারালো হলো বিড়াল।

বড়দের জন্য

মিসেস লতা স্যান্ন্যাল এবং আরো অনেকে, মুক্তি মন্ত্রে মুসলিম নারী, স্মার্ণা নন্দিনী জাপান ঘুরে এলাম, প্রবাল দ্বীপে, মুক্তি সংগ্রামে টাঙ্গাইল, সাংবাদিকের রোজ-নামচা, ইতিহাস কথা কয়।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(অ)

(আ)

(ই)

(উ)

(ঋ)

(এ)

(ও)

(ক)

(ঘ)

(চ)

(জ)

(দ)

(প)

(ফ)

(ব)

(ভ)

(ম)

(য)

(র)

(স)

(হ)